নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-২

ইবাদাত-বন্দেগী

হাকীকত, ফযীলত ও আদব

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

আপনার সংগ্রহে রাখার মত
আরও কয়েকখানা কিতাব

পরিমার্জিত সংস্করণ

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-২

ইবাদাত-বন্দেগী

হাকীকত, ফযীলত ও আদব

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব: আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিস: টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা, টঙ্গি, গাজীপুর

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-২

ইবাদাত-বন্দেগী

হাকীকত, ফযীলত ও আদব

মূল: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিমার্জিত সংস্করণ ❖ প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

প্রকাশকাল

তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ঈসায়ী

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-29-6

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/maktabatulashraf, facebook.com/EhsanBookshop, khidmashop.com

16297 or 01519521971   01832093039   01939773354

মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র

IBADAT-BONDEGI : HAQIQAT, FAZILAT O ADAB

By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani

Translated by: Maulana Muhammad Jalaluddin

Price: Tk. 480.00 US$ 25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে বলেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচিত, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের প্রায় সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ

মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং প্রথমবার প্রকাশকালে দশ খণ্ড ও পরবর্তীতে আরো পাঁচটি খণ্ড, এ পর্যন্ত মোট পনেরো খণ্ড প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশারাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি', সপ্তম খণ্ড 'মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন', অষ্টম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র : ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও অর্জনের উপায়' নবম খণ্ড 'ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব', দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন কাজে প্রিয় নবীর ﷺ প্রিয় দুআ ও আমল', একাদশ খণ্ড 'ইসলামী মাসসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল', দ্বাদশ খণ্ড 'সীরাতে রাসূল ﷺ ও আমাদের জীবন', ত্রয়োদশ খণ্ড 'দ্বীনী মাদরাসা, উলামা ও তলাবা' এবং চতুর্দশ খণ্ড 'ইসলাম ও আধুনিক যুগ' বিষয়ক। আর পঞ্চদশ খণ্ড 'মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী'।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম খণ্ড **ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস** নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সীপ্রশংসা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই দ্বিতীয় খণ্ড **'ইবাদত-বন্দেগী : হাকীকত,**

ফযীলত ও আদব' প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ক্রটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ক্রটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা– উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
১২ রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রসঙ্গে

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম ও আমাদের জীবন সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড এ যাবৎ একাধিকবার মুদ্রিত হয়ে পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এবারের মুদ্রণের পূর্বে আমরা এর ঈষৎ পরিমার্জনের প্রয়াস পেয়েছি। ফলে আলহামদুলিল্লাহ, পূর্বের মুদ্রণসমূহে থেকে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু প্রমাদ, বানানবিভ্রাট ও আরও কিছু অসংগতি সংশোধিত হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে ভাষা ও বাক্যকে আরও সহজ ও সুন্দর করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে নতুন করে উদ্ধৃতি যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি এবারের মুদ্রণ আরও বেশি উপকারী ও সুখপাঠ্য সাব্যস্ত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে, লেখক-পাঠক-প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল ও মাকবুল করুন। শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতমের দিকে আমাদের চলা আব্যাহত রাখুন। আমীন।

তারিখ
৬ রজব ১৪৪১ হিজরী
০২ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালঙ্ঘন উভয় প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশনা পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সউদ উছমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সমগ্রকে তাঁর, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩ হিজরী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

নামায ১৪৩-২৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

হজ্জ ২৬৫-৩০০

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

‘বিসমিল্লাহ’

হাকীকত, ফযীলত, আদব

'বিসমিল্লাহ'*

হাকীকত, ফযীলত ও আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَقْطَعُ.

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

গত জুমায় আমি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদন করেছিলাম। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

'গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ আল্লাহর নামে শুরু না হলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'[১]

এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা শুরু করার জন্যে প্রত্যেক মুসলমানকে তাকীদ করেছেন।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড ১৩, পৃ. ৮৫-১০০, ইসলাহী মাওয়ায়েয, খণ্ড ৩, পৃ. ২৬-৪৬

১. কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৪৯১

সবকাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'

প্রত্যেক কাজের শুরুতেই আমাদেরকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভোরবেলা বিছানা থেকে ওঠার সময়, গোসলখানায় যাওয়ার সময়, গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময়, খানা খাওয়ার পূর্বে, পানি পান করার পূর্বে, বাজারে যাওয়ার পূর্বে, মসজিদে প্রবেশের পূর্বে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, কাপড় পরার সময়, গাড়ি চালানোর সময়, বাহনে আরোহণ করার সময়, বাহন থেকে অবতরণের সময়, ঘরে প্রবেশ করার সময়, সকল কাজে সর্বক্ষণ আমাদের দ্বারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলানো হচ্ছে।

প্রত্যেক কাজের পিছনে আল্লাহর 'প্রতিপালন-ব্যবস্থা'

গত জুমায় আমি নিবেদন করেছি যে, আমাদের দ্বারা যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করানো হচ্ছে তা কোনো মন্ত্র নয়। বরং এর অন্তরালে মহিমান্বিত এক দর্শন লুকিয়ে আছে। বিশাল এক হাকীকতের দিকে এর মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সেই হাকীকত হলো, মানুষ তার জীবনে যতো কাজই করে, তা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ছাড়া সম্ভব হয় না। বাহ্যদৃষ্টিতে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার চেষ্টা-পরিশ্রমের ফসল। কিন্তু মানুষ যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তার শ্রম-সাধনার দখল খুব কমই দৃষ্টিগোচর হবে। সবকিছুর পিছনে আল্লাহ তা'আলার বিশাল প্রতিপালন-ব্যবস্থা কার্যকর দেখতে পাবে।

এক গ্লাস পানির মধ্যে প্রতিপালন-ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে

দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য করুন! আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- পানি পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলবে। বাহ্যদৃষ্টিতে পানি পান করাকে একটা মামুলী বিষয় মনে করা হয়। ঘরে পানি সরবরাহের জন্যে আমরা পাইপ লাইন নিয়ে রেখেছি। ঠাণ্ডা রাখার জন্যে কুলার ও ফ্রিজার রয়েছে। আপনি ফ্রিজার থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করলেন, গ্লাসে ভরলেন এবং পান করলেন। এখন বাহ্যত দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের নিজেদের চেষ্টা, পরিশ্রম ও পয়সা খরচের ফলেই এ ঠাণ্ডা পানি

লাভ হয়েছে। কিন্তু খুব কম মানুষই এ কথা চিন্তা করে যে, এই এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি- যা আমরা মুহূর্তেই গলধঃকরণ করলাম– তা আমাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছানোর জন্যে মহান আল্লাহর প্রতিপালন-ব্যবস্থার বিশাল কারখানা কীভাবে কাজ করে চলেছে।

জীবন পানির উপর নির্ভরশীল

দেখুন! পানি এমন এক জিনিস, যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

'আমি সব প্রাণীকে পানি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি।'[১]

তাই পানি শুধু মানুষেরই নয়, বরং প্রত্যেক প্রাণীর মূল উৎস এবং তার উপর তাদের জীবন নির্ভরশীল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এত পরিমাণ পানি সৃষ্টি করেছেন যে, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থল হলে, দুই তৃতীয়াংশ সমুদ্র আকারে রয়েছে জল। সমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য সৃষ্টিজীব রয়েছে- যারা প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। সমুদ্রের পানি যদি মিষ্টি হতো, তাহলে যে সমস্ত প্রাণী ঐ পানিতে মরে পঁচে গলে যাচ্ছে, সেগুলোর কারণে পানি নষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তা'আলা পানিকে লবণাক্ত বানিয়েছেন। যাতে এর নোনা অংশ পানিকে খারাপ ও দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

পানি শুধু সাগরে থাকলে কী অবস্থা হতো?

এও তো হতে পারতো যে, আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেন– 'আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রের আকারে পানি সৃষ্টি করেছি। নষ্ট ও দূষিত হওয়া থেকে পানিকে রক্ষা করার জন্যে তার মধ্যে লবণাক্ততা সৃষ্টি করেছি। এখন তোমাদের ব্যবস্থা তোমরা গ্রহণ করো। তোমাদের প্রয়োজন থাকলে সমুদ্রে গিয়ে পানি সংগ্রহ করো এবং মিঠা বানিয়ে পান করো ও অন্যান্য কাজে লাগাও। যদি এ নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে সমুদ্রে গিয়ে

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩০

পানি এনে তা দ্বারা নিজের প্রয়োজন মেটানোর শক্তি কি কোনো মানুষের ছিলো? সমুদ্র থেকে পানি যদি সংগ্রহ করতও, তা মিষ্টি বানাতো কীভাবে?

পানিকে মিষ্টি বানানো ও সরবরাহ করার কুদরতী ব্যবস্থা

সৌদি আরবে শত-সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে বিশাল এক প্লান্ট বসানো হয়েছে। এ জন্যে বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে যে, এ পানিকে মিষ্টি বানানোর জন্যে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তাই সর্তকতার সাথে তা ব্যবহার করুন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষের খাতিরে সমুদ্রের পানিকে মিষ্টি বানানোর জন্যে 'মনসুন' তথা মৌসুমী বায়ুর মাধ্যমে পানিকে আকাশে উঠিয়ে মেঘমালা তৈরী করেছেন এবং তার মধ্যে এমন স্বয়ংক্রিয় প্লান্ট বসিয়ে দিয়েছেন যে, তিক্ততা দূর হয়ে তা মিষ্টি পানিতে পরিণত হয়। যে সমস্ত মানুষ সমুদ্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করে এবং সমুদ্র থেকে পানি সংগ্রহ করা যাদের জন্যে সম্ভবপর নয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে মেঘমালার আকারে বিনামূল্যের কার্গো সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছেন।

মেঘ বিনামূল্যে পানি সরবরাহ করে থাকে

কিছুদিন আগে আমি নরওয়েতে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোকেরা জানালো- এখানকার পানিকে খুব উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত মনে করা হয়। এ কারণে অনেক দেশ এখান থেকে পানি আমদানি করে থাকে। বড় বড় কন্টেইনারে ভরে জাহাজের মাধ্যমে অন্যান্য দেশে পানি সরবরাহ করা হয়। ফলে প্রতিলিটার পানিতে এক ডলার করে ব্যয় হয়। আমাদের মুদ্রামানে যা হয় বাষট্টি রুপী[১]। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতির জন্যে- যার মধ্যে মুসলমান ও কাফেরের কোনো ভেদাভেদ নেই- মেঘমালার আকারে বিনামূল্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। মেঘ সমুদ্র থেকে পানি উঠিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, পৃথিবীর এমন কোনো ভূখণ্ড নেই, যা এই কার্গো সার্ভিস দ্বারা উপকৃত হয় না। মেঘ ভেসে আসে, গর্জে ও বৃষ্টি বর্ষণ করে। তারপর চলে যায়।

---

১. এটা অনেক আগের কথা। বর্তমানে ডলারের মূল্য বেড়ে প্রায় একশ' রুপি হয়েছে।

পানি সঞ্চয় করে রাখা আমাদের সামর্থ্যভুক্ত নয়

মেঘমালার মাধ্যমে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পানি পৌছে দিয়ে যদি বলা হতো যে, আমি তো তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পানি পৌছে দিলাম, এখন তোমরা সারা বছরের পানি সঞ্চয় করে রাখো। হাউজ ও টাঙ্কি বানিয়ে তার মধ্যে সংরক্ষণ করো। তাহলে বৃষ্টির সময় সারা বছরের জন্যে পানি সঞ্চয় করে রাখা কি মানুষের জন্যে সম্ভব হতো? মানুষের কাছে কি সারা বছরের পানি সঞ্চয় করে রাখার এবং সেখান থেকে ব্যবহার করার মতো ব্যবস্থা আছে? আল্লাহ তা'আলা জানতেন, দুর্বল ও অসহায় মানুষের পক্ষে এতোটুকু করাও সম্ভব নয়। তাই তিনি বললেন- বৃষ্টির এ পানি যতোটুকু সঞ্চয় করতে এবং ব্যবহার করতে পারো করো। অবশিষ্ট সারা বছরের জন্যে সংরক্ষণ করার দায়িত্বও আমি নিলাম।

বরফাচ্ছাদিত এসব পাহাড় হিমাগার

মেঘমালার এসব পানি আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর তুষার রূপে বর্ষণ করেন। পাহাড়কে তিনি পানির হিমাগার বানিয়েছেন। বরফের আকারে পাহাড়ের উপর তিনি পানি সংরক্ষণ করেন। পানিকে এত উঁচুতে সংরক্ষণ করেছেন যে, দূষিতকারী কোনো জিনিস সে পর্যন্ত পৌছতে পারে না। এমন তাপমাত্রায় রেখেছেন যে, তা গলে না। সুউচ্চ এ পর্বতমালা একদিকে মানুষকে দৃষ্টিনন্দন নৈসর্গিক দৃশ্য উপহার দেয়, অপরদিকে মানুষের সারা জীবনের জন্যে পানির ভাণ্ডার সংরক্ষণ করে।

নদী-নালার মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা

এ পর্যায়ে যদি মানুষকে বলা হতো যে, আমি তোমাদের জন্যে পহাড়চূড়ায় পানির ভাণ্ডার বানিয়ে তাতে পানি সঞ্চয় করে রেখেছি, যার প্রয়োজন হয় সেখান থেকে নিয়ে আসো। তাহলে কি পাহাড়চূড়া থেকে বরফ গলিয়ে পানি সংগ্রহ করে এনে নিজেদের প্রয়োজন পুরা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো? না, এটাও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন- এ দায়িত্বও আমি গ্রহণ করছি। আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে হুকুম দিলেন- আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে বরফকে গলাও। তারপর পানি প্রবাহের জন্যে ঝর্ণা ও নদী-নালার আকারে রাস্তাও বানিয়ে

দিলেন। বরফ গলে পানির আকারে পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং ঝর্ণা ও নদী-নালার আকারে প্রবাহিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ভূগর্ভে পাইপ লাইনের মতো পানির স্রোত ও শিরা বিছিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডে ইচ্ছা খনন করে পানি উত্তোলন করো।

এ পানি আল্লাহ তা'আলা পৌছিয়েছেন

আল্লাহ তা'আলা যেই পানি সমুদ্র থেকে উঠিয়ে পাহাড়চূড়ায় বর্ষণ করিয়েছেন, তারপর সেখান থেকে ঝর্ণা ও নদী-নালা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতের মাধ্যমে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌছে দিয়েছেন, এখন শুধু সামান্য পরিশ্রম করে তা নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসা মানুষের কাজ। অতএব যে পানি তুমি গলধঃকরণ করছো, একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবে, সামান্য এই পানির পিছনে বিশ্বচরাচরের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়েছে। তাই পানি পান করার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করার হুকুম দেয়ার মাধ্যমে এই হাকীকতের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, তোমাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পানি পৌছা তোমাদের বাহুশক্তির কারিশমা নয়, বরং এটা আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে তোমরা এ পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হচ্ছো।

দেহের প্রতিটি অঙ্গের পানি প্রয়োজন

গ্লাসে পানি ভরে আমরা গলধঃকরণ করে থাকি। তারপর পানি কোথায় যাচ্ছে এবং দেহের কোন্ অংশে কী উপকার পৌছাচ্ছে, অসহায় মানুষ তার কিছুই জানে না। মানুষ শুধু এতোটুকুই জানে যে, পিপাসা লেগেছিলো, পানি পান করেছি, পিপাসা নিবারিত হয়েছে। তার জানা নেই যে, পিপাসা কেন লেগেছিলো? এবং পিপাসা লাগার পর যখন পানি পান করলাম তার পরিণতিই বা কী হলো? আরে! তোমার পিপাসা তো এজন্যে লেগেছিলো যে, তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গের পানি প্রয়োজন ছিলো। শুধু মুখ আর কণ্ঠনালীরই নয়, বরং পুরো দেহের সমস্ত অঙ্গের পানি প্রয়োজন ছিলো। দেহে পানি না থাকলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কারো সামান্য একটু দাস্ত আরম্ভ হলে দেহে পানির ভাগ

কমে যায়। তখন দুর্বলতার কারণে মানুষের জন্যে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ক্ষতিকর

মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের পানি প্রয়োজন। সেজন্যই মানুষের পিপাসা লাগে এবং সে পানি পান করে। অপরদিকে পানির পরিমাণ যেন দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দেহে পুঞ্জীভূত হলে দেহ ফুলে যায়। কিংবা পানি যদি দেহের অনুপযুক্ত কোনো জায়গায় আটকে যায়, তাহলে তার ফলে নানা রকমের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। যেমন- ফুসফুসে পানি জমে গেলে টি.বি. রোগ হয়। পাঁজরে পানি জমলে এ্যাজমা হয়। তাই প্রয়োজনের বেশি পানি পুঞ্জীভূত হলে তাও মানুষের জন্যে বিপদ। আর যদি হ্রাস বা নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলেও মানুষের জন্যে বিপদ। মানবদেহে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি থাকা জরুরী।

দেহে স্বয়ংক্রিয় মিটার বসানো রয়েছে

পানির সেই সীমা কী? একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে, আমার দেহে কতোটুকু পানি থাকা উচিত, আর কতোটুকু উচিত নয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের দেহে একটি স্বয়ংক্রিয় মিটার বসিয়ে দিয়েছেন। মানবদেহে যে পানির প্রয়োজন হয়, পিপাসা লাগে, কেন পিপাসা লাগে? এ কারণে লাগে না যে, কণ্ঠনালী ও ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। বরং এ কারণে লাগে যে, দেহে পানির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রয়োজনের এই উপলব্ধি দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা পিপাসা তৈরী করেছেন। একজন শিশু- যে কিছুই জানে না- সেও বোঝে, আমার পিপাসা লেগেছে, তা নিবারিত করতে হবে।

দেহাভ্যন্তরে পানি কী কাজ করছে?

পানি পাইপ লাইন দ্বারা দেহের অভ্যন্তরের এমন সব জায়গায় পৌছে, যেখানে যেখানে তার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দেহকে ধৌত করে পেশাবের আকারে বাইরে চলে আসে। যেন

ঐ দূষিত পানি দেহের ভিতরে রয়ে না যায়। আমরা আপনারা মুহূর্তের মধ্যে পানি পান করি, কিন্তু এ কথা চিন্তা করি না যে, ওই পানি কোত্থেকে এলো এবং কীভাবে আমাদের মুখ পর্যন্ত পৌছলো? এটাও চিন্তা করি না যে, ভিতরে যাওয়ার পর এর পরিণতিই বা কী হবে? কে এই পানির তত্ত্বাবধান করছে। তাই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি মূলত আমাদেরকে এ সমস্ত হাকীকতের দিকে মনোযোগী করছে।

হারুনুর রশীদের একটি ঘটনা

হারুনুর রশীদ একবার তার রাজ দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। পান করার জন্যে পানি চাইলেন। কাছেই মাজযুব বুযুর্গ হযরত বাহলুল রহ. উপবিষ্ট ছিলেন। হারুনুর রশীদ পানি পান করতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন- আমীরুল মু'মিনীন! এক মিনিটের জন্যে থামুন। তিনি থামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন- কী ব্যাপার? তিনি বললেন- আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। তা এই যে, আপনার এখন পিপাসা লেগেছে। পানির গ্লাসও আপনার হাতে রয়েছে। আপনি বলুন, আপনার যদি এমনই তীব্র পিপাসা লাগে, আর আপনি তখন এমন ময়দান বা বনের মধ্যে অবস্থান করেন, যেখানে পানি নেই। ওদিকে আপনার পিপাসা তীব্রতর হচ্ছে। তখন আপনি এক গ্লাস পানি পাওয়ার জন্যে কী পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবেন? হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন- প্রচণ্ড পিপাসার অবস্থায় পানি না পেলে তো মৃত্যু অনিবার্য। তাই নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে আমার কাছে যতো সম্পদ থাকবে সবই ব্যয় করবো। এ উত্তর শুনে হযরত বাহলুল রহ. বললেন- এবার আপনি 'বিসমিল্লাহ' বলে পানি পান করুন।

পুরো সাম্রাজ্যের মূল্য এক গ্লাস পানির চেয়ে কম

বাদশাহ পানি পান করলে হযরত বাহলুল মাজযুব রহ. বললেন- আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কী সেই প্রশ্ন? বাহলুল মাজযুব বললেন- প্রশ্ন হলো, এখন আপনি যে পানি পান করলেন, তা যদি আপনার দেহেই রয়ে যায়। বাইরে বের না হয়। পেশাব বন্ধ হয়ে যায়। মূত্রাশয়ে পেশাব জমে আছে,

বের হওয়ার কোনো উপায় নেই, সে অবস্থায় এটা বের করার জন্যে কী পরিমাণ সম্পদ আপনি ব্যয় করবেন? হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন- পেশাব যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং মূত্রনালী ফুলে যায়, সে তো অসহনীয় এক অবস্থা। এর চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসক যতো সম্পদ চাইবে, আমি তাই দেবো। এমনকি পুরো সাম্রাজ্য চাইলে তাও দেবো। বাহলুল বললেন- আমীরুল মু'মিনীন! এর মাধ্যমে আমি এ হাকীকত তুলে ধরতে চাই যে, আপনার পুরো সাম্রাজ্যের মূল্য এক গ্লাস পানি পান করা এবং তা বাইরে বের করার সমানও নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ পুরো ব্যবস্থাপনা বিনামূল্যে দিয়ে রেখেছেন। বিনামূল্যে পানি লাভ হচ্ছে এবং বিনামূল্যেই তা বের হচ্ছে। তা বের করার জন্যে কোনো মূল্য দিতে হচ্ছে না। কোনো পেরেশানী উঠাতে হচ্ছে না।

'বিসমিল্লাহ'র মাধ্যমে দাসত্বের স্বীকৃতি

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে পুরো ব্যবস্থাপনা বিনামূল্যে দিয়ে রেখেছেন। কারোই এর জন্যে কোনো পয়সা খরচ করতে হয়না এবং পরিশ্রমও করতে হয়না। তাই পানি পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করার হুকুম দেয়ার মাধ্যমে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের কারিশমা। এর মাধ্যমে এ কথারও স্বীকৃতি আদায় করা হচ্ছে যে, হে আল্লাহ! এ পানি পান করার কোনো শক্তি আমার ছিলো না। আপনার রুবুবিয়্যাতের এ কারখানা যদি না থাকতো, তাহলে আমাদের পর্যন্ত এ পানি কী করে পৌছতো? আপনি কেবলই দয়া ও মেহেরবানী করে এ পানি আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আপনিই যখন এ পানি পৌছিয়েছেন, তাই আপনারই কাছে আবেদন ও দু'আ করছি যে, হে আল্লাহ! যে পানি আমরা পান করছি, তা দেহের অভ্যন্তরে যাওয়ার পর যেন কল্যাণের উপকরণ হয়, কোনো অকল্যাণ না ঘটায়। পানির মধ্যে যদি দূষণ ও রোগ-জীবানু থাকে তাহলে দেহের মধ্যে তা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। একইভাবে দেহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা যদি বিকল হয়ে যায়, উদাহরণস্বরূপ যকৃত (লিভার) যদি কাজ না করে, তাহলে পানি ভিতরে তো যাবে, কিন্তু পানিকে পরিষ্কার করা এবং দূষণকে বাইরে

নিক্ষেপ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা বিকল হয়ে যাবে। তাই আমরা পানি পান করার সময় দু'আ করি যে, হে আল্লাহ! এ পানির পরিণতিও কল্যাণকর করুন।

মানুষের মূত্রাশয়ের মূল্য

করাচীতে একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাকে একবার আমার ভাই ছাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এক মানুষের দেহ থেকে কিডনি নিয়ে অন্য মানুষের দেহে স্থাপন করেন। এখন তো বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করেছে, তাই কৃত্রিম কিডনি তৈরী করা হয় না কেন? যাতে অন্য মানুষের কিডনি ব্যবহার করার প্রয়োজনই না পড়ে। তিনি হেসে উত্তর দিলেন- প্রথমত, বিজ্ঞান উন্নতি করা সত্ত্বেও কৃত্রিম কিডনি বানানো খুবই কঠিন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কিডনির মধ্যে এমন একটি ছাঁকনি লাগিয়ে দিয়েছেন। যা এতই সূক্ষ্ম ও পাতলা যে, এখনো পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, যা এত সূক্ষ্ম ও পাতলা ছাঁকনি বানাতে পারে। ধরুন, এমন কোনো যন্ত্র যদি আবিষ্কার করাও হয়, তবুও তা তৈরী করতে মিলিয়ন মিলিয়ন রূপি ব্যয় হবে। আর যদি এত বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় করে এমন ছাঁকনি তৈরীও করা হয়, তবুও কিডনির মধ্যে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যা বানানো আমাদের সাধ্যের বাইরে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলা কিডনির মধ্যে একটি ব্রেইন সৃষ্টি করেছেন, যা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে যে, এ লোকের দেহে কী পরিমাণ পানি রাখা এবং কী পরিমাণ পানি বের করে দেয়া উচিত। প্রত্যেক মানুষের কিডনি ঐ মানুষের অবস্থা, দেহের আকার ও তার ওজন অনুপাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কী পরিমাণ পানি তার দেহে থাকা উচিত, আর কী পরিমাণ বের করে দেয়া উচিত। তার এ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে শতভাগ সঠিক। এর ফলে দেহের প্রয়োজন পরিমাণ পানি সে রেখে দেয়, আর অতিরিক্তটুকু পেশাবের আকারে বের করে দেয়। তাই আমরা যদি মিলিয়ন মিলিয়ন রূপি ব্যয় করে রাবারের কৃত্রিম কিডনি তৈরী করি, তবুও আমরা তার মধ্যে সেই ব্রেইন দিতে পারবো না, যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের কিডনিতে সৃষ্টি করেছেন।

দেহের ভিতরে রুবুবিয়্যাতের কারখানা

কুরআনে কারীম বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে–

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

'এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পারো না?'[১]

তোমরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা করে দেখো, তোমাদের দেহের মধ্যে আমার পরিপূর্ণ কুদরত ও হিকমতের কী অসাধারণ কারখানা কাজ করছে! এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে চিন্তা করো। কিডনির পরিণামও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের হাতে নিয়ন্ত্রিত যে, কখন পর্যন্ত তা সচল থাকবে এবং কখন অচল হয়ে যাবে। তাই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমে'র পয়গাম এই যে, একদিকে এ কথা স্মরণ করো যে, এ পানি তোমার নিকট কীভাবে পৌঁছলো, অপরদিকে লক্ষ্য করো যে, এ পানি তোমার দেহের অভ্যন্তরে গিয়ে যেন বিপর্যয় সৃষ্টি না করে, বরং তা সুস্থতা ও বরকতের কারণ হয়। এ 'বিসমিল্লাহ' পাঠের মধ্যে একদিকে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত ও হিকমতের স্বীকৃতি রয়েছে, অপরদিকে রয়েছে এ দু'আ ও আবেদন যে, হে আল্লাহ! এ পানি আমরা পান করছি ঠিক, কিন্তু তা যেন ভিতরে গিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে, বরং সুস্থতা, পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তির কারণ হয়। পানি পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করার এই হলো দর্শন। তাই পানি পান করার সময় এ দর্শনকে সামনে রেখে পান করো। তখন দেখবে, পানি পান করার মধ্যে কতো মজা ও কেমন বরকত! এভাবে পানি পান করাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে তিনি সওয়াব ও পুরস্কারও দান করবেন।

ভয় ও ভালোবাসা অর্জনের উপায়

পানি পান করার সময় এ দর্শন সামনে রাখলে কি সেই মহান স্রষ্টার ভালোবাসা জন্মাবে না? তুমি যখন এ চিন্তা করে পানি পান করবে, তখন তা তোমার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও আযমত বৃদ্ধি করবে।

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত ২১

এই মহব্বতের ফলে তোমার অন্তরে খাশিয়াত (ভয়) পয়দা হবে। এ খাশিয়াত তোমাকে গোনাহ থেকে বাধা দিবে।

কাফের ও মুসলমানের পানি পান করার মধ্যে পার্থক্য

একজন কাফেরও পানি পান করে, কিন্তু গাফেল অবস্থায় পান করে। নিজের খালেক ও মালেককে স্মরণ করে না। আরেকজন মুমিনও পানি পান করে, কিন্তু চিন্তা ও মনোযোগসহ পান করে। পানির নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা কাফেরকেও দিয়েছেন, মুমিনকেও দিয়েছেন। কিন্তু কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পানি পান করা আর কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পানি পান করার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকা উচিত। সেই পার্থক্য হলো, মু'মিন আল্লাহর কথা স্মরণ করে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শোকর আদায় করে পানি পান করবে। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে পান করবে। বরকতের দু'আ করে পান করবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব হাকীকত বোঝার এবং সে অনুপাতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইবাদতের গুরুত্ব

হাকীকত, ফযীলত, আদব

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টিজগতের প্রতটি কণার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনিই বিশ্ব জগতকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তাহলে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করতে আপনার বিলম্ব হবে না যে, সমগ্র বিশ্বকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে এজন্যে যে, আপনি অনেক উঁচু ও অতি মহান একটি কাজে আদিষ্ট। আর সেই মহান কাজটিই হলো 'ইবাদত' ও 'বন্দেগী'। এটিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে।

ইবাদতের গুরুত্ব*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মানবজীবনের লক্ষ্য এবং পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত ইবাদতের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ বিশ্ব চরাচরে মানবের রয়েছে এক অসাধারণ অবস্থান। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর উপর রাজত্ব করে। এ বিশাল-বিস্তৃত সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কণা তার সেবায় নিয়োজিত। মানুষের উদরপূর্তির জন্যে শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন হলে সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তু তার সাহায্যের জন্যে সচল হয়ে ওঠে। মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তিধর পশু তার অনুগত হয়ে জমি চাষ করে। কিশলয় চারা এবং চারা বৃক্ষে পরিণত হতে তাপের প্রয়োজন হলে সূর্য রশ্মি ছড়ায়। পানির প্রয়োজন হলে মেঘমালা তার ভাণ্ডার বিলিয়ে দেয়। বাতাসের প্রয়োজন হলে বায়ু দোলা দিয়ে তার প্রবৃদ্ধি ঘটায়। মোটকথা, বিশ্বচরাচরের যাবতীয় শক্তি মানুষের ক্ষুধা নিবারণ এবং তার জীবনের উপাদান সরবরাহের জন্যে নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যয় করে।

এটাতো একটিমাত্র উদাহরণ। আপনি আপনার চতুর্দিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাবেন, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত আল্লাহর নিয়োজিত সমস্ত কর্মীবাহিনী আপনার সেবায় নিয়োজিত।

এখন প্রশ্ন জাগে, এমনটি কেন হলো? আপনার মধ্যে এমন কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে কারণে এ বিশ্বজগত আপনার খেদমত করে। অথচ আপনার থেকে সে কোনো খেদমত নেয় না।

---

* নশরী তাকরীরেঁ, পৃ. ৩৭-৪০, ফরদ কী ইসলাহ, পৃ. ৪৫

আপনি যদি বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কণার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনিই বিশ্ব জগতকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তাহলে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করতে আপনার বিলম্ব হবে না যে, সমগ্র বিশ্বকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে—কারণ আপনি অনেক উঁচু ও অতি মহান একটি কাজে আদিষ্ট। আর সেই মহান কাজটিই হলো 'ইবাদত'। এটিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

'আমি জিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।'[১]

কুরআন মাজীদের এ বাণী ও তার উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা দ্বারা ইবাদতের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইবাদত এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, তা আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ইবাদত এ জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ যে, এ উদ্দেশ্যেই দুনিয়াতে আমাদের আগমন। ইবাদত এ জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ যে, তা আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার প্রকৃত কারণ। এ শক্তিবলেই আমরা বিশ্বজগতের সবকিছু থেকে খেদমত নিয়ে থাকি। ইবাদতের এ দায়িত্ব যদি আমরা পুরো না করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টান্ত হবে সেই চাকরের ন্যায়, যে তার মালিক থেকে পুরো বেতন উসুল করে এবং তার দেয়া সুযোগ-সুবিধা পুরোটাই ভোগ করে, কিন্তু সেই মনিবই যখন তাকে কোনো কাজের হুকুম দেয়, তখন সে তা পালন করতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে। এ চাকর যেমন শাস্তিযোগ্য, তেমনিভাবে সে বান্দাও শাস্তির উপযুক্ত, যে জগতের সমস্ত নেয়ামত ভোগ করে, কিন্তু ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে না। অপরদিকে যে বান্দা সবগুলো ইবাদত সঠিকভাবে পালন করে, তার দৃষ্টান্ত সেই অনুগত চাকরের ন্যায়, যার অরাম ও বিশ্রামেও মালিক খুশী থাকে। অবসর সময়ে চাকরের কাজ না করা এবং তার আরাম-বিশ্রামও যেমন চাকুরির মধ্যে পরিগণিত হয়, তেমনিভাবে একজন অনুগত বান্দার ইবাদত শুধুমাত্র নামায-রোযা ও হজ্ব-যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ইবাদত বলে পরিগণিত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে- এমন ব্যক্তি তার বউ-বাচ্চার জীবিকা উপার্জন করে

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

সেজন্য সওয়াব পেয়ে থাকে। তার ঘুমানো, জাগ্রত থাকা, এমনকি হাসি-তামাশাও বন্দেগী বলে গণ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে বন্দেগীর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ নিজেকে আল্লাহর আজ্ঞাধীন মনে করে নিজের পুরো জীবনকে তাঁর বিধান মোতাবেক পরিচালিত করবে। তাই ইবাদত বিশেষ কোনো জায়গা, বিশেষ কোনো সময় বা বিশেষ কোনো কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আপনি নিজের জীবনকে যদি আল্লাহর হুকুমের অধীন বানান, তাহলে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ইবাদত বলে গণ্য হবে। আপনার ব্যবসা, চাকুরি এমনকি বৈধ হাস্য-রসও ইবাদত বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত হলো, তা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বিধান মোতাবেক এবং নেক নিয়তের সাথে হতে হবে।

কোনো জাতির বেশির ভাগ সদস্য যখন নিজেদের সামগ্রিক জীবনকে এভাবে ইবাদত বানিয়ে নেয়, তখন জীবনের সকল সফলতা তাদের পদচুম্বন করে। ফলে আল্লাহর সেই ওয়াদা পূর্ণ হয়, কুরআনে কারীম যার ঘোষণা দিয়েছে এভাবে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْـًٔا ؕ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। এবং তাদের জন্যে তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তারা যে, ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।'[১]

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১. সূরা নূর, আয়াত ৫৫

ইবাদতের আবেগ ও আদব*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় অস্থির হওয়া

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.-এর নিকট পত্র লিখলো যে-

'আমার খুব ইচ্ছে হয়, যে কোনো উপায়ে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে 'অস্থির' থাকি।'

পত্রের জবাবে হযরত থানভী রহ. লিখলেন-

'কিন্তু এর পাশাপাশি এ দু'আও করো যে, এ 'অস্থিরতা'র মাঝেও যেন প্রশান্তি থাকে।'[১]

বিরল পত্রের বিরল উত্তর

চিন্তা করলে হযরতের এ উত্তরটি বিরল ও বিস্ময়কর মনে হবে। কারণ, যারা হযরতের মাওয়ায়েয ও মালফূযাত পড়েছেন এবং যারা তাঁর মেযাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু হলেও অবগত, তাদের সামনে তাঁর উত্তর না তুলে ধরে শুধু প্রশ্নটি তুলে ধরলে ধারণা হবে যে, হযরত এর উত্তরে বলবেন- তোমার মাঝে এ 'অস্থিরতা'র শখ কেন জন্মালো? 'অস্থিরতা' তো ক্ষমতা বহির্ভূত একটি অবস্থার নাম। তা অর্জিত হোক বা না হোক, এর পিছনে পড়ছো কেন?

কেননা হযরতের শিক্ষার বড় একটি মূলনীতি হলো, মানুষ তার 'এখতিয়ারী' তথা ক্ষমতাভুক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে এবং

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃ. ১৯৯-২১৬,

১. আনফাসে ঈসা, পৃ. ১৭৪,

'গাইরে এখতিয়ারী' তথা ক্ষমতাবহির্ভূত বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দিবে। এটি অত্যন্ত দামী একটি মূলনীতি। কেননা ক্ষমতা বহির্ভূত এ সমস্ত অবস্থা- অর্থাৎ কোনো সময় ইবাদতের মধ্যে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, আবার কোনো সময় হয় না। কখনো ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ বসে, আবার কখনো বসে না- এ সব অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। এই আছে, এই নেই। এর পেছনে পড়ার দরকার নেই। আসল উদ্দেশ্য হলো 'আমল'। এটিই হযরত থানভী রহ.-এর তালীমের সারকথা। এ জন্যে যারা 'কাইফিয়্যাত' তথা বিশেষ ভাব ও আবেগের পিছনে দৌড়ায়, সাধারণত হযরত থানভী রহ. তাদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করেন না।

প্রত্যেক রোগীর জন্যে পৃথক ব্যবস্থাপত্র

মোটকথা, হযরতের উত্তর না পড়লে মনে হবে, এ ক্ষেত্রে হযরত বলবেন, 'অস্থির' হয়ে থাকা শরীয়তে কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয় নয়। কিন্তু এখানে তিনি এ উত্তর দেননি। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারদের কাজই হলো, রোগীর অবস্থা অনুপাতে ব্যবস্থাপত্র দেয়া। এ নয় যে, একই ব্যবস্থাপত্র সব রোগীর বেলায়ই প্রয়োগ করা। কারণ, রোগীর রোগের ধরন বুঝে চিকিৎসা দেয়া হয়। একইভাবে একজন কামেল মুর্শিদের কাজ হলো, তিনি দেখবেন, মুরীদের বর্তমান অবস্থায় এ কাজটি তার জন্যে প্রযোজ্য কি-না? আল্লাহ তা'আলা কামেল মুর্শিদকে এ যোগ্যতা দিয়ে থাকেন। আমরা কামেল মুর্শিদের নিকট গেলে তিনি আমাদের অবস্থা অনুপাতে ব্যবস্থাপত্র দেন।

'নেক কাজের আগ্রহ' আল্লাহর মেহমান

এখানে হযরত থানভী রহ. পত্রের জবাবে লেখেননি যে- 'তোমার মধ্যে 'অস্থির' হয়ে থাকার এ আগ্রহ জাগলো কেন? এর প্রয়োজনই বা কি?' কেন তিনি এ জবাব লিখলেন না? এর কারণ সম্ভবত এই যে -আল্লাহই ভালো জানেন- হযরত বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটার অন্তরে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তা তার জন্যে 'ওয়ারিদে কলবী' তথা 'আল্লাহপ্রদত্ত অন্তরের অনুভূতি।' হযরাতে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন- আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে যে সমস্ত অনুভূতি জাগে সেগুলোর অবমূল্যায়ন করো না।

কেননা এগুলো আল্লাহর প্রেরিত মেহমান। এ মেহমানের আদর-যত্ন করলে সে বারবার আসবে। পক্ষান্তরে যদি অবহেলা করো, তাহলে এ মেহমান নারায হয়ে চলে যাবে। আর কোনো দিন আসবে না।

শরীয়তে 'প্রশান্তি' কাম্য

তিনি যদি ওই লোকের উত্তরে লিখতেন যে, তোমার এই 'অস্থির' থাকার চিন্তা সঠিক নয়। তাহলে আল্লাহপ্রদত্ত অন্তরের অনুভূতির বিরোধিতা হতো, ফলে তার ক্ষতি হতো। ভবিষ্যতে এ ধরনের 'অনুভূতি' আসা বন্ধ হয়ে যেতো। পক্ষান্তরে জবাবে যদি তাকে উৎসাহিত করে বলতেন যে, এ অস্থিরতা লাভ হওয়া তো বড় ভালো কথা। আমরাও দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ অস্থিরতা দান করুন। তাহলে সেটিও শরীয়তবিরোধী হতো। এ জন্যে যে, শরীয়তে 'অস্থিরতা' কাম্য নয়। শরীয়তে তো প্রশান্তি ও স্থিরতা কাম্য। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ

'আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়।'[১]

সুতরাং মানুষ অস্থিরতাকে লক্ষ্য বানাবে, এটা শরীয়তের কাম্য নয়। শরীয়তের দাবি হচ্ছে, মানুষ স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জনকে নিজের লক্ষ্য বানাবে। খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেন যে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন রহমত কামনা করছি, যদ্দারা আমার অন্তরের একাগ্রতা ও প্রশান্তি লাভ হবে। আপনি আমার অস্থিরতাকে একাগ্রতা ও স্বস্তি দ্বারা পরিবর্তিত করে দিন।[২]

বোঝা গেলো, শরীয়তে প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ কাম্য। অস্থিরতা ও অস্বস্তি মৌলিকভাবে কাম্য নয়।

---

১. সূরা রা'দ, আয়াত ২৮
২. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৪১

বিরল-বিস্ময়কর উত্তর

মোটকথা, চিঠির উত্তরে যদি হযরত থানভী রহ. প্রথমোক্ত কথা লিখে দিতেন তাহলে তরীকতবিরোধী কাজ হতো, আর যদি দ্বিতীয় কথা লিখে দিতেন তাহলে হতো শরীয়তবিরোধী কাজ। এজন্যে তিনি বড় বিস্ময়কর উত্তর দিয়েছেন যে, এর সাথে এ দু'আও করো যে, 'ঐ অস্থিরতার মাঝেও যেন প্রশান্তি থাকে।' কারণ, 'অস্থিরতা' মৌলিকভাবে কোনো কাম্য বস্তু নয়, বরং প্রশান্তি ও স্থিরতাই কাম্য বস্তু। কিন্তু সে প্রশান্তি ও স্থিরতা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের 'অস্থিরতা'র মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে অস্থির হতে হবে এবং সেই 'অস্থিরতা'র মাঝেই 'স্বস্তি' ও 'স্থিরতা' লাভ হতে হবে।

ہم اضطراب سے حاصل "قرار" کریں گے
یہ "جبر" ہے تو اسے اختیار کریں گے

'অস্থিরতার মাধ্যমেই আমি 'স্থিরতা' লাভ করবো।
এটা 'অক্ষমতা' হলে আমি তাই অবলম্বন করবো।'

এ 'অস্থিরতা' মৌলিকভাবে যদিও উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এর পরিণতিতে কোনো কোনো সময় 'স্থিরতা' লাভ হয়। এ পথের অভিজ্ঞতা যার নেই, তার পক্ষে এ বিষয় পুরোপুরি বোঝা ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ভালোবাসার সূচনা লগ্নে আবেগ-উদ্দীপনা, উচ্ছলতা ও অস্থিরতা থাকে। পরে এমন এক পর্যায় আসে, যখন ঐ অস্থিরতার মাঝেই 'স্থিরতা' চলে আসে। সেজন্যই হযরত এ উত্তর দিয়েছেন।

'খেলাফত' এত সস্তায় বণ্টন হয় না

এর দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের ইসলাহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সামান্য কিছু পরিভাষা মুখস্থ করেই লোকদের ইসলাহ শুরু করে দিলো।

ہزار نکتۂ باریک تر ز مو ایں جاست
نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

'চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম সহস্র রহস্য রয়েছে এখানে।
যে কেউ মাথা নেড়ে করলেই বুযুর্গ হয়ে যায় না।'

তাই এটি বড় নাযুক কাজ। কার জন্যে কোন্ বিষয়টি উপকারী তা ফয়সালা করা বড়ই কঠিন। এজন্যে হযরত থানভী রহ.-এর সিলসিলায় 'খেলাফত' এত সস্তায় বিতরণ করা হতো না। যেমন নাকি অনেক শায়খের দরবারে রেওয়াজ আছে যে, দরবারে আসামাত্রই খেলাফত দিয়ে দেয়া হয়। যে-ই আসছে, সে-ই খেলাফত পাচ্ছে। যাকেই দেখলো যে, সে নামাযের পাবন্দী করছে, কিছু খুশু-খুযু পয়দা হয়েছে এবং কিছু যিকির-আযকার করছে, তাকেই খেলাফত দিয়ে দেয়া হলো। আমাদের হযরতগণের মেযাজ-প্রকৃতি এমন ছিলো না।

ডাক্তার হওয়ার জন্যে সুস্থ হওয়া যথেষ্ট নয়

তাঁদের মেযাজ-প্রকৃতি এমন কেন ছিলো না? এজন্যে যে, নিজে সুস্থ হওয়া এক জিনিস, আর অন্যের চিকিৎসা করা আরেক জিনিস। প্রত্যেক সুস্থ মানুষই ডাক্তার হয় না। সুস্থ মানুষ সম্পর্কে বলা হবে, তার মাঝে কোনো রোগ নেই। কোনো সমস্যা নেই। অনেক তাগড়া। ঠিক আছে। কিন্তু সুস্থ হলেই সে কোনো অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করবে, তা জরুরী নয়। কারণ, ডাক্তার হতে হলে অনেক লেখা-পড়া করতে হয়। কাঠ-খড়ি পোড়াতে হয়। এরপর দাওয়াখানা খোলার অনুমতি লাভ হয়। এখন কেউ যদি বলে, আমি তো পুরোপুরি সুস্থ। আমার সব রিপোর্ট ঠিক আছে। আমার দেহের পুরো ব্যবস্থাপনা সচল আছে। কাজেই আমি ডাক্তার হওয়ার যোগ্য। কিংবা কেউ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে এলো। ডাক্তার তার চিকিৎসা করলো। যখন এ লোক শতভাগ সুস্থ হয়ে গেলো, তখন ডাক্তার তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো যে, 'তুমিও এখন ডাক্তারী করতে আরম্ভ করো'। কেননা তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছো। এটা ঠিক নয়।

'খেলাফত' একটি সাক্ষ্য

এখানেও একই অবস্থা যে, কেউ নিজের ইসলাহের উদ্দেশ্যে শায়খের কাছে এলো। শায়খ তার ইসলাহ করে দিলেন। সে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের উপর উঠলো। তার নামায ঠিক হলো। রোযা ঠিক হলো। শুধুমাত্র এ সব আমল দুরস্ত হওয়ার দ্বারাই সে 'খেলাফতে'র যোগ্য হয়ে যায় না।

'খেলাফতে'র অর্থ হলো, অপরকে চিকিৎসা করার যোগ্যতা লাভ হওয়া। আর অন্যের চিকিৎসা করা সকলের সাধ্যের বিষয় নয়।

এজন্যে আমাদের বুযুর্গদের এখানে বহু যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণের পর পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা শেষে 'খেলাফত' দেয়া হয়। কারণ, 'খেলাফত' দানের অর্থ হলো, মানুষের সামনে এ সাক্ষ্য ও সনদ দেয়া যে, আমি তাকে খুব ভালোভাবে পরখ করে, ঝালিয়ে দেখেছি, এখন সে তোমাদের রূহানী চিকিৎসাদানের যোগ্য হয়েছে।

'খেলাফত' এ কথার সনদ নয় যে, এ লোক সুস্থ ও সুন্নাতের অনুসারী। সুতরাং যতক্ষণ এ আস্থা না জন্মাবে যে, এ লোক অপরকে চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে এবং মুরীদ ও ইসলাহকামীদেরকে তাদের মেযাজ ও জরুরত মাফিক ব্যবস্থাপত্র দানে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন 'সাক্ষ্য' প্রদান করা জায়েয নয়।

আমাদের মুরুব্বীগণ এ ঝুঁকি নিতেন না

বুযুর্গদের রং বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কিছু বুযুর্গের রং ও মেযাজ এমন হয় যে, তারা ধারণা করেন, আমরা এ লোককে খেলাফত দিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে যোগ্য বানিয়ে দিবেন। কিন্তু আমাদের মুরুব্বীগণ এ ধরনের ঝুঁকি নিতেন না। আমাদের মুরুব্বীগণ বলতেন- সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঝুঁকি নিই না। এজন্যে যে, কেউ যদি এ মূলনীতি শিখে নেয় যে, 'অমুক জিনিসটি প্রশংসিত, আর অমুক জিনিসটি নিন্দিত' তাহলে সে সব জায়গায় এ মূলনীতি প্রয়োগ করবে। অথচ এতোটুকুই যথেষ্ট নয়, বরং আগন্তুক সম্পর্কে দেখতে হবে যে, তার জন্যে কোনটা উপযোগী, আর কোনটা উপযোগী নয়। সুতরাং অপরের ইসলাহ করা সবার কাজ নয়।

'খেলাফত' লাভের চিন্তা নিকৃষ্টতম অন্তরায়

হযরত থানভী রহ. এ কথাও বলেন যে, যখন শায়খের কাছে চিকিৎসার জন্যে যাবে, তখন নিজের চিকিৎসার প্রতিই মনোনিবেশ করবে। এ চিন্তায় থাকবে না যে, অমুক স্তর আমার হাসিল হোক, অমুক মাকামে আমি উন্নীত হই। বরং ফলাফলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শায়খের

হুকুম পালনে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আমল করতে থাকবে। অনেকে শায়খের কাছে যখন নিজের ইসলাহর জন্যে যায়, তখন তার ধ্যান-খেয়ালের মধ্যে থাকে যে, তিনি আমাকে এক সময় 'খেলাফত' দিবেন। এ খেয়াল ইসলাহের পথে নিকৃষ্টতম বাধা। এ খেয়াল থাকলে কখনই পরিপূর্ণ ইসলাহ হবে না। বরং তার ইসলাহ সম্ভবই নয়। কেননা তার ইসলাহের মধ্যে ইখলাস নেই। তার নিয়ত তো হলো, বিশেষ একটি পদ অর্জন করা। বলতে গেলে আল্লাহকে খুশী করার জন্যে সে শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। তার ইসলাহ চাওয়ার মধ্যে নিষ্ঠা নেই। আর যখন নিষ্ঠা থাকবে না এবং আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে শায়খের সাথে সম্পর্ক করবে না, তখন তার কোনো ফায়দা হবে না।

সুতরাং যখন কোনো শায়খের কাছে যাবে, তখন এ খেয়াল মাথা থেকে ছেঁটে ফেলবে। কেবলমাত্র ইসলাহের নিয়তে যাবে। বিশেষ কোনো পদ বা মাকাম অর্জন করাকে উদ্দেশ্য বানানো যাবে না।

ইবাদতে আগ্রহ, উদ্দীপনা ও স্বাদ লাভ করা উদ্দেশ্য নয়

এরপর হযরত থানভী রহ. অন্য এক মালফূযে ইরশাদ করেন–

'আগ্রহ ও উদ্দীপনা মৌলিক উদ্দেশ্যও নয় এবং কবুল হওয়ার শর্তও নয়। ইখলাসওয়ালা আমল যথেষ্ট, তাতে আবেগ না থাকলে এমনকি সহজাত কষ্ট হলেও সমস্যা নেই। إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ 'কষ্টের সময় উত্তমভাবে ওযু করার বেশি সওয়াব'[১] সংশ্লিষ্ট হাদীসটি এর স্পষ্ট দলীল। এ হাদীস দ্বারা উপরোক্ত দাবি তো প্রমাণিত হয়ই, অতিরিক্ত আরো প্রমাণিত হয় যে, এর ফলে প্রতিদান ও সওয়াবের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা এই যে, ইবাদত কারো জন্যে 'খাদ্যে'র মতো, কারো জন্যে 'ঔষধে'র মতো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঔষধ উপকারী হওয়া সেবনকারীর আগ্রহের উপর নির্ভরশীল নয়। আর আগ্রহ না থাকা অবস্থায় এর সেবন অধিক হিম্মত ও মুজাহাদার বিষয়। তেমনি নিজের উপর চাপ প্রয়োগ করে ইবাদত করায় অনেক হেকমতও রয়েছে।

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৪৭, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৪৩

যেমন আত্মশ্লাঘা থেকে মুক্তি লাভ এবং নিজের অপূর্ণতা অনুধাবন ইত্যাদি। সুতরাং খাঁটি বান্দার মত-পথ এমনটাই হওয়া উচিৎ।[১]

আবেগ-উদ্দীপনা প্রশংসনীয়, আর ইখলাস হলো কাম্য

হযরত থানভী রহ. এ মালফূযে বিস্ময়কর একটি উসূল বর্ণনা করেছেন। ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা থাকার বিষয়ে বহু লোক বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ এটা কোনো কাম্য বস্তু নয় এবং আমল কবুল হওয়ার জন্যে শর্তও নয়। এমন নয় যে, যখন তুমি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইবাদত করবে তখন তোমার ইবাদত কবুল করা হবে, নতুবা কবুল করা হবে না। উৎসাহ-উদ্দীপনার অর্থ হলো, নামাযের মধ্যে স্বাদ লাগা এবং দ্রুত নামায পড়তে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। এ ধরনের আবেগ-উদ্দীপনা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে একে খোদাপ্রদত্ত নিয়ামত মনে করতে হবে। এটা ভালো ও প্রশংসনীয় বিষয়। তবে তা মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য নয় এবং আমল কবুল হওয়ার শর্তও নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলবেন না যে, তুমি যে নামায পড়েছো, তা আবেগ-উদ্দীপনার সাথে পড়োনি, তাই তোমার নামায কবুল করা হবে না। নামায কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত হলো ইখলাস । সুতরাং আমল হতে হবে ইখলাসের সাথে এবং সুন্নাত মোতাবেক। এ দুই জিনিস যদি আমলের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ইনশাআল্লাহ, সে আমল আল্লাহর নিকট কবুল হবে। সে আমল যতো কষ্টের সাথে করুক, মনে যতো অনাগ্রহ থাকুক এবং যতো অলসতাই লাগুক না কেন। আপনি ভেবেছেন- নামায ফরয, আমাকে পড়তেই হবে। এ কথা চিন্তা করে আগ্রহ ছাড়াই নিজের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়েছেন। যেহেতু ইখলাসের সাথে এবং সুন্নাত মোতাবেক আপনি নামায আদায় করেছেন, এ জন্যে তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হবে। আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলবেন না যে, যেহেতু তুমি অনীহা ও অনাগ্রহ অবস্থায় নামায পড়েছো, তাই তোমাকে সাজা পেতে হবে। কারণ, এটি উদ্দেশ্যও নয় এবং আমল কবুল হওয়ার শর্তও নয়।

---

১. আনফাসে ঈসা, পৃ. ১৯৫

নামায আমার চক্ষু শীতলকারী

অবশ্য নামাযের মধ্যে আবেগ-উদ্দীপনা থাকা কাম্য। এর দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ

'নামায আমার চক্ষু শীতলকারী।'[১]

এ কথার অর্থ হলো, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মধ্যে এমন এক অপার্থিব স্বাদ ও ভাব উপলব্ধি হতো, যা দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে হতো না। তাঁর মধ্যে এ অবস্থা ছিলো ঠিক, কিন্তু অন্যদেরকে তিনি এ কথা বলেননি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নামাযে বিশেষ ঐ অবস্থা সৃষ্টি না হবে, যা আমার হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নামায কবুল হবে না। বরং অন্যদেরকে তিনি বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো, সেভাবেই নামায পড়ো।[২] তোমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট হবে।

আবেগহীন আমলে সওয়াব বেশি

অনেক লোক এ চিন্তায় অস্থির থাকে যে, নামাযে মজা আসে না। আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। ভাই! মজা তো উদ্দেশ্যই নয়? উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি। তা যদি লাভ হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। বরং হযরত থানভী রহ. বলেন যে, কোনো কোনো সময় যে ব্যক্তি আমলের মধ্যে অনেক বেশি স্বাদ পায়, তার তুলনায় ঐ ব্যক্তির আমলের সওয়াব বেশি হয়, যে মন না চাইলেও কষ্ট করে আমল করে এবং আমলের মধ্যে একেবারেই স্বাদ পায় না। দলিল ওই হাদীস, যাতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ......فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ

---

১. সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৩৮৭৮, মুসনাদু আহমাদ, মুসনাদু আনাস ইবনি মালিক, হাদীস নং ১১৮৪৫

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫, সুনানুদ দারিমী, হাদীস নং ১২২৫

'যে লোক ঐ সময় সুন্দর করে ওযু করে, যে সময় ওযু করা খুবই কষ্টকর ও পীড়াদায়ক, সে সীমান্ত পাহারার সওয়াব পায়।'[১] যেমন প্রচণ্ড শীতের মৌসুম, বরফ পড়ছে, পানি খুবই ঠাণ্ডা, গরম পানির কোনো ব্যবস্থা নেই, নামাযের সময় হয়ে গেছে, এমন সময় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযু করা খুবই কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মনে করে ওযু করবে, তার এ আমল জিহাদে গিয়ে রাতের বেলা সীমান্ত পাহারা দেয়ার মতো বলে গণ্য হবে।

এখন বলুন! এ ওযুতে সে কি কোনো মজা পেয়েছে? বোঝা গেলো, মন না চাইলেও আমল করলে কোনো কোনো সময় ঐ আমলের চেয়ে সওয়াব বেড়ে যায়, যা আবেগ-উদ্দীপনার সাথে করা হয়। কারণ, আবেগ-উদ্দীপনার সাথে করা আমলে কষ্ট হয় না।

যার নামাযে মজা আসে না তাকে মুবারকবাদ

এজন্যে হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলতেন- 'আমি ঐ লোককে মুবারকবাদ দেই, যে সারা জীবন নামায পড়েও মজা পায়নি; এরপরেও সে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে নামায পড়েছে।' কারণ, নামাযের মধ্যে মজা আসা তো ভালো, কিন্তু এতে আশঙ্কা থাকে যে, হতে পারে সে মজার জন্যে নামায পড়েছে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নয়। ফলে 'ইখলাস' হারানোর ভয় আছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নামাযের মধ্যে যখন অধিক মজা লাগতে থাকে, তখন নামাযীর মধ্যে আত্মশ্লাঘা জন্মাতে থাকে। এ রকম খেয়াল হতে থাকে যে, 'আমি তো এই মাকামে পৌছে গেছি'। তখন আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হয় যে, আমি তো বুযুর্গীর উচ্চ মাকামে পৌছে গেছি। আমি তো আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছি। ইবাদত আমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। ইবাদতের মধ্যে মজা আসার দরুন মানুষের মধ্যে এ সব খারাবি পয়দা হয়। পক্ষান্তরে যার নামাযে মজা আসে না, তার মনে এ সব খেয়াল আসবে কোত্থেকে? তার তো সর্বদা এই ভয় থাকবে যে, আমার নামায আবার আমার মুখেই ছুঁড়ে মারা হয় কি না!

---

১. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৪৭, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৪৩, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪২১

অবসরপ্রাপ্ত লোকের নামায

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. অতি সুন্দর একটি উদাহরণ দিতেন। বলতেন, মানুষ 'কাইফিয়্যাত' তথা ইবাদতের মধ্যে 'ভাব ও আবেগ'কে 'রূহানিয়াত' ও 'আধ্যাত্মিকতা' ভেবে থাকে। অর্থাৎ ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা ও মজা আসলে মনে করে, 'রূহানিয়াত' ও 'আধ্যাত্মিকতা' বেশি আছে। এ ধারণা ভুল। বরং যে ইবাদতে যতো বেশি সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে, ততো অধিক রূহানিয়াত বৃদ্ধি পাবে। রূহানিয়াতের সাথে 'কাইফিয়্যাতে'র কোনো সম্পর্ক নেই। পরে বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতেন যে, দুই জন লোক। তাদের একজন চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করছে। তার রেশন চালু আছে। পেনশন দিয়ে ভালোই যাচ্ছে তার দিনকাল। ছেলে-সন্তানেরাও কামাই করছে। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদী শেষ করে ফেলেছে। এখন তার আর কোনো চিন্তা-ফিকির নেই। আরামে ঘরে বসে অবসর জীবন কাটাচ্ছে। লোকটি আযান হওয়ার আগেই ওযু করে। আযান হলেই মসজিদে চলে যায়। প্রথম কাতারে নামায আদায় করে। ওখানে গিয়ে 'তাহিয়্যাতুল অযু' ও 'দুখুলুল মসজিদ' আদায় করে। সুন্নাত পড়ে। নামাযের অপেক্ষায় থেকে যিকির করে। সবশেষে যখন জামাত দাঁড়ায় পরম ভক্তিভরে খুশূ-খুযুর সাথে নামায আদায় করে। তারপর পরম তৃপ্তিভরে ঘরে ফিরে আসে এবং পরবর্তী নামাযের প্রস্তুতি ও তার অপেক্ষায় থাকে।

ফেরিওয়ালার নামায

আরেক লোক ঠেলা গাড়িতে মাল রেখে ফেরি করে নিজের ও পরিবারের পেট চালায়। সড়কের কিনারে দাঁড়িয়ে আওয়াজ হেঁকে নিজের পসরা বিক্রি করে। ঘরে খাবার সদস্য দশজন। সব সময় চিন্তা, যে কোনো উপায়ে মাল বিক্রি করে কিছু পয়সা উপার্জন করতে পারলে ছেলে-মেয়েদের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করতে পারতাম। এ অবস্থায় নামাযের আযান হলো। ক্রেতারা তার থেকে পণ্য ক্রয় করছে। একে মাল দিচ্ছে , ওকে মাল দিচ্ছে। কিন্তু তার মাথায় ঠিকই 'আযান হয়েছে নামায পড়তে হবে' চিন্তাও ঘুরপাক খাচ্ছে। সে খরিদদারদেরকে তাড়াতাড়ি বিদায় করছে। নামাযের জামাতের সময় হতেই ঠেলা গাড়ি

এক ধারে সরিয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দ্রুত মসজিদে চলে গেল। দ্রুত ওযু করে জামাতে শরীক হলো। এখন তার মন রয়েছে এক জায়গায়, আর চিন্তা রয়েছে আরেক জায়গায়। তার কেবলই চিন্তা, আমার ঝুড়ি কেউ নিয়ে যায় কি না, পণ্য চুরি হয়ে যায় কি না। সে নামাযে একাগ্রতা আনতে সচেষ্ট হলো, কিন্তু এ অবস্থায় মনে একাগ্রতা আসা মুশকিল। তবে সে সুন্নাত তরীকায় নামায পড়লো, তারপর দ্রুত সুন্নাত নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ঠেলা গাড়ির কাছে চলে গেল। কাপড় সরিয়ে আবারো আওয়াজ দিয়ে দিয়ে গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো এবং বেচাকেনা আরম্ভ করলো।

রূহানিয়াত কার নামাযে বেশি?

হযরত বলেন- বলো! এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কার নামাযে রূহানিয়াত বেশি? বাহ্যত মনে হবে, অবসরপ্রাপ্ত লোক- যে অত্যন্ত প্রশান্ত মনে এবং ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করছে- তার নামাযে রূহানিয়াত বেশি রয়েছে! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঠেলাগাড়িতে মাল ভরে যে ফেরি করে বিক্রি করছিলো– তার নামাযেই রূহানিয়াত বেশি। কেননা, প্রথম লোকটার তো কোনো কাজ ছিলো না, তাই সে নিজেকে নামায ও ইবাদতের জন্যে অবসর করে নিয়েছে। সুতরাং নামায পড়া তার কোনো পরাকাষ্ঠা নয়। পরাকাষ্ঠা তো হলো ফেরিওয়ালার নামায। কেননা তার ঘরে খাবারের সদস্য দশজন। তাদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রেতারা মাল কেনার জন্যে ঠেলা গাড়ির নিকট দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় আযানের আওয়াজ কানে আসতেই ঠেলা গাড়ি একদিকে ঢেকে রেখে নামায পড়তে মসজিদে চলে গেল। তার নামাযে অধিক রূহানিয়াত রয়েছে। কারণ, সে নামাযের জন্যে অধিক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট করেছে। এ কারণে তার আমলের মধ্যে অধিক রূহানিয়াত রয়েছে এবং সে সওয়াবও পাবে বেশি। সুতরাং আবেগ-উদ্দীপনা থাকলে ইবাদত কবুল হবে, নতুবা নয়; এ ধারণা ঠিক নয়।

আল্লাহর দরবারে হুকুম তামিলের জযবা দেখা হয়

আল্লাহ তা'আলার দরবারে হুকুম পালনের জযবা দেখা হয়। আমি তাকে যে হুকুম দিয়েছি, পরিস্থিতি তার মন-মানসিকতাকে বিক্ষিপ্ত করা

সত্ত্বেও সে তা পালন করতে এসেছে। তবে যেহেতু ইখলাসের সাথে এসেছে এবং আমার হাবীবের সুন্নাত মোতাবেক ইবাদত আঞ্জাম দিয়েছে। তাই তার ইবাদত কবুল। এ জন্যে হযরত বলেন, আবেগ-উদ্দীপনা অর্জনের চিন্তা করো না।

সাকী যেভাবে পান করান তাই তার মেহেরবানী

তবে হ্যাঁ, কারো যদি আবেগ-উদ্দীপনার নিয়ামত হাসিল হয়ে যায় তাহলে এর জন্যেও আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার এ ইবাদতকে সহজ করে দিয়েছেন। ইবাদতে আমি মজা ও তৃপ্তি পেতে শুরু করেছি। তবে এর পেছনে অনেক বেশি মাথা ঘামানো ঠিক নয়। সুতরাং তিনি শেষে মাওলানা রূমী রহ.-এর কবিতার দু'টি চরণ লিখেছেন–

بدرد وصاف ترا حکم نیست دم در کش

کہ آنچہ ساقی ما ریخت عین الطاف ست

অর্থাৎ, তোমার এ অধিকার নেই যে, তুমি সাকীর কাছে দাবি করবে যে, আমাকে পরিচ্ছন্ন শরাব দিন, তলানি দিবেন না। বরং সাকী যেমন শরাব দেন, তাঁর একান্তই মেহেরবানী। তিনি পরিচ্ছন্ন শরাব দেন, কিংবা তলানিযুক্ত, তবু যেন দেন।

এমনিভাবে আল্লাহ পাকের কাছে আমলের তাওফীক কামনা করতে হবে। যখন তাঁর পক্ষ থেকে আমলের তাওফীক হয়ে যাবে- আমলে মজা আসুক বা না আসুক এবং স্বাদ লাগুক বা না লাগুক- তখন সেটা তাঁর দয়া ও অনুকম্পা মনে করতে হবে। আমলের যে তাওফীক হচ্ছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। এর চেয়ে বেশি কিছুর চিন্তা করবে না।

সারকথা

ইবাদতের মধ্যে আবেগ-উদ্দীপনা ও মজা আসা মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এবং তা ইবাদত কবুল হওয়ার জন্যে শর্তও নয়। সুতরাং এ চিন্তায় না পড়ে ইখলাস ও সুন্নাত মোতাবেক ইবাদতের চিন্তা-ফিকির করুন। পরে এটা লাভ হলে ভালো, না হলে দুঃখ-দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আজকাল বহু

লোক এ চিন্তায় পেরেশান যে, আমরা নামায পড়ছি, কিন্তু নামাযে মজা পাই না। এর দরুন নিজের আমল ও ইবাদতের অবমূল্যায়ন ও না-শোকরী শুরু করে দেয়। এমনটি করা উচিত নয়। ইবাদতের মধ্যে দু'টি জিনিসই মুখ্য ও যথেষ্ট।

এক. ইখলাস থাকা,

দুই. সুন্নাত মোতাবেক হওয়া

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আমলের পার্থিব ফলাফল*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

একটি মালফূযে হযরত থানভী রহ.বলেন–

'নেক আমলের মধ্যে নগদ উপকারও রয়েছে, শুধু বাকীই নয়। হ্যাঁ একটি উপকার বাকী থাকে, তা হলো- সওয়াব। এর সাথে আরেকটি নগদ জিনিসও আছে, তা হলো- আশা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক হওয়া। যা নেক আমল ছাড়া লাভ হয় না। এমনিভাবে বদ আমলেরও একটি ফল বাকী থাকে, আরেকটি থাকে নগদ। বাকী হলো, জাহান্নামের আযাব, আর নগদ হলো, ভীতি, অন্ধকার ও অস্থিরতা, যা গোনাহের অবশ্যম্ভাবী ফল।'[১]

আমলের ফল নগদ-বাকী উভয় প্রকারই হয়ে থাকে

এ মালফূযের উদ্দেশ্য একটি ভুল বুঝাবুঝির অবসান। তা হলো, সাধারণত মানুষ মনে করে, আমরা দুনিয়াতে যে আমল করি– তা নেক আমল হোক বা বদ আমল- এর ফলাফল ও প্রতিদান, লাভ ও ক্ষতি সবই আখেরাতে প্রকাশ পাবে। আমল ভালো হলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাওয়া যাবে, আর খারাপ হলে আযাব দেয়া হবে। মোটকথা, যা কিছু হোক, সওয়াব-আযাবের ব্যাপার পুরোটাই বাকী। দুনিয়াতে নগদ কিছু পাওয়া যাবে না।

হযরত থানভী রহ. এ ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করছেন। বলছেন- আমলের সব ফলাফল এবং এর লাভ-ক্ষতি বাকী নয়, বরং কিছু ফল দুনিয়াতে নগদও পাওয়া যায়।

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ডঃ ৬, পৃ. ৩০৮-৩২০

১. আনফাসে ঈসা, পৃ. ২০৫

নেক আমলের প্রথম নগদ ফায়দা

সেই নগদ ফায়েদাগুলো কী? তিনি বলেন- নেক আমলের প্রথম নগদ ফায়দা এই যে, নেক আমলের পর মানুষের মনে এই আশা জাগে যে, খুব সম্ভব আল্লাহ পাক স্বীয় ফযল ও করমে আমলটি কবুল করে এর বদৌলতে আমাকে ধন্য করবেন। এর নাম 'আশা'। এটি নেক আমলের প্রথম ফায়দা, যা মানুষের লাভ হয়।

নিজের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত

এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে নেক আমলের তাওফীক দিয়েছেন, মানুষের দৃষ্টি যদি সে দিকে যায় এবং সে চিন্তা করে যে, আমার দ্বারা বড় ভালো কাজ হয়েছে এবং এর ফলে সে 'উজব' তথা আত্মমুগ্ধতায় লিপ্ত হয়, কিংবা মনে করে যে, আমার এ নেক আমল আমাকে নাজাত দিবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে- সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় একে আত্মমুগ্ধতা ও আত্মতুষ্টি বলে- যা অতি বিপজ্জনক একটি বিষয়।

যেমন, এক লোক নামায পড়ে মনে করলো, আমি খুব ভালো নামায পড়ি। যেহেতু ভালো নামায পড়ি তাই আমি খুব ভালো মানুষ। কিংবা চিন্তা করলো, এ নামায আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এমন চিন্তা করা খুবই বিপজ্জনক।

একদিকে হযরত থানভী রহ. বলেন- আমলের নগদ ফল এই যে, আমল দ্বারা 'আশা' সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন- নিজের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে 'আত্মমুগ্ধতা'য় লিপ্ত হওয়া নাজায়েয। কবির ভাষায়–

ہزار نکتۂ باریک تر ز مو ایں جاست

نہ ہر کہ سر تراشد قلندری داند

'চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম হাজারও রহস্য রয়েছে এখানে।
শুধু মাথা নেড়ে করলেই কেউ বুযুর্গ হয়ে যায় না।'

'আত্মমুগ্ধতা' ও 'আশা'-এর মধ্যে পার্থক্য

এখন প্রশ্ন হলো, এ চিন্তা 'আত্মমুগ্ধতা'র অন্তর্ভুক্ত, না 'আশা'র পর্যায়ভুক্ত, এতোদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করা যাবে কীভাবে? উভয়ের

মাঝে পার্থক্য এভাবে করা যাবে যে, কোনো আমলের পর অন্তরে যদি আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ হয় এবং পরিণতিতে শোকর আদায় করে বলে যে, আলহামদুলিল্লাহ নেক আমলের তাওফীক লাভ হয়েছে এবং এ 'আশা'ও জাগে যে, আল্লাহ পাক যখন আমলের তাওফীক দিয়েছেন, তাই আশা করি তিনি আমাকে তাঁর ফযল ও করমে ধন্য করবেন- এ পর্যায় পর্যন্ত হলো 'আশা'। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

'নেক আমল দ্বারা যখন তুমি আনন্দ লাভ করো এবং বদ আমলের কারণে যখন কষ্ট ও দুঃখ অনুভব করো, এটা তোমার ঈমানের আলামত।'[১]

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন- অনেক সময় কোনো নেক আমল করি এবং আমল করার পর আমি আনন্দ বোধ করি যে, আলহামদুলিল্লাহ একটি নেক আমল করেছি, এটি আত্মমুগ্ধতা বা অহংকার নয় তো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

لَا ، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

'নেক আমল করে তোমার যে আনন্দ লাভ হয়েছে, তা মুমিনের জন্যে নগদ সুসংবাদ।'[২] সুতরাং এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

আল্লাহর দয়ায় জান্নাত লাভ হবে, আমল দ্বারা নয়

সুফিয়ায়ে কেরাম যাকে 'আত্মমুগ্ধতা' বলেন, তা হলো- নেক আমল করার পর আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হওয়া যে, আমার আমল এত ভালো হয়েছে যে, এটি আমাকে সরাসরি জান্নাতে নিয়ে যাবে। আমার জান্নাতে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার করুণার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আমার আমলই আমাকে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য করে তুলেছে। এ ধারণা খুবই ভয়াবহ। আরে! যোগ্যতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি যতো বেশি আমলই করুন না কেন তাতে জান্নাতের হকদার হবেন না। কেননা জান্নাতের নিয়ামত হলো সীমাহীন। এর মোকাবেলায় আপনার আমলের কী মূল্য

১. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২১১৪৫
২. সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৮০, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২০৪১৬

আছে? আপনি এক মিনিট বা পাঁচ মিনিটে একটি দু'টি আমল করলেন, আর বলতে শুরু করলেন, ওই আমলের বদলে আমাকে জান্নাত দিতে হবে। জান্নাত তো বিরাট ব্যাপার। এর নিয়ামত চিরন্তন। যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। চার রাকাতের বিনিময়ে এমন জান্নাত চাচ্ছেন? আমল যতো বেশিই হোক না কেন, তা দ্বারা আপনি জান্নাতের হকদার হতে পারেন না। ধরুন! আপনি ৮০ বছর হায়াত পেয়েছেন এবং হায়াতের পুরো সময় সিজদায় কাটিয়ে দিয়েছেন। তো আপনি সর্বোচ্চ আশি বছর ইবাদত করেছেন। অপরদিকে জান্নাতের নিয়ামত?! একশ' বছরের, হাজার বছরের বা লাখ বছরের জন্যে নয়, তা হলো চিরন্তন ও অনন্তকালের জন্যে। সুতরাং মানুষ সারা জীবন ইবাদত করলেও জান্নাতের হকদার হতে পারে না। এটা তাঁর করুণা যে, কোনো কোনো সময় তিনি বলে দেন, হে বান্দা! তুমি এ আমল করেছো, তাই তোমাকে আমি জান্নাতের হকদার বানিয়ে দিয়েছি।

কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াতে 'হকদার' হওয়ার প্রতি ইশারাও করেছেন। তবে তাও তাঁর করুণামাত্র। নতুবা আমলের মধ্যে সত্ত্বাগতভাবে এ যোগ্যতা নেই যে, তাকে জান্নাতের হকদার করবে। গোটা জীবন রোযা রেখে কাটিয়ে দাও, সারা জীবন ইবাদত, যিকির ও তাসবীহ পাঠে অতিবাহিত করো তবুও জান্নাতের হকদার হতে পারবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও জান্নাত

এ জন্যেই হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- কোনো মানুষের কোনো আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন- আপনার আমলও কি আপনাকে জান্নাতে নিতে পারবে না? তিনি জবাবে বললেন-

لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ

'না, আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতে ঢেকে নেন।'[১]

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮২, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৫০৩৬, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৪৮, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪১৯১

দেখুন! সারা জাহানের কারো আমলই মান ও পরিমাণের বিচারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের বরাবর তো দূরের কথা, তার ধারে-কাছেও হবে না। অথচ তিনিই বলছেন- আল্লাহর রহমত আমাকে ঢেকে না নিলে আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমল দ্বারা জান্নাতের হকদার হওয়া যায় না।

নেক আমল রহমতের আলামত

অবশ্য আল্লাহ পাক নেক আমলকে তাঁর রহমত ও দয়ার আলামত বানিয়েছেন। অর্থাৎ যদি কেউ নেক আমল করে তাহলে এটা আলামত যে, ইনশাআল্লাহ, তার উপর আল্লাহর করুণা ও দয়া হবে। নেক আমল করার পর খুশির কথা এই যে, যখন আল্লাহ আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিয়েছেন, তাই এটা আলামত যে, আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে সিক্ত করবেন। সুতরাং এ আনন্দ, আলামত প্রাপ্তির আনন্দ। এ জন্যে আনন্দ নয় যে, আমি বিরাট এক কাজ করেছি, যা আমাকে জান্নাতের হকদার বানাবে। এ সূক্ষ্ম কথাটি মাথায় রাখতে হবে।

আমল দ্বারা জান্নাতের হকদার হয় না

আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো, যখন কোনো বান্দা নেক আমল করে, তখন তিনি তাকে ধন্য করেন। তাকে করুণা ও দয়ার পাত্র বানান। আমল ছাড়া সাধারণত দয়া ও করুণার পাত্র না। এখন যদি কেউ এ কথা ভাবে যে, আমার আমল যখন আমাকে জান্নাতে পৌছাবে না, তাহলে আমল করে লাভ কী? তাই বসে বসে আল্লাহর কাছে কেবল চাইতেই থাকো- হে আল্লাহ ! আমাকে আপনার দয়ার পাত্র বানান।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর করুণার পাত্র হওয়া ও জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, যখন কোনো বান্দা আমল করবে তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি করুণা করবেন। সুতরাং আমল জরুরী, কিন্তু তা জান্নাতপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ কারণ নয়। বরং আমল আল্লাহর করুণা লাভের একটি আলামত।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. বেশ প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ কথা বলেছেন- 'যে ব্যক্তি আমল করে এবং তার উপর ভিত্তি করে আশা করে যে, এ আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, তাহলে সে অহেতুক মেহনত করছে। পক্ষান্তরে যে লোক এ আশা করে যে, আমি আমল ছাড়াই জান্নাতে চলে যাবো, তাহলে সে আত্মপ্রবঞ্চণার শিকার।'

এ উভয় চিন্তাই ভুল। কেননা কেউ-ই আমল ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে না, অপরদিকে শুধু আমলও তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। যতক্ষণ না আমলের সাথে আল্লাহর ফযল, করম ও রহমত শামিল হবে। সুতরাং আমলও করতে হবে এবং তাকে নাজাতের আলামতও মনে করতে হবে। তবে আমলকে জান্নাতের হকদার হওয়ার কারণ মনে করা যাবে না। সুতরাং যখন নেক আমলের তাওফীক হবে, তখন সেজন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করুন। এবং বলুন- হে আল্লাহ! আপনার মেহেরবানী যে, আমাকে এই আমল করার তাওফীক দান করেছেন। সেই সাথে এ আশাও করুন যে, আল্লাহ তা'আলা নেক আমলের তাওফীক যখন দান করেছেন, আমাকে তিনি সম্মানিতও করবেন। যদি সম্মানিত না করতেন, তাহলে নেক আমলের তাওফীক দিতেন না।

নেক আমলের তাওফীক দানই তাঁর পক্ষ থেকে জবাব

মাওলানা রূমী রহ. বলেন- কখনো কখনো মানুষের মনে এমন খেয়াল জাগে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে এত ডাকি, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে এ ডাকের কোনো উত্তরই আসে না। একবার হলেও উত্তর আসতো! আমরা দু'আর মাধ্যমে তাঁকে ডাকছি, কখনো যিকিরের মাধ্যমে ডাকছি, কখনো নামাযের মাধ্যমে, আবার কখনো তিলাওয়াতের মাধ্যমে, কিন্তু কখনোতো কোনো জবাব আসে না। একতরফা কাজ হচ্ছে! এই নির্বুদ্ধিতামূলক খেয়াল কখনো কখনো অন্তরে জাগে। মাওলানা রূমী রহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার জবাব এমন–

گفت اے اللہ تو لبیک ما است

অর্থাৎ, আমার নাম নেয়ার যে তাওফীক তোমার হয়েছে, এটাই আমার পক্ষ থেকে উত্তর।

তুমি যখন আমার নাম একবার নাও, এরপর যখন দ্বিতীয়বার আমার নাম নেয়ার তাওফীক হয়, এটাই আমার পক্ষ থেকে জবাব এবং 'লাব্বাইক'। এ জবাব না হলে দ্বিতীয়বার আমার দরবারে আসার তাওফীকই হতো না। তোমার 'আল্লাহ' বলাই আমার পক্ষ থেকে 'লাব্বাইক' বলা, এবং তোমার পূর্বের 'যিকির' কবুল হওয়ার আলামত।

এক নেক আমলের পর দ্বিতীয় নেক আমলের তাওফীক হওয়া

এ জন্যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলতেন- একটা নেক আমল করার পর যখন ঐ নেক আমলই দ্বিতীয়বার করার তাওফীক হয়, তখন বুঝে নাও যে, প্রথম আমল কবুল হয়েছে। যদি প্রথম আমল কবুল না হতো, তাহলে দ্বিতীয়বার ও আমল করার তাওফীক লাভ হতো না। যেমন আপনি যোহরের নামায পড়েছেন, পরে আছরের নামায পড়ার তাওফীক হয়েছে, তাহলে বুঝে নিন, আপনার যোহরের নামায কবুল হয়েছে। যদি যোহরের নামায কবুল না হতো, তাহলে আপনি আছরের নামায পড়ার তাওফীক পেতেন না। গতকাল আপনি রোযা রেখেছেন, আজ আবারও রেখেছেন। তাহলে বুঝে নিন, আপনার গতকালের রোযা কবুল হয়েছে। যদি গতকালের রোযা কবুল না হতো, তাহলে দ্বিতীয়বার রোযা রাখার তাওফীক হতো না।

মোটকথা, মানুষ আমল করতে থাকবে। আমল করা ছাড়বে না। আমল করে এ কথা মনে করে খুশী হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটি নেক আমল করার তাওফীক দিয়েছেন। তিনি তাওফীক যখন দিয়েছেন, তখন ইনশাআল্লাহ আমাকে সম্মানিত করার ইচ্ছাও তিনি করেছেন। এর চেয়ে আগে বেড় না। মনে করো না যে, আমার দ্বারা বড় একটি আমল হয়েছে। আমি অব্যর্থ তীর মারতে পেরেছি। এখন আমি জান্নাতের হকদার হয়ে গেছি। কেননা এমনটি ভাবা 'আত্মমুগ্ধতা' কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'আত্মম্ভরিতা'। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

মোটকথা, নেক আমলের একটি নগদ ফায়দা এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি 'আশা' তৈরি হয়।

নেক আমলের দ্বিতীয় নগদ ফায়দা

নেক আমলের দ্বিতীয় নগদ ফায়দা এই যে, 'আল্লাহর সাথে সম্পর্ক' সৃষ্টি হয়। আপনি যে নেক আমলই করবেন, তা আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বৃদ্ধি করবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হওয়া সকল সফলতার মূল। যেমন, আপনি ফজরের নামায পড়লেন, ফলে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক কায়েম হয়ে গেল। পরে যোহরের নামায পড়লেন, এতে সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেলো। পরে আছরের নামায পড়লেন, মাগরিব ও ইশার নামায পড়লেন, তো প্রতিবারই আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের ব্যাপারটি এমন যে, যদি এক মানুষ আরেক মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকে, তাহলে একটা সীমা পর্যন্ত মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু একটা সীমায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়। সে মনে করে যে, এ লোক তো আমার মাথায় চড়ে বসেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে তিরস্কার করবে যে, তুমি তো আমাকে অস্থির করে ছাড়লে। সুতরাং অধিক সাক্ষাৎ বিরক্তি সৃষ্টি করে, বিরাগভাজন বানায়। মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

زُرْغِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا

'দেরিতে সাক্ষাৎ করো, বন্ধুত্ব গাঢ় হবে।'[১]

তুমিই বিরক্ত হয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপার এর বিপরীত, তাঁর সাথে যত সাক্ষাৎ করবে, সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا

'তোমাদের বারবার মোলাকাতে আল্লাহ পাক বিরক্ত হন না, এমনকি তোমরাই বিরক্ত হয়ে পড়ো।'[২]

---

১. আমু'জামুল কাবীর লিত তাবরানী, খণ্ড- ৪, পৃ. ২৬, মুখতারুল আহাদীসিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৯৭

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৪১, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১৩০৮, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৭৫৪, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১১৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪২২৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৩১১১

সুতরাং যতো চাও ইবাদত করো। যতো চাও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়াও। সম্পর্ক বেড়ে চলবে, কিন্তু বিরক্তি আসবে না। প্রত্যেক নেক আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক যতো বৃদ্ধি হবে, ততো বেশি আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ হবে। ততো বেশি প্রশান্তি হাসিল হবে। ততো বেশি গোনাহ থেকে বাঁচার শক্তি লাভ হবে। ততো বেশি শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজতে থাকা যাবে। নফস ও শয়তান সেই সময় হামলা করে, যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল থাকে। এমতাবস্থায় কখনো নফস পদস্খলিত করে, কখনো শয়তান ধোঁকা দেয়। কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যখন মজবুত হয়, তখন শয়তান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হামলা করে না। সুতরাং প্রতিটি নেক আমলের নগদ ফায়দা হলো, তার দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

নেক আমলের তৃতীয় নগদ ফায়দা

হযরত থানভী রহ. নেক আমলের তৃতীয় নগদ ফায়দা এখানে উল্লেখ করেননি, কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় তার আলোচনা করেছেন। খোদ কুরআনুল কারীমেও তার উল্লেখ আছে। তা হলো নেক আমল দ্বারা মানুষের মনে প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

'আল্লাহর যিকির দ্বারাই কেবল অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।'[১]

প্রশান্তি ও স্থিরতা এমন এক সম্পদ, যা লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় করলেও লাভ হয় না। কোনো বাজারে তা পাওয়া যায় না। অবশ্য নেক আমলের বৈশিষ্ট্য হলো, তা অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে। প্রশান্তি এমন এক সম্পদ, যার মতো সম্পদ দুনিয়ায় নেই। এক লোকের কাছে মাল-দৌলত আছে, কুঠি ও বাংলো আছে, চাকর-নওকর আছে, কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি নেই, তার এসব দৌলত বেকার। পক্ষান্তরে এক লোকের মাটির ঘর, ঝুপড়ি ঘর, কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি আছে। তো এই লোক

---

১. সূরা র'দ, আয়াত ২৮

পূর্বের লোকের চেয়ে হাজার গুণ ভালো অবস্থায় আছে। মোটকথা, আল্লাহ পাক তাঁর যিকির ও ইবাদতের মধ্যে শান্তি ও তৃপ্তির বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এটা নেক আমলের নগদ ফায়দা, যা এ দুনিয়াতেই লাভ হয়।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর উক্তি

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন-

'যদি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা জানতে পারতো যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কী পরিমাণ স্বাদ ও শান্তির জীবন দান করেছেন, তাহলে তারা খোলা তরবারী নিয়ে আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসত। কিন্তু এই বেওকুফদের জানা নেই যে, এ দৌলত তরবারীর জোরে লাভ করা যায় না। এ সম্পদ তো লাভ হয় আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে। তাঁর সাথে সম্পর্ক কায়েম করার দ্বারা এ দৌলত লাভ হয়।'

এ প্রশান্তি নেক আমলের নগদ ফায়দা, যা দুনিয়াতেই লাভ হয়।

নেক আমলের চতুর্থ ফায়দা

নেক আমলের চতুর্থ ফায়দা এই যে, এক নেক আমল আরেক নেক আমলের মাধ্যম হয়। আপনি একটি নেক আমল করলে তা আরেকটি নেক আমলকে আকর্ষণ করবে। গোনাহের বৈশিষ্ট্য হলো, এক গোনাহ আরেক গোনাহকে টানে। এমনিভাবে আপনি একটি নেক আমল করলে আরেকটি নেক আমলের তাওফীক লাভ হবে।

মোটকথা, নেক আমল দ্বারা চারটি নগদ ফায়দা হয়, যা মানুষ দুনিয়াতেই লাভ করে থাকে।

গোনাহের প্রথম ক্ষতি

এরপর তিনি বলেন- একইভাবে বদ আমলেরও একটি ফল বাকী, আরেকটি নগদ। গোনাহের বাকী ফল- যা আখেরাতে পাওয়া যাবে- তা হলো, জাহান্নামের আযাব। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন। আর গোনাহের নগদ ক্ষতি হলো ভয়, অন্ধকার ও অস্থিরতা, যা গোনাহের কারণে আবশ্যকীয়ভাবে হয়ে থাকে। অর্থাৎ গোনাহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অন্ধকার রেখে

দিয়েছেন। কারো যদি রুচি-প্রকৃতিই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে বুঝতে পারে না যে, এটি অন্ধকার ও অস্থিরতা। উল্টো সে আরো একে মজাদার মনে করে। কিন্তু বাস্তবে তা অস্থিরতা ও অন্ধকার। এর ফল অবশ্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

গোনাহের স্বাদের দৃষ্টান্ত

হযরত থানভী রহ. গোনাহের স্বাদের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন- গোনাহের স্বাদ এমন, যেমন কারো চুলকানি হয়েছে, সে চুলকাতে মজা পায়। এমনকি প্রবাদ রয়েছে যে- দুনিয়াতে দু'টি জিনিসের মধ্যেই কেবল মজা আছে– এক, চুলকানিতে, দুই রাজনীতিতে। চুলকানিতে এত মজা যে, একে রাষ্ট্র পরিচালনার মজার সাথে এক করে তুলে ধরা হয়েছে। সত্যিই চুলকানি হলে চুলকাতে যে মজা লাগে তার সাথে কোনো কিছুরই তুলনা চলে না। এ থেকে বাঁচা মুশকিল হয়ে থাকে। কিন্তু চুলকানি ছাড়তেই দেখবেন, মরিচের গুড়ার মতো জ্বলছে। চুলকানি আরো বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়বার চুলকালে দেখবেন, আবারো মজা পাচ্ছেন। কিন্তু চুলকানি আরো বেড়ে গেছে। যতো চুলকাবেন, ততো চুলকানি বাড়তে থাকবে। গোনাহের ব্যাপারটিও ঠিক এমনই। গোনাহ করতে স্বাদ লাগে ঠিকই, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত টেনশন, অন্ধকার ও উৎকণ্ঠা রেখে যায়।

স্বভাবই যদি বিকৃত হয়ে যায়!

তবে যদি কারো স্বভাবই বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে গোনাহের পর তার উৎকণ্ঠা ও অন্ধকার অনুভূত হয় না। যেমন, কারো যদি দুর্গন্ধ অনুভব করার অনুভূতিই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে দুর্গন্ধের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতেই সে মজা পায়। আমি একবার দেখেছি, বিরাট একটি ময়লার স্তুপ। তা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। নিকট দিয়ে হেঁটে যাওয়াও কঠিন। কিন্তু এক পাগল ওই স্তুপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কুকুর গোশতের একটা টুকরা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো। পাগল কুকুর থেকে টুকরাটা ছিনিয়ে নিলো। সে বিজয় লাভ করে আনন্দ প্রকাশ করছিলো যে, আমি সফল হয়েছি। বিজয়ী বেশে সে অট্টহাসি দিচ্ছিলো। তার

কাছে দুর্গন্ধ লাগছিলো না। কেন? কারণ, তার অনুভূতিশক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। এ জন্যে মুর্দা ও আবর্জনা তার কাছে সম্পদ মনে হচ্ছিলো।

তাকওয়ার অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেলে!

এমনিভাবে যখন মানুষের ভিতর থেকে ঈমান ও তাকওয়ার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, তখন রুচি বিকৃত হয়ে যায়। তখন মানুষ গোনাহ করে মজা পায়। সে গোনাহের মাঝে না অন্ধকার অনুভব করে, না ভয়-ভীতি। আল্লাহ হেফাজত করুন! এটি খুব ভয়াবহ অবস্থা। কারণ, প্রকৃতপক্ষেই গোনাহের মধ্যে অন্ধকার, অস্থিরতা ও আতঙ্ক রয়েছে। সুতরাং গোনাহের নগদ ক্ষতি এই যে, গোনাহ করার পর অন্তরে শান্তি থাকে না। সুতরাং তাদেরকে দেখুন! যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি ও বিত্ত-বৈভব লাভ করেছে– এরপরও তারা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু কেন করছে? অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতো, তাহলে একটা কথা ছিলো। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যে আত্মহত্যা করছে, তা এ জন্যে যে, মনে শান্তি নেই।

গোনাহের দ্বিতীয় নগদ ক্ষতি

গোনাহের দ্বিতীয় নগদ ক্ষতি এই যে, গোনাহ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। গোনাহ মানুষের সামনে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো করে উপস্থাপন করে। এটিও এক ধরনের অন্ধকার। এটিও গোনাহের নগদ ক্ষতি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে সমস্ত গোনাহ থেকে এবং গোনাহের সমস্ত ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাহায্য আসবে আমলের পর*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءُ مِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرُهٗ، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لَقِيَنِيْ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا جَعَلْتُ لَهٗ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنِ اقْتَرَبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً.

নেকী-বদীর প্রতিদান

দরবেশ চরিত্রের সাহাবী হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- (এটি একটি হাদীসে কুদসী। হাদীসে কুদসী বলা হয়, যার মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কোনো কথা এভাবে বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন')

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-১১, পৃ. ১২১-১৪৫

'যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল করে, আমি তাকে তার দশগুণ সওয়াব ও প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় বা গোনাহের কাজ করে, তাকে অতোটুকু শাস্তি দিয়ে থাকি, যতোটুকু অন্যায় বা গোনাহের কাজ সে করেছে। গোনাহের শাস্তি দ্বিগুণও করি না, বরং গোনাহের সমান শাস্তি দেই, বা মাফ করে দেই।'[১]

প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব দশগুণ

এ হাদীসে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে- 'তোমরা যে নেক আমলই করো না কেন তার দশগুণ সওয়াব আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে।' নেক কাজের সওয়াবের এ অঙ্গীকার কোনো মানুষের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে না, অঙ্গীকার করা হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। বিশেষ কোনো নেক আমলের জন্যেও তিনি এ সওয়াব নির্ধারণ করেননি, বরং তিনি বলেছেন- যে কোনো নেক আমল হোক না কেন- ফরয হোক বা নফল, একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা হোক, বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা হোক- প্রত্যেকটির সওয়াব অবশ্যই দশগুণ দেয়া হবে।

রমাযান ও শাওয়াল মাসের রোযার সওয়াব

এটা শাওয়াল মাস। এ মাসে ছয়টি রোযা রাখা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব দান করেন।'[২]

প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব দশগুণ দেয়ার মূলনীতির উপর সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়ার ভিত্তি। পবিত্র রমাযানের ত্রিশ রোযা। রমাযান যদি উনত্রিশ দিনেও হয়, তবুও আল্লাহ তা'আলার নিকট ত্রিশ

---

১. কিতাবুয যুহদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩৬৬, শু'য়াবুল ঈমান লিল বাইহাকী, খণ্ড, ২ ১৭, হাদীস নং ১০৪৩, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২০৩৯৮

২. সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১৯৮৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯০, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ২০৭৮, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৭০৫, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৩৭৮৩

বলেই পরিগণিত হয়। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

شَهْرَا عِيْدٍ لَايَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُوالْحَجَّةِ

'ঈদের দুই মাস কম হয় না- রমাযান ও যিলহজ।'[১]

উনত্রিশা হলেও তা ত্রিশা বলে গণ্য হয়। মোটকথা, রমাযানের ত্রিশ রোযা ও শাওয়ালের ছয় রোযা, মোট ছত্রিশ রোযা। ছত্রিশকে দশ দ্বারা গুণ করলে তিনশ' ষাট হয়। বছরে দিনও হয় তিনশ' ষাটটি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা এ ছত্রিশ রোযা রাখার বিনিময়ে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নেক কাজের এভাবেই দশগুণ সওয়াব দিয়ে থাকেন।

গোনাহের বদলা একগুণ

পাপ কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি অতোটুকু শাস্তিই দেবো, যতোটুকু গোনাহ সে করেছে (তা বাড়ানো হবে না), কিংবা মাফ করে দেবো। বান্দা যদি তাওবা করে, ইস্তিগফার করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনুতাপ-অনুশোচনা প্রকাশ করে বলে যে, হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন। এভাবে গোনাহের একগুণ শাস্তিও শেষ হয়ে যায়।

'কিরামান কাতেবীনে'র একজন আমীর, অপরজন মামুর

আমি আমার শায়খ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেবের নিকট থেকে একটি হাদীস শুনেছি- তবে কোনো কিতাবে হাদীসটি দেখিনি- তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, একজন লেখে নেকীর কাজ, অপরজন গোনাহের। হযরত বলতেন- আল্লাহ তা'আলা নেকী লেখক ফেরেশতাকে গোনাহ লেখার ফেরেশতার আমীর নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দেয়া নিয়ম এবং

---

৩. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৯, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১৮২২, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬২৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১৯৮৭, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৬৪৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালীম এই যে, দুই ব্যক্তি কোনো কাজ করলে একজনকে আমীর বানাবে। তাই এক ফেরেশতাকে অপর ফেরেশতার আমীর বানানো হয়েছে। কোনো মানুষ যখন নেক কাজ করে, তখন নেকী লেখক ফেরেশতা অবিলম্বেই তার আমলনামায় নেকী লিখে ফেলে। কিন্তু কোনো মানুষ যখন গোনাহের কাজ করে, তখন গোনাহ লেখক ফেরেশতা সাথে সাথে গোনাহ না লিখে নিজের আমীর নেকী লেখক ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এ লোক অমুক গোনাহ করেছে তা লিখবো, না লিখবো না? তখন সেই ফেরেশতা বলেন যে, একটু থামো। হয়তো সে তাওবা করবে, ইস্তিগফার করবে। সে যদি তাওবা করে তাহলে তা লেখার প্রয়োজন নেই। কিছুক্ষণ পর সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে- এখন লিখবো কি? তখন নেকী লেখক ফেরেশতা আবারো বলে যে, বিলম্ব করো, হয়তো সে তাওবা করবে। তৃতীয়বার যখন ঐ ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, আর বান্দা তাওবা করে না, তখন নেকী লেখক ফেরেশতা বলে যে, এখন আর তাওবার আশা নেই, এবার লিখে ফেলো, তখন গোনাহ লেখক ফেরেশতা তার আমলনামায় ঐ গোনাহ লেখে।

আল্লাহ তা'আলা আযাব দিতে চান না

এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার কোনো বান্দাকে আযাব দিতে চান না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা অপূর্ব এক আঙ্গিকে ইরশাদ করেন-

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

'তোমরা যদি ঈমান আনো ও শোকর আদায় করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন?'[১]

তাই আল্লাহ তা'আলা আযাব দিতে চান না। কিন্তু কোনো বান্দা যদি নাফরমানীর জন্যে গোঁ ধরে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখনই কেবল তাকে আযাব দেয়া হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। মৃত্যুর পূর্বে যখনই তাওবা করবে, তিনি মাফ করে দিবেন।

---

১. সূরা নিসা, আয়াত ১৪৭

বান্দাকে মাফ করার নিয়ম

যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, তাকে দশগুণ সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে, তাকে শুধু একগুণ শাস্তি দেয়া হবে। কিংবা তাও আমি মাফ করে দেবো।'

তারপর এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা মাফ করার নিয়ম বর্ণনা করেন যে-

وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً.

'যে ব্যক্তি সারা পৃথিবী গোনাহ দ্বারা ভরে ফেললো, তারপর আমার কাছে এলো, কিন্তু শর্ত হলো, সে আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি, আমি তাকে ঐ পরিমাণ ক্ষমাই করবো, যে পরিমাণ গোনাহ সে করেছে।'[১]

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহ দিয়ে সারা পৃথিবী ভরে ফেলে, তারপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আমার কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে আসে, আমি তাকে মাফ করে দেবো।

এর দ্বারা মাফ করার মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে, মাফ করার এ দরজা আমি খোলা রেখেছি এবং মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা খোলা থাকবে। চলে আসো! চলে আসো! যতো দূরেই গিয়ে থাকো, চলে আসো! একবার খাঁটি অন্তরে নিজ গোনাহ থেকে তাওবা করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেবো। গোনাহের শাস্তি দেয়া হবে না শুধু তাই নয়, বরং আমলনামা থেকেও তা মুছে ফেলা হবে। যেন তারা গোনাহই করেনি। দেখুন, আল্লাহ তা'আলার দয়া!

এ কারণে এক হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ

'আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রগামী।'[২]

তারপর একেই আল্লাহ তা'আলা নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন।

---

১. মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২১৩৬০

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬৯৯৮, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৪০, মুসনাদু আহমাদ, মুসনাদু আবী হুরাইরাহ, হাদীস নং ৬৯৯৮

গোনাহ থেকে তাওবা করুন

এ নিয়ম এজন্যে দিয়েছেন, যেন আমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি, তাওবা ও ইস্তিগফার করি এবং তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব বুঝি।

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

'আমি প্রতিদিন সত্তরবার আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ চাই।'[১]

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ। তারপরও তিনি ইস্তিগফার করেছেন! কেন? আমাদেরকে তাওবা ও ইস্তিগফারের সবক শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আমি যখন ইস্তিগফার করছি, তখন তোমরাও ইস্তিগফার করো। সকাল-সন্ধ্যায় অধিকহারে ইস্তিগফার করো।

আল্লাহর রহমত

এ হাদীসের পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنِ اقْتَرَبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

'যে বান্দা আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই, আর যে বান্দা আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। যে বান্দা আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার নিকট দৌড়ে আসি।'

এ হাদীস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রহমতের বিশালতা অনুমান করুন। যেন তিনি বলছেন- 'তোমরা আমার নিকট আসার যে পরিমাণ চেষ্টা করবে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আমি তোমাদের নিকট আসবো।'

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৮৩২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৭০, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৮২, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১২৯৪

আল্লাহর নৈকট্যের দৃষ্টান্ত

এ হাদীসে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 'যে বান্দা আমার নিকট হেঁটে আসে, আমি তার নিকট দৌড়ে যাই।' হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. এ বিষয়টি চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন- 'এর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করো যে, ছোট একটি শিশু, যে হাঁটা-চলা করতে পারে না। বাবা তাকে হাঁটা শেখাতে চায়, তখন বাবা দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে নিজের দিকে আহবান করে বলে- 'বেটা আমার কাছে আসো।' এখন যদি সে বাচ্চা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বাবাও তার থেকে দূরেই থাকবে। কিন্তু বাচ্চা যদি এক পা অগ্রসর হয়, আর হাঁটা না জানার কারণে পড়ে যেতে থাকে, তখন বাবা তাকে পড়তে দেয় না। দৌড়ে তার নিকট চলে যায়। তাকে কোলে তুলে নেয়।

হযরত থানভী রহ. বলেন- 'এমনিভাবে কোনো বান্দা যখন আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়, আর পড়ে যেতে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'আমি তাকে পড়তে দেবো না, আমি নিজে অগ্রসর হয়ে তাকে তুলে নেবো।' এটি আল্লাহর পথের পথিকদের জন্যে সুসংবাদ।

দানে সিক্ত করার একটি বাহানা

এটা মূলত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা বাহানা। আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান, বান্দা আমার দিকে অগ্রসর হতে চায় কি না। বান্দা তার অংশের কাজ করছে কি না। বান্দা যদি তার সামর্থ্যের কাজটুকু করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তা পরিপূর্ণ করে দেন। তাই আল্লাহর পথে চলতে বান্দার যদি পদস্খলন হয় এবং বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে তার পরোয়া করবে না।

বড় ধরনের একটি ধোঁকা

এ হাদীসে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান, কোন্ বান্দা আমার দিকে অগ্রসর হয় এবং আমার দিকে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো বান্দা যদি চেষ্টাই না করে তাহলে তার জন্যে কোনো ওয়াদা নেই।

মুসলিম উম্মাহ এ গাফলতি ও প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, গায়েবী কোনো শক্তি আমাদেরকে জোরপূর্বক নেকী ও পরহেযগারীর মাকামে পৌছে দিবে। কতক মানুষ যখন কোনো শায়খের হাতে বাইয়াত হয় এবং তার সঙ্গে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক গড়ে তোলে, তখন তারা মনে করে যে, এখন আর আমাদেরকে কিছু করতে হবে না। শায়খের নিকট এমন এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যার দ্বারা তিনি আমাদেরকে তুলে নিয়ে জান্নাতে পৌছে দিবেন।

নিজে আমল করতে হবে

মনে রাখবেন! এটি অনেক বড় ধোঁকা। কেউ-ই কাউকে তুলে নিয়ে জান্নাতে পৌছে দিবে না। বরং প্রত্যেককে নিজে চলে জান্নাতে যেতে হবে। যেসব আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে, তা নিজেই করতে হবে। তবে আল্লাহ তা'আলা এতোটুকু ওয়াদা করেছেন যে, 'তুমি সামান্য অগ্রসর হলে, আমি তোমাকে অনেক বেশি নৈকট্য দান করবো।' কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।'[১]

তাই এ কথা মনে করা যে, কিছু না করে শুধু বসে থেকেই কাজ হয়ে যাবে, বা কারো হাতে হাত দিলেই কাজ হয়ে যাবে, বা এরূপ মনে করা যে, শুধু আশা বা বাসনা দিয়েই জান্নাত পেয়ে যাবো, এটা অনেক বড় ধোঁকা। তাই তোমরা আমল করো। তোমাদের সে আমল অসম্পূর্ণই হোক না কেন। কিন্তু আমল করো এবং আমলকে অব্যাহত রাখো। তখন আল্লাহ তা'আলা একসময় না একসময় তোমাকে টেনে নিবেন। এই ত্রুটিপূর্ণ আমলের অবমূল্যায়ন করো না। অসম্পূর্ণ আমলের তাওফীকও যদি হয়, সেজন্যে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করো। কারণ, ইনশাআল্লাহ এ অসম্পূর্ণ আমলই তাঁর দিকে টেনে নেয়ার মাধ্যম হবে।

---

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৯

অন্বেষা ও চেষ্টা শর্ত

তাই এ হাদীস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, সাহস না করলে কোনো কাজ হয় না। হযরত থানভী রহ. বলেন- কতক লোক নিজেদের শায়খের নিকট গিয়ে বলে- 'হযরত! এমন কোনো তাদবীর বলে দিন, যার দ্বারা আপনাআপনি আমল হয়ে যাবে এবং গোনাহ ছুটে যাবে। হযরত থানভী রহ. বলেন- কোনো শায়খের নিকটই এমন তাদবীর নেই। তাই যদি হতো, তাহলে দুনিয়াতে কোনো কাফের থাকতো না। নবীগণ যখন দুনিয়াতে তাশরীফ আনতেন তাঁদের একান্ত বাসনা হতো সবাই মুসলমান হয়ে যাক, সবাই সংশোধিত হয়ে যাক। যদি এমন কোনো ব্যবস্থা থাকতো, অবশ্যই নবীগণ তা প্রয়োগ করতেন। একটি মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতেন, বা একবার দৃষ্টিপাত করতেন আর সকলেই মুসলমান হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়নি। কিছু না কিছু আমল না করা পর্যন্ত নবীর দর্শনও কাজে আসে না। আবু জাহ্ল ও আবু লাহাবও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছিলো। কিন্তু নিজের ভেতর অন্বেষা ছিলো না, ছিলো না চেষ্টা ও সংকল্প, তাই এ দর্শন কোনো উপকারে আসেনি।

মোজেযার মধ্যে নবীর আমলের দখল

লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা নবীগণের হাতে মোজেযা প্রকাশ করতেন। এ সব মোজেযা আসতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রত্যেক মোজেযার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নবী দ্বারা কোনো না কোনো কাজ অবশ্যই করানো হয়েছে। হাদীস শরীফে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোজেযা হিসাবে খাদ্য ও পানির মধ্যে বরকত হয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত জাবের রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বাড়ি যান। বিবিকে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারায় ক্ষুধার নিদর্শন দেখেছি। খাবারের ব্যবস্থা থাকলে তা প্রস্তুত করো। বিবি বললেন- 'অল্প কিছু খাবার রয়েছে। তা দ্বারা দু'-চারজনের ব্যবস্থা হবে। আপনি চুপিসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামসহ আরো দু'-একজনকে দাওয়াত দিন। সবার সামনে দাওয়াত দিবেন না। এমন যেন না হয় যে, বেশি মানুষ চলে এলো, আর খাবার অপ্রতুল হলো।'

হযরত জাবের রাযি.-এর বিবি খাবার পাকানোর জন্যে চুলায় পাতিল বসিয়ে দিলেন, আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চলে গেলেন এবং চুপিসারে নিবেদন করলেন- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাড়িতে আপনার জন্যে কিছু খাবার তৈরী করেছি। আপনি আরো দু'-চার জন সাহাবীসহ তাশরীফ নিয়ে আসুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে পুরো বাহিনীকে দাওয়াত দিলেন। চলো! জাবেরের বাড়িতে দাওয়াত।

হযরত জাবের রাযি. পেরেশান হলেন। কারণ, খাবার হলো দু'-চার জনের পরিমাণ। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদলের সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। বিবি বলে দিয়েছিলেন, চুপিসারে দাওয়াত দিবেন। অথচ এখন পুরো সৈন্যবাহিনী চলে আসছে। বাড়িতে এসে তিনি বিবিকে বললেন- পুরো সৈন্যবাহিনী চলে এসেছে। বিবি প্রথমে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন-

بِكَ وَبِكَ

'আপনার এমন হোক, তেমন হোক।'

আপনি বোধহয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নীরবে বলেননি।

তিনি বললেন- আমি নীরবেই বলেছিলাম। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর বিবিও ছিলেন সাহাবী। তিনি বললেন- আপনি যদি সব বলে থাকেন এবং তারপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাহলে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ, সে ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এর দায়িত্ব বহন করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে হযরত জাবের রাযি.-কে বললেন- যাও! তোমার স্ত্রীকে বলো, সে যেন পাতিল থেকে খানা দিতে থাকে, আর পাতিল চুলার উপরেই রেখে দেয়।

হযরত জাবের রাযি. বলেন- সেনাবাহিনীর সকলেই খেতে বসলো। আমি খানা এনে সকলকে খাওয়াতে থাকলাম। সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠলো। অথচ পাতিলের খাবার শেষ হলো না। মাত্র তিন-চারজনের খাবার পুরো বাহিনীর জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে এ মোজেযা প্রকাশ করলেন।[১]

খানা তুমি পাকাও! বরকত আমি দেবো

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মোযেজাটি এভাবেও প্রকাশ পেতে পারতো যে, কোনো পাতিল ছাড়া এবং খাবারের আয়োজন করা ছাড়াই গায়েব থেকে আল্লাহ তা'আলা খাবার পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু এভাবে প্রকাশ করা হয়নি। মোজেযা প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে যে, খানা তুমি পাকাও- পরিমাণে তা অল্পই হোক- তারপর আমি সে খানায় বরকত দেবো। তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবো। এর মাধ্যমে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, নিজের পক্ষ থেকে কিছু হলেও আমল করতে হবে। তবেই মোজেযা প্রকাশ পাবে। তোমার আমল ছাড়া মোজেযা প্রকাশ পাবে না।

পানিতে বরকত হওয়ার ঘটনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পানির পরিমাণ ছিলো কম। সৈন্যসংখ্যা ছিলো বেশি। সকলেই পিপাসার্ত। পানির সন্ধান মিলছে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'পথে অমুক জায়গায় একটি ঝরনা পড়বে। সে জায়গা আসলে আমাকে জানাবে। আমার অনুমতির পরেই সৈন্যবাহিনী তা থেকে পানি পান করবে।' পথে সেই ঝরনা এলো। তাতে অল্প কয়েকজনের পানের উপযোগী সামান্য পানি ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝরনার পানিতে নিজের পবিত্র হাত রেখে বললেন- এখন সৈন্যবাহিনী পানি পান করুক। সৈন্যবাহিনীর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলো।[২]

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৩৭৯০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৪, পৃ. ৯৭, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ডঃ ২, পৃ. ২৫২-২৫৩

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ১, পৃ. ১০০

এখানেও আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পানি নামাতে পারতেন, বা অন্য কোনো পন্থায়ও সকলকে পরিতৃপ্ত করতে পারতেন। কিন্তু এমনটি করেননি। বরং নির্দেশ দিয়েছেন, প্রথমে ঝরনা তালাশ করো, তারপর নিজ চেষ্টায় তা থেকে অল্প পানি সংগ্রহ করো এবং তার মধ্যে নিজের হাত প্রবেশ করাও, তারপর আমি তার মধ্যে বরকত দেবো। এ ঘটনা দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দিলেন যে, নিজে আমল করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ চেষ্টা করবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করারও ওয়াদা নেই।

উজ্জ্বল হাতের মোজেযা

মোজেযার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রত্যেক নবী দ্বারা অল্প হলেও আমল করানো হয়েছে। হযরত মুসা আ.-কে উজ্জ্বল হাতের মোজেযা দেয়া হয়েছিলো। তাঁকে হুকুম দেয়া হয়- 'তোমার হাত বগলের তলায় প্রবেশ করাও, তারপর বের করো।' হাত বের করলে তা জ্বলজ্বল করছিলো। বগলের তলায় হাত প্রবেশ করানো ছাড়াও তো জ্বলজ্বল করতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, সামান্য আমল তুমি করো। হাতটি বগলের তলায় নিয়ে যাও, যখন তা বের করবে, তখন আমি উজ্জ্বল বানিয়ে দেবো।

মোজেযার ক্ষেত্রে যখন নবীগণের দ্বারা কিছু না কিছু আমল করানো হয়েছে, সে ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ নীতি তো অবশ্যই কার্যকর হবে। নিজের থেকে কিছু আমল অবশ্যই করতে হবে। নিজেরটুকু যখন করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বরকত ও সাহায্য আসবে। তাই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ যদি দূর থেকে নিজেকে হতাশাগ্রস্ত করে বসে পড়ে, আর বলতে থাকে- এখন তো যুগ-যামানা খারাপ, পরিবেশ-পরিস্থিতি খারাপ- এ বলে চেষ্টা করা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব হবে না।

সম্মুখে চলতে থাকলে পথ খুলতে থাকবে

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন- 'সোজা ও দীর্ঘ কোনো সড়কের মুখে তুমি যদি

দাঁড়াও, আর সড়কের উভয়দিকে বৃক্ষসারি থাকে তাহলে তুমি দেখবে যে, সম্মুখে গিয়ে উভয়দিকের বৃক্ষসারি সংযুক্ত হয়ে গেছে। সম্মুখে গিয়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো নির্বোধ যদি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে যে, সম্মুখে যেহেতু পথ বন্ধ হয়ে গেছে, তাই পথ চলা বৃথা। এ কথা বলে যদি সম্মুখে অগ্রসর না হয়, তাহলে এ নির্বোধকে সারা জীবন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখনোই গন্তব্যে পৌছা হবে না। কিন্তু সে যদি সম্মুখে চলতে আরম্ভ করে, তাহলে বুঝতে পারবে যে, পথ প্রকৃতপক্ষে বন্ধ ছিলো না, আমার দৃষ্টি আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলো।

গোনাহ ছাড়ার চেষ্টা করুন

দ্বীনের বিষয়ও এমনই। মানুষ যদি দূর থেকে এ কথা চিন্তা করে বসে পড়ে যে, এ যুগে দ্বীনের উপর আমল করা খুবই কঠিন। এ বিংশ শতাব্দীতে গোনাহ থেকে বাঁচা খুবই দুরূহ ব্যপার। এ যামানায় আমাদের পরিবেশ কীভাবে পরিবর্তন করবো। টিভি কীভাবে ছাড়বো? ভিসিআর কীভাবে ছাড়বো? পর্দাহীনতা কীভাবে ছাড়বো? কুদৃষ্টি কীভাবে ছাড়বো? মিথ্যা কীভাবে ছাড়বো? সুদ কীভাবে ছাড়বো? এগুলোকে কঠিন মনে করে যদি কোনো মানুষ হতাশ হয়ে বসে পড়ে। তাহলে সে কখনোই কামিয়াব হবে না। কিন্তু কোনো মানুষ যদি চিন্তা করে যে, আমি এ গোনাহ একশ'বার করতাম। আমি তা থেকে কিছু হলেও তো কমাতে পারি। আমি এখন একশ' থেকে পঞ্চাশবার কমিয়ে দেবো। মানুষ যখন নিজের থেকে কমানোর পদক্ষেপ নিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। তুমি যখন একশ' থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। আর তুমি যদি পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা শূন্যে পৌছে দিবেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের জরিপ করো

আমার হযরত বলতেন- প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের জরিপ চালিয়ে দেখবে যে, এ সময় আমি কী কী কাজ করি। কতোগুলো ফরয ও ওয়াজিব আমি আদায় করি না। কি কি সুন্নাত বাদ দেই। কোন্ কোন্ নেক আমল করি না। কতোগুলো মন্দ কাজ, ভুল-

ভ্রান্তি ও গোনাহের কাজ আমি করি। এগুলোর একটি তালিকা তৈরী করো। তারপর সে তালিকার মধ্যে চিন্তা করে দেখো যে, কোন্ কোন্ গোনাহ তুমি বিনা কষ্টে অবিলম্বে ছাড়তে পারো। সেগুলো অবিলম্বে ছেড়ে দাও। আর যেসব গোনাহ ছাড়তে কিছু সময় প্রয়োজন, সেগুলো ছাড়ার জন্যে চেষ্টা আরম্ভ করে দাও। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকো যে, হে আল্লাহ! যেসব গোনাহ ছেড়ে দেওয়া আমার সাধ্যের মধ্যে ছিলো, সেগুলো ছেড়ে দিয়েছি। অবশিষ্ট গোনাহ ছেড়ে দেওয়া আমার সাধ্যের মধ্যে নয়। আপনি মেহেরবানী করে সেগুলো ছাড়িয়ে দিন। এ কাজটুকু করো। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন।

পা বাড়াও! অতঃপর দু'আ করো

দু'টি কাজের কথা সবসময় মনে রাখবে-

এক. নিজে পা বাড়াও।

দুই. আল্লাহ তা'আলার কাছে পূর্ণতার জন্যে দু'আ করো।

সারাটি জীবন এ দু'টি কাজ করতে থাকো। তাহলে ইনশাআল্লাহ তুমি কামিয়াব হবে।

আমাদের হযরত বলতেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে এভাবে কথা বলো- 'হে আল্লাহ! আমি অমুক অমুক গোনাহে লিপ্ত ছিলাম। আমি পা বাড়িয়েছি এবং এতোগুলো গোনাহ ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু অবশিষ্ট গোনাহ ছাড়তে নফস ও শয়তানের কাছে পরাজিত হচ্ছি। পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছে পরাজিত হচ্ছি। যে কারণে আমি এসব গোনাহ ছাড়তে পারছি না। আপনিই এ পরাজয় দূর করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি এ বাধা সরিয়ে দিন। এ পরাজয় দূর করে দিন। হয় আমার এ বাধা দূর করে দিন, না হয় আখেরাতে এজন্যে শাস্তি দিবেন না।'

এভাবে কথা বলতে থাকো। তারপর দেখো কীভাবে সফলতা লাভ হয়। কীভাবে আল্লাহ তা'আলা গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করেন। তোমার সাধ্যের আওতায় যেটুকু, সেটুকু করো এবং পূর্ণতা লাভের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকো।

হযরত ইউসুফ আ.-এর দরজার দিকে পলায়ন

হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা লক্ষ্য করুন! জোলায়খা তাঁকে গোনাহের প্রতি আহবান করলো। সবগুলো দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। যাতে পালানোর কোনো পথ না থাকে। হযরত ইউসুফ আ. নিজ চোখে দেখলেন যে, সবগুলো দরজায় তালা লাগানো রয়েছে। তারপরও তিনি দরজার দিকে দৌড় দিলেন। দরজা পর্যন্ত এ জন্যে দৌড়ে গেলেন, যেন আল্লাহ তা'আলাকে বলতে পারেন যে, হে আল্লাহ! দরজা পর্যন্ত দৌড়ে যাওয়া আমার কাজ ছিলো, আর দরজা খুলে দেয়া হলো আপনার কাজ। হযরত ইউসুফ আ. যদি দৌড়ে দরজা পর্যন্ত না যেতেন, তাহলে তালা খোলার কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। কিন্তু তিনি দরজা পর্যন্ত দৌড় দিলেন এবং সেখানে পৌঁছে বললেন যে, হে আল্লাহ! আমার সাধ্যে যতোটুকু ছিলো তা আমি করেছি। দরজা খোলা আমার সামর্থ্যভুক্ত নয়। তিনি বললেন-

وَاِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّیۡ كَیۡدَهُنَّ اَصۡبُ اِلَیۡهِنَّ وَاَكُنۡ مِّنَ الۡجٰهِلِیۡنَ ۝

'তুমি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না কর, তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[১]

আল্লাহ তা'আলা দেখলেন, আমার বান্দা তার কাজটুকু করেছে, তাই এখন আমি আমার কাজটুকু করবো। সুতরাং সবগুলো তালা ভেঙ্গে গেল। এ সম্পর্কে মাওলানা রূমী রহ. বলেন-

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید
خیرہ یوسف وار می باید دوید

অর্থাৎ, যদিও এ জগতে তুমি পালানোর পথ দেখছো না, গোনাহ থেকে, অশ্লীলতা থেকে, নগ্নতা থেকে, বদদ্বীনী থেকে পালানোর পথ চোখে পড়ছে না, কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. যেভাবে দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিলেন, তুমিও দরজা পর্যন্ত দৌড় দিয়ে দেখাও। তারপর আল্লাহ তা'আলাকে বলো- হে আল্লাহ! সামনে রক্ষা করা আপনার কাজ।

---

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৩

ইনশাআল্লাহ! তখন দরজা খুলে যাবে। আল্লাহর সাহায্য আসবে। উপরোক্ত হাদীসে কুদসীর উদ্দেশ্যও তাই। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 'যে বান্দা আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই।'

রাতে ঘুমানোর পূর্বে এ আমলটি করুন!

রাতে শুতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কিছু কথা বলুন। আল্লাহ তা'আলাকে বলুন- হে আল্লাহ! আজকের দিনটি কেটে গেল। আজকের দিনে আমি এতোগুলো গোনাহ থেকে বাঁচতে পেরেছি এবং এতোগুলো থেকে বাঁচতে পারিনি। এতোগুলো কাজ করতে পেরেছি এবং এতোগুলো করতে ব্যর্থ হয়েছি। হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দ্বারা এ ব্যর্থতা দূর করে দিন। আমি তো আপনার পথে চলতে চাই, কিন্তু নফস, শয়তান ও পরিবেশ আমাকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করে। হে আল্লাহ! আমাকে তাদের উপর বিজয়ী করুন। রাতের বেলা এ দু'আটি করুন।

সকালে উঠে এ অঙ্গীকার করুন !

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন- প্রতিদিন সকালে বসে আল্লাহ তা'আলার সাথে এ অঙ্গীকার করুন -

'হে আল্লাহ! আজকের দিনটি শুরু হচ্ছে। আজ যখন আমি জীবনের কর্মক্ষেত্রে নামবো, তখন না জানি গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ও উৎসাহদাতা কতো কিছু সামনে আসবে! কতো কি অবস্থা দেখা দিবে! আমি আপনার সম্মুখে সংকল্প করছি যে, আমি আপনার নির্দেশিত পন্থায় চলবো। আপনার সন্তুষ্টির পথে চলার চেষ্টা করবো। কিন্তু হে আল্লাহ! আমার শক্তি-সাহসের উপর আমার ভরসা নেই। চলতে তো চাচ্ছি, কিন্তু হতে পারে আমি বিচ্যুত হয়ে যাবো। আমার পদস্খলন ঘটবে। হে আল্লাহ! আমি পড়তে গেলে আপনার রহমত দ্বারা আমাকে ধরে রাখবেন। ভুলপথ থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। হে আল্লাহ! আমি সাহসহারা ও উদ্যমহারা। সাহসদাতাও আপনি এবং উদ্যমদাতাও আপনি। আপনি নিজ দয়ায় আমাকে সাহস ও উদ্যম দান করুন। এরপরও যদি আমি পতিত হই, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমাকে ধরে বসবেন না। কারণ, আমি তো আপনার পথে চলতে চাই। আপনি ধরে না

রাখলে আমি বিপথগামী হবোই। আমি যদি বিপথগামী হই, তা হলে সে দায়দায়িত্ব আপনার। তখন আর আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না।

সকালে এ দু'আ করুন!

আমাদের হযরত বলতেন- ভোরবেলা ফজর নামায পড়ুন। তারপর অযীফা ও যিকির শেষ করে এ আয়াতটি পাঠ করুন -

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'হে আল্লাহ! আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ, সব আপনার জন্যে নিবেদিত।'[১]

হে আল্লাহ! আমি এখন সংকল্প করছি যে, আমি যা কিছু করবো সবকিছু আপনার সন্তুষ্টির জন্যে করবো, কিন্তু আমার নিজের উপর ভরসা নেই। জানি না, কোথায় আমার পদস্খলন ঘটে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। এভাবে দু'আ করার পর কর্মক্ষেত্রে বের হোন। ইনশাআল্লাহ, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিদিন এ কাজটি করুন। তখন দেখবেন, কী অসাধারণ পরিবর্তন ঘটে! এরপর কোথাও যদি পদস্খলন ঘটেও, তখন আপনি তো আল্লাহর সাথে এ কথা বলেই নিয়েছেন যে, হে আল্লাহ! আমার অবিচল থাকা আমার সাধ্যের বাইরে। তাহলে আশা করা যায়, আপনার মাফের ব্যবস্থা হবে। পরেরদিন সকালে যখন উঠে বসবেন, তখন প্রথমে ইস্তিগফার করুন। তারপর নতুন করে একই সংকল্পকে সতেজ করুন।

আজকের দিনটি গতকাল থেকে উত্তম বানাই!

সংকল্প করুন যে, আজ আমি গতকালের তুলনায় অধিক উত্তম আমল করবো। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যার আজ ও কাল সমান হলো, সে বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।'[২]

---

১. সূরা আন'আম, আয়াত ১৬২

২. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ডঃ ৬, পৃ. ৪১১, আদ দুরারুল মুনতাসিরাহ ফীল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৪০, কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাসি লিল'আজলূনী, খণ্ডঃ ২, পৃ. ২৩৩, হাদীস নং ২৪০৫, হিলয়াতুল আওলিয়া, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ৩৬২

কারণ, সে কোনো উন্নতি করেনি। কালকের তুলনায় আজকে সে কিছুটা হলেও উন্নতি করতো! কিছুটা হলেও সম্মুখে অগ্রসর হতো! এ জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ يَوْمَنَا خَيْرًا مِنْ أَمْسِنَا وَغَدَنَا خَيْرًا مِنْ يَوْمِنَا

'হে আল্লাহ! আমাদের আজকের দিনটি গতকাল থেকে উত্তম বানিয়ে দিন এবং আমাদের আগামীকালকে আজকের থেকে উত্তম বানিয়ে দিন।' এ দু'আটি করুন এবং সংকল্প ও প্রস্তুতি নিয়ে কাজ শুরু করুন! আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চান! তাহলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন। তখন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নেক কাজে বিলম্ব করো না*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

আল্লামা নববী রহ. পরবর্তী অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন-

بَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ[১]

এ অধ্যায়-শিরোনামের মর্ম হলো- মানুষ যখন নিজের হাকীকত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, আল্লাহ তা'আলার আযমত, কুদরত ও হিকমত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন এর ফলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ইবাদতের দিকে তার দিল ধাবিত হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তরে আগ্রহ জন্মাবে যে, যে মালিক সমগ্র বিশ্ব বানিয়েছেন এবং এসব নেয়ামত আমাকে দান করেছেন। যে মালিক তাঁর অফুরন্ত রহমত দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করছেন, সে মালিকেরও আমার উপর হক রয়েছে। অন্তরে যখন এ আগ্রহ জন্মায় তখন কী করা উচিত?

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৫৯-৯১, দরসে রিয়াযুস সালিহীন, পৃ. ৫৮

১. রিয়াযুস সালিহীন, পৃ. ৫৮

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আল্লামা নববী রহ. এ অধ্যায় এনেছেন যে, যখনই আল্লাহর ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং নেক কাজ করার প্রতি উৎসাহ জন্মাবে, তখনই একজন মুমিনের কাজ হলো, অনতিবিলম্বে সেই নেক আমলটি করে ফেলা। দেরী না করা। খুৎবার মধ্যে উল্লেখিত 'মুবাদারাত' শব্দের অর্থ এটাই। অর্থাৎ কোনো কাজ দ্রুত করা। গড়িমসি না করা। আগামীকালের জন্যে ফেলে না রাখা।

নেক কাজে দৌড়াও!

আল্লামা নববী রহ. সর্বপ্রথম এ আয়াতে কারীমা এনেছেন-

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন- 'তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ এবং যমিনের সমান। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি। তা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগার লোকদের জন্যে।'[১]

'মুসারাআত' অর্থ- অতি দ্রুত কোনো কাজ করা। অন্যদের উপর অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

'ভালো ও নেকীর কাজে দৌড়াও!'[২]

এ আয়াতের সারকথা হলো, যখন অন্তরে কোনো নেক কাজের চাহিদা ও প্রেরণা জাগ্রত হবে, তখন তাকে অন্য সময়ের জন্যে রেখে দিও না।

শয়তানের একটি কৌশল

কারণ, শয়তানের কৌশল ও অস্ত্র প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কাফেরের জন্যে হয় একরকম, মুমিনের জন্যে হয় অন্যরকম।

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩
২. সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৮

মুমিনের অন্তরে শয়তান এ কুমন্ত্রণা দিবে না যে, এ নেক কাজটি করো না, এটি খারাপ কাজ। কারণ, সে জানে এ ব্যক্তি ঈমানদার হওয়ার ফলে নেক কাজকে খারাপ মনে করতে পারে না। তাই মুমিনের সঙ্গে সে এই কৌশল অবলম্বন করে যে, সে বলে- নামায পড়া এবং নেক কাজ করা তো ভালো, তা করতে হবে। কিন্তু আগামীকাল থেকে করো। কিন্তু যখন কাল আসবে তখন পুনরায় বলবে- ঠিক আছে ভাই! আগামীকাল থেকে শুরু করো। সারাজীবনেও সেই 'আগামীকাল' আর আসবে না। কিংবা কোনো আল্লাহ ওয়ালার কথা অন্তরে প্রভাব ফেললো, তখন বলবে- এ কথা তো সঠিক। এর উপর আমল করা উচিত। নিজের জীবন পরিবর্তন করা উচিত। গোনাহের কাজ ছেড়ে দেয়া উচিত। নেক আমল করা উচিত। ইনশাআল্লাহ, খুব তাড়াতাড়ি এর উপর আমল করবো। যখনই সে কাজ করতে বিলম্ব করলো, তখনই আর তা করার সুযোগ হবে না।

অমূল্য এ জীবনকে কাজে লাগান

এভাবেই জীবনের সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। অমূল্য জীবন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। জানা নেই, জীবনের আর কতোটুকু সময় অবশিষ্ট রয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- আগামীকালের জন্যে রেখে দিও না। এখন আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, এখনই তা করে ফেলো। আগামীকাল পর্যন্ত এ আগ্রহ থাকবে কি না, তা জানা নেই। প্রথমত, এ কথাই তো জানা নেই যে, তুমি নিজে জীবিত থাকবে কিনা। আর জীবিত থাকলেও এ আগ্রহ অবশিষ্ট থাকবে কিনা তা তো জানা নেই। আগ্রহ অবশিষ্ট থাকলেও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে কিনা তা তো জানা নেই। তাই এখন যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তার উপর আমল করে উপকৃত হও!

নেক কাজের আগ্রহ আল্লাহ তা'আলার পাঠানো মেহমান

নেক কাজের আগ্রহ আল্লাহ তা'আলার পাঠানো মেহমান। এ মেহমানের আদর-যত্ন করো। এর আদর-যত্ন হলো, এর উপর আমল করা। যদি নফল নামায পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আর তুমি চিন্তা করো যে, এটি তো ফরয বা ওয়াজিব নয়, না পড়লে তো কোনো গোনাহ হবে না। তাই বাদ দাও। এভাবে তুমি সেই মেহমানের অবমূল্যায়ন করলে, যাকে

আল্লাহ তা'আলা তোমার ইসলাহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তুমি যদি সাথে সাথে তার উপর আমল না করো, তাহলে পিছিয়ে পড়বে। কারণ, জানা তো নেই, পুনরায় এ মেহমান আসবে, না কি আগামীতে আসা বন্ধ করে দিবে। বরং মেহমান তখন চিন্তা করবে যে, এ ব্যক্তি তো আমার কথা মানে না। আমাকে মূল্যায়ন করে না। আমার আদর-যত্ন করে না। আমি আর তার কাছে যাবো না। এভাবে অন্তরে নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। যাই হোক, সাধারণ নিয়মে যদিও সব কাজে তাড়াহুড়া করা খারাপ, কিন্তু অন্তরে যখন কোনো নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখন দ্রুত তার উপর আমল করাই উত্তম।

অবসরের প্রতীক্ষায় থেকো না

অন্তরে যদি নিজের ইসলাহের চিন্তা জাগে যে, জীবন তো এমনিতেই কেটে যাচ্ছে। নফসের ইসলাহ করা উচিত। নিজের আমল-আখলাকের ইসলাহ করা উচিত। কিন্তু সাথে সাথে চিন্তা করলে যে, অমুক কাজ থেকে অবসর হলে তখন ইসলাহ আরম্ভ করবো। অবসরের প্রতীক্ষায় মূল্যবান জীবনের যে মুহূর্তগুলো অতিবাহিত হচ্ছে, তা কখনই আর ফিরে আসবে না।

কাজ করার উত্তম উপায়

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) বলতেন-

'অবসর সময়ের প্রতীক্ষায় যে কাজকে পিছিয়ে দিবে তা পিছিয়েই থাকবে। তা আর করা হয়ে উঠবে না। কাজ করার উপায় হলো- দুই কাজের মধ্যে তৃতীয় কাজকে ঢুকিয়ে দাও। অর্থাৎ দু'টি কাজ তুমি আগে থেকেই করছো, এখন তৃতীয় একটি কাজ করার ইচ্ছা হলো, তাহলে ঐ দুই কাজের মধ্যে তৃতীয় কাজটিকে জোর করে ঢুকিয়ে দাও। তাহলে তৃতীয় কাজটি হয়ে যাবে। আর যদি চিন্তা করো যে, ঐ দুই কাজ শেষ করে তৃতীয় কাজটি করবে, তাহলে আর ঐ কাজ হয়ে উঠবে না। এ কাজ শেষ হলে ঐ কাজ করবে, এমন পরিকল্পনা করা কাজকে পিছিয়ে দেয়ার নামান্তর। শয়তান সাধারণত এভাবেই প্রতারণার ফাঁদে আটকায়।

নেক কাজে প্রতিযোগিতা খারাপ নয়

এ কারণে مُبَادَرَةٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ তথা দ্রুত নেক কাজ করা এবং নেক কাজে অগ্রগামী হওয়া কুরআন-সুন্নাহর দাবি। আল্লামা নববী রহ. এ কথা বুঝানোর জন্যেই بَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ অধ্যায়-শিরোনাম দিয়েছেন।

আল্লামা নববী রহ. এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি হলো, 'মুবাদারাত' তথা দ্রুত করা। আরেকটি হলো, 'মুসাবাকাত' তথা প্রতিযোগিতা করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। নেক কাজে এমন প্রতিযোগিতা পছন্দনীয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা খারাপ। সম্পদ উপার্জনে, সম্মান লাভে, খ্যাতির কাজে, দুনিয়া কামাতে, পদমর্যাদা অর্জনে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা অপছন্দনীয়। কিন্তু নেক কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা উত্তম ও প্রশংসাযোগ্য।

খোদ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'তোমরা নেক কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।'[১]

এক ব্যক্তিকে তুমি দেখছো যে, মাশাআল্লাহ সে ইবাদত করে যাচ্ছে। আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে। গোনাহ থেকে বাঁচছে। এখন তুমি চেষ্টা করো যে, আমি তার চেয়েও এগিয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা খারাপ নয়।

জাগতিক উপকরণে প্রতিযোগিতা ঠিক নয়

আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে উল্টো। আমাদের পুরো জীবন প্রতিযোগিতায় অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রতিযোগিতা চলছে অধিক থেকে অধিক পয়সা কামানোর ক্ষেত্রে। অমুক এত কামিয়েছে, তো আমি এর চেয়ে বেশি কামাবো। অন্যে এমন কুঠি বানিয়েছে, আমি

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৮

তার চেয়ে উন্নতমানের কুঠি বানাবো। অন্যে এমন গাড়ি ক্রয় করেছে, আমি তার চেয়ে উন্নতমানের গাড়ি ক্রয় করবো। অমুক এমন সাজসরঞ্জাম করেছে, আমি তার চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের সাজসরঞ্জাম করবো। পুরো জাতি এ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ প্রতিযোগিতায় নামার ফলে হালাল-হারামের চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ, মস্তিষ্কে যখন এ চিন্তা সওয়ার হয়েছে যে, জাগতিক উপকরণে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে। হালাল মাল দ্বারা তো এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন, তাই হারাম পথে যেতে হয়েছে। ফলে হারাম-হালাল একাকার হয়ে গেছে।

মোটকথা, যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা ছিলো শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ, সে বিষয়ে তো সবাই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। একে অপরের চেয়ে এগিয়ে চলছে। আর যে কাজে প্রতিযোগিতা করা এবং একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া ছিলো কাঙ্ক্ষিত, সেগুলোতে পিছনে পড়ে আছে।

তাবুক যুদ্ধের মুহূর্তে ঈমানদীপ্ত ঘটনা

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম কী করেছেন, তা লক্ষ্য করুন। যুদ্ধটি ছিলো খুব কঠিন। তাবুক যুদ্ধের মতো ধৈর্যসংকুল অভিযান আর কোনোটি হয়তো দেখা যায়নি। প্রচণ্ড গরমকাল। আকাশ অগ্নিবর্ষণ করছে। জমিন অগ্নি উদ্গীরণ করছে। প্রায় বারোশ' কিলোমিটারের মরু সফর। খেজুর পাকার মওসুম। যার উপর সারা বছরের জীবিকা নির্বাহ করছে। বাহন নেই। অর্থকড়ি নেই। এমন এক জটিল মুহূর্তে হুকুম হলো, প্রত্যেক মুসলমানকে এ যুদ্ধে যেতে হবে। এতে অংশ নিতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন- 'সামনে সমরাভিযান। বাহন প্রয়োজন। উট প্রয়োজন। পয়সা প্রয়োজন। মুসলমানদের উচিত, তাতে অধিকহারে অংশগ্রহণ করা। যে ব্যক্তি এতে চাঁদা দিবে, আমি তার জন্যে জান্নাতের জামিন হবো। সাহাবায়ে কেরাম কি আর পিছিয়ে থাকতে পারেন? স্বয়ং নবীর মুখে জান্নাতের ঘোষণা শুনেছেন। সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য মোতাবেক চাঁদা দিচ্ছেন। কেউ এটা দিচ্ছেন, কেউ ওটা দিচ্ছেন।

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বলেন- 'আমি বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে যতো জিনিসপত্র ও টাকা-পয়সা ছিলো, সব অর্ধেক অর্ধেক ভাগ

করলাম। তারপর অর্ধেক নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। আমার অন্তরে চিন্তা জাগলো, আজকের দিনেই হয়তো আমি আবু বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে এগিয়ে যেতে পারবো। এই যে, অন্তরের অনুভূতি- আমি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যাবো, একেই বলে 'মুসাবাকাত ইলাল খাইয়াত' বা নেক কাজে প্রতিযোগিতা। কিন্তু কখনো তাঁর অন্তরে এ আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি যে, অর্থ-পয়সায় আমি হযরত ওসমান রাযি. থেকে এগিয়ে যাবো। কখনো এ ইচ্ছা জাগেনি যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ রাযি.-এর অনেক সম্পদ। তাঁর চেয়ে অধিক সম্পদ আমার লাভ হোক। হ্যাঁ, তাঁর অন্তরে এ আগ্রহ জন্মেছে যে, আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে আল্লাহ তা'আলা নেক কাজের যে উঁচু মাকাম দিয়েছেন, তার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত আবু বকর রাযি.-ও তাশরীফ আনলেন। তাঁর যা কিছু ছিলো পেশ করলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন- 'ওমর! বাড়িতে কী রেখে এসেছো?'

হযরত ওমর রাযি. নিবেদন করলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধেক সম্পদ বাড়ির লোকদের জন্যে রেখে এসেছি, আর অর্ধেক জিহাদের জন্যে নিয়ে এসেছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দু'আ করলেন- 'আল্লাহ তোমার সম্পদে বরকত দিন।'

তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন- 'আপনি বাড়িতে কী রেখে এসেছেন?'

আবু বকর রাযি. নিবেদন করলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাড়িতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। সামানাপত্র যা ছিলো, সব ঝেড়ে-মুছে এখানে নিয়ে এসেছি।'

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বলেন- সেদিন আমি বুঝতে পারি যে, সারাজীবন চেষ্টা করেও আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে অতিক্রম করতে পারবো না।[১]

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১৪২৯, সুনানুদ দারিমী, হাদীস নং ১৬০১

একটি আদর্শ কারবার

একবার হযরত ওমর ফারূক রাযি. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে বললেন- আপনি আমার সঙ্গে একটি কারবার করলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কী সেই কারবার?

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বললেন- 'আমার জীবনের যতো নেকী আছে এবং যতো নেক আমল আছে, সব আপনি নিয়ে নিন, আর যে রাতটি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করেছিলেন তার সওয়াব আমাকে দিয়ে দিন। অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গারে সাওরে কাটানো সেই একটি রাত আমার সমস্ত আমলের চেয়ে অধিক ভারী।'[১]

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের জীবনের দিকে তাকালে কোথাও দেখা যায় না যে, তাঁরা কখনো চিন্তা করেছেন- অমুক এত টাকা জমিয়েছে, আমিও জমাই। অমুকের বাড়ি খুব আড়ম্বরপূর্ণ, আমারও যদি অমন একটা বাড়ি হতো। অমুকের বাহন অনেক উৎকৃষ্ট, আমিও যদি এমন একটা বাহন পেতাম। হ্যাঁ, তাঁদের মধ্যে দেখা যেত নেক আমলের প্রতিযোগিতা। আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নেক আমলে এগিয়ে যাওয়ার কোনো চিন্তা নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্পদের প্রতিযোগিতা চলছে। একে অন্যের থেকে বিত্ত-বৈভবে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা আছে।

অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিস্ময়কর সমাধান দিয়েছেন। আমাদের জন্যে যা অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। তিনি বলেন-

'দুনিয়ার বিষয়ে সবসময় নিজের চেয়ে নিচের লোককে দেখো। নিজের চেয়ে নিম্নমানের লোকদের সঙ্গে অবস্থান করো। তাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করো। তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো। আর দ্বীনের বিষয়ে

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ১৮০, হিলয়াতুল আওলিয়া, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩৩

সবসময় নিজের চেয়ে উপরের লোককে দেখো এবং তাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করো।'[১]

কারণ, দুনিয়ার বিষয়ে যখন নিজের চেয়ে নিম্নমানের লোকদেরকে দেখবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে সমস্ত নেয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর মূল্য বুঝতে পারবে। চিন্তা করতে পারবে যে, এসব নেয়ামত তাদের নিকট নেই, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। ফলে, পরিতুষ্টি লাভ হবে। কৃতজ্ঞতা আদায় হবে। দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে। পক্ষান্তরে দ্বীনের বিষয়ে যখন উপরের লোকদেরকে দেখবে যে, এরা দ্বীনের বিষয়ে আমার চেয়ে এগিয়ে আছে, তখন নিজের কমতির উপলব্ধি হবে। এগিয়ে যাওয়ার ফিকির পয়দা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কীভাবে শান্তি লাভ করেন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ মুজাহিদ ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন-

'আমি জীবনের প্রথমাংশ সম্পদশালীদের সঙ্গে অতিবাহিত করি। (তিনি নিজেও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন।) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধনীদের সঙ্গে অবস্থান করতাম। যতোদিন আমি ধনীদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি ততোদিন আমার চেয়ে অসুখী আর কেউ ছিলো না। কারণ, যেখানেই যেতাম, সেখানেই দেখতাম যে, তার বাড়ি আমার বাড়ির চেয়ে ভালো। তার বাহন আমার বাহন থেকে উন্নত। তার কাপড় আমার কাপড়ের তুলনায় উৎকৃষ্ট। এগুলো দেখে আমার অন্তরে কষ্ট হতো যে, আমি এগুলো পাইনি অথচ ওরা পেয়েছে। পরবর্তীতে জাগতিকভাবে যারা কম সম্পদশালী তাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করি। তাদের সাথে ওঠাবসা আরম্ভ করি। ফলে আমি শান্তি লাভ করি। কারণ, যাকেই দেখি, মনে হয় যে, আমি তো অনেক ভালো আছি। অনেক সচ্ছল অবস্থায় আছি। আমার খাবার তার খাবারের চেয়ে উন্নত। আমার কাপড় তার কাপড়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আমার বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দামী। আমার

---

১. মুসনাদু আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ২০৪৪৭, ২০৫৪০

বাহন তার বাহনের চেয়ে ভালো। এ কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন শান্তিতে আছি।'[১]

অল্পেতুষ্টি অর্জনের উপায়

এটি ছিলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর আমল করার বরকত। যে কেউ আমল করে এর বরকত দেখতে পারে। জাগতিক বিষয়ে নিজের চেয়ে উপরের লোককে দেখতে থাকলে কখনোই পেট ভরবে না। কখনোই পরিতুষ্টি লাভ হবে না। কখনোই চোখ জুড়াবে না। সবসময় এ চিন্তাই মাথায় সওয়ার হয়ে থাকবে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَوْكَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ

'আদমসন্তান যদি স্বর্ণভর্তি একটি উপত্যকা লাভ করে, তাহলে সে দু'টি উপত্যকা পেতে চাইবে।'[২]

দু'টি লাভ হলে তিনটি পেতে চাইবে। এভাবে সারাটি জীবন এ প্রতিযোগিতাতেই ব্যয় হবে। কখনো সুখ, পরিতুষ্টি ও পরিতৃপ্তির গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবে না।

ধন-সম্পদ দ্বারা শান্তি কেনা যায় না

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) বড় চমৎকার কথা বলতেন। যা মানসপটে অঙ্কন করে রাখার যোগ্য। তিনি বলতেন-

'সুখ-শান্তি এক জিনিস, আর তার উপকরণ আরেক জিনিস। উপকরণ লাভ হলেই সুখ-শান্তি লাভ হওয়া জরুরী নয়। শান্তি মহান

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৭৮০, হিলয়াতুল আওলিয়া, খণ্ডঃ ২, পৃ. ১৮৯, ফয়যুল কাদীর, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৯৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৬৪৫, সিফাতুস সফওয়াহ, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ১১০, উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সবগুলো কিতাবে এ উক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের পরিবর্তে আওন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবার বলে উল্লেখিত আছে।

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৬, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩৭, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭২৬

আল্লাহর দান। আমরা শান্তির উপকরণকেই শান্তি নাম দিয়েছি। একজনের কাছে অনেক টাকা আছে। ক্ষুধার সময় কি সে টাকা ভক্ষণ করবে? কাপড়ের প্রয়োজন হলে কি সে তা পরিধান করবে? গরমের সময় কি ঐ টাকা তাকে শীতলতা দান করতে পারবে? টাকা নিজেও শান্তি নয় এবং তার মাধ্যমে শান্তি ক্রয়ও করতে পারবে না। এর মাধ্যমে যদি শান্তির উপকরণ ক্রয় করো-ও, যেমন এর দ্বারা তুমি পানাহারের বস্তু ক্রয় করলে, উন্নত মানের কাপড় ক্রয় করলে, ঘরের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করলে- কিন্তু এতেই কি শান্তি লাভ হবে? মনে রেখো! শুধু এসব উপকরণ সংগ্রহ করার দ্বারাই শান্তি পাওয়া আবশ্যকীয় নয়। কারণ, এক ব্যক্তির কাছে যাবতীয় সুখসামগ্রী আছে, কিন্তু সাহেবের বড়ি খাওয়া ছাড়া ঘুম আসে না। বিছানা আরামদায়ক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। চাকর-নওকর সবই আছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। এবার বলো, যাবতীয় সুখসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ঘুম পাওয়া গেলো? শান্তি লাভ হলো? আরেক ব্যক্তির ঘরে পাকা ছাদ নেই। টিনের ছাউনি। চৌকি নেই। বিছানা মাটিতে বিছানো। নিজেরই একটি হাত মাথার নিচে রাখলো আর সোজা ঘুমের কোলে চলে গেল। আট ঘন্টা পরিপূর্ণ ঘুম দিয়ে ভোরে জাগ্রত হলো। বলো? শান্তি কে পেলো? তার কাছে সুখসামগ্রী আছে, কিন্তু সুখ নেই। আর এ দিনমজুরের কাছে সুখসামগ্রী নেই কিন্তু সুখ আছে। মনে রেখো! দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের পিছনে পড়লে, অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার ধান্দা করলে- ভালো করে বুঝে নাও- সুখসামগ্রী তো লাভ হবে, কিন্তু সুখের নাগাল পাওয়া যাবে না।'

যে সম্পদ দ্বারা শান্তির নাগাল পাওয়া যায় না তাতে লাভ কী?

হযরত ওয়ালেদ মাজেদ (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর যামানায় একজন শিল্পপতি ছিলেন। শুধু পাকিস্তানেই নয়, বরং বিভিন্ন দেশে তার ব্যবসা বিস্তৃত ছিলো। একদিন এমনিতেই ওয়ালেদ ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন- 'আপনার সন্তান কতো জন?'

তিনি বললেন- 'এক ছেলে সিঙ্গাপুর থাকে। এক ছেলে অমুক দেশে থাকে। সবাই বিদেশে থাকে।'

পুনরায় বললেন- 'আপনার ছেলেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তো? তারা আসা-যাওয়া করে তো?'

তিনি বললেন- 'এক ছেলের সঙ্গে পনেরো বছর আগে দেখা হয়েছে...।'

পনেরো বছর ধরে বাবা ছেলের চেহারা দেখেনি এবং ছেলে বাবার চেহারা দেখেনি। এবার বলুন! এমন টাকা এবং এমন সম্পদ কোন্ কাজের, যা ছেলেকে বাবার চেহারা দেখাতে পারে না এবং বাবাকে ছেলের চেহারা দেখাতে পারে না। এ সমস্ত দৌড়-ঝাঁপ হচ্ছে সুখসামগ্রীর জন্যে। কিন্তু সুখ নাগালের বাইরে। তাই মনে রেখো! টাকা দ্বারা সুখ কেনা যায় না।

টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না

অল্প কয়দিন আগে এক ব্যক্তি বললেন, রমাযানে তিনি উমরায় গিয়েছিলেন। আরেকজন ধনী ব্যক্তিও উমরায় যাচ্ছিলেন। তো আমি তাকে বললাম- 'উমরায় যাচ্ছো, আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ো। যেন থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা হয়।' সে সম্পদের অহমিকায় বললো- আরে মিয়া! বাদ দাও প্রস্তুতি। আল্লাহ্‌র শোকর টাকা-পয়সার অভাব নেই। টাকা হলে দুনিয়ায় সবই পাওয়া যায়। আরামদায়ক থাকার ব্যবস্থাও হয়, খাবার ব্যবস্থাও হয়। চিন্তার কিছু নেই। আমার কাছে টাকা অনেক আছে। দশ রিয়ালের স্থলে বিশ রিয়াল খরচ করবো। ঐ লোক বলছিলেন- 'আমি দু'দিন পর তাকে দেখলাম- হেরেম শরীফের দরজায় মাথা নত করে বসে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ভাই কী হয়েছে তোমার?' সে বললো- শেষরাতে ওঠেছিলাম। কিন্তু হোটেলে খানা পাইনি। খানা শেষ হয়ে গেছে। মাথায় অহংকার ছিলো- টাকা হলে সব কেনা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা দেখিয়ে দিলেন- 'দেখো! তোমার টাকা তোমার পকেটেই রয়ে গেলো, আর না খেয়ে রোযা রাখতে হলো।'

শান্তি লাভের উপায়

টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম যা কিছু তোমরা সংগ্রহ করছো, এগুলো মৌলিকভাবে শান্তি দানকারী নয়। শান্তি টাকা দিয়ে

কেনা যায় না। তা কেবলই আল্লাহ তা'আলার দান। যতক্ষণ পর্যন্ত অল্পেতুষ্টি লাভ না হবে, যতক্ষণ এ মনোভাব সৃষ্টি না হবে যে, আল্লাহ তা'আলা হালাল উপায়ে যতোটুকু আমাকে দিচ্ছেন তাতেই চলে যাবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি শান্তির নাগাল পাবে না। এমন কতো লোক রয়েছে, যাদের বেহিসাব ধন-দৌলত রয়েছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও শান্তি নেই। ক্ষণিকের জন্যেও স্থিরতা নেই। রাতে ঘুম আসে না। ক্ষুধা লাগে না। এসবই জাগতিক প্রতিযোগিতার ফল। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে উপরের লোককে দেখো না যে, সে কতো উপরে উঠেছে। বরং নিজের চেয়ে নিচের লোককে দেখো, তার তুলনায় আল্লাহ তোমাকে কতো কিছু দিয়েছেন। তাহলে তোমার মধ্যে স্থিরতা আসবে। শান্তি আসবে। প্রশান্তি লাভ হবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরের লোককে দেখো। কেন? এ কারণে যে, এতে করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হবে। অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। তবে এ অস্থিরতা বড় মজার। পক্ষান্তরে সম্পদ জমানোর অস্থিরতা কষ্টদায়ক। অশান্তির কারণ। রাতের ঘুম থাকে না। কিন্তু দ্বীনের জন্যে অস্থিরতা বড় মজার। অতি স্বাদের। মানুষ সারাজীবন এ অস্থিরতায় অতিবাহিত করলে তবুও তার মজাই লাগবে। সুখ-শান্তিতে থাকবে। কিন্তু আমাদের জীবনের চাকা চলছে উল্টো দিকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে সঠিক করে দিন। আমাদের অন্তরকে সঠিক করে দিন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, তার উপর চলার তাওফীক দান করুন।

সামনে এ বিষয়ে কিছু হাদীস আসছে।

ফেতনার যুগ আসছে

প্রথম হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত-

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَتَكُوْنُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

'অতি দ্রুত নেক আমল সেরে নাও। যতোটুকু সময় পাও, তাকে গনীমত মনে করো। অনেক বড় বড় ফেতনার আগমন ঘটবে, অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো ফেতনাসমূহ।'[১]

এ কথার অর্থ এই যে, অন্ধকার রাত যখন আগমন করে এবং তার একাংশ অতিবাহিত হয়, তার পরবর্তী অংশও ঐ রাতেরই অংশ হয়ে থাকে। তাতে অন্ধকার আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তৃতীয়াংশে অন্ধকার আরও অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি এ অপেক্ষায় থাকে যে, মাত্র মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে। হালকা অন্ধকার বিরাজ করছে। কিছু সময় যাওয়ার পর আলো আসবে তখন কাজ করবো। তাহলে সে ব্যক্তি নির্বোধ। কারণ, এখন সময় যতো অতিবাহিত হবে, অন্ধকার ততো বৃদ্ধি পাবে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, তোমার অন্তরে যদি এ চিন্তা থাকে যে, আরো কিছু সময় পার হলে কাজ আরম্ভ করবো, তাহলে মনে রেখো, সামনে যে সময় আসবে তাতে আরো অধিক অন্ধকার হবে। আগামীতে যেসব ফেতনা আসবে সেগুলোও অন্ধকার রাতের টুকরোর ন্যায়। প্রত্যেক ফেতনার পর তার চেয়ে বড় ফেতনা আসবে। অতঃপর তিনি বলেন- 'মানুষ সকালে মু'মিন থাকবে আর সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে'। অর্থাৎ এমন সব ফেতনা আসবে, যা মানুষের ঈমান হরণ করবে। সকালে মুমিন অবস্থায় জাগ্রত হবে, কিন্তু ফেতনার শিকার হয়ে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। কাফের এভাবে হবে যে, 'দুনিয়ার সামান্য উপকরণের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিক্রি করবে।' সকালে মু'মিন অবস্থায় উঠেছিলো, যখন কর্মক্ষেত্রে গেছে, তখন চিন্তাই ছিলো দুনিয়া উপার্জনের, ধন-দৌলত সংগ্রহের। এমন সময় সম্পদ লাভের এমন একটা সুযোগ এলো, যেখানে শর্ত ছিলো যে, দ্বীন ছেড়ে দাও তাহলে দুনিয়া পাবে। এখন মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। দ্বীন বিসর্জন দিয়ে সম্পদ অর্জন করবো, না সম্পদকে লাথি মেরে দ্বীন সংরক্ষণ করবো। কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই গড়িমসি করতে অভ্যস্ত ছিলো, তাই সে চিন্তা করলো, দ্বীন সম্পর্কে কবে প্রশ্ন করা হবে

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯, সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং ২১২১, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭২৮৭, রিয়াযুস সালিহীন, পৃ. ৫৯

তা তো অজানা। কবে মরবো, কবে হাশর হবে, কবে হিসাব-নিকাশ হবে সে তো পরের বিষয়। এ সম্পদ তো এখন নগদ অর্জন হচ্ছে। তখন সে জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম লাভের জন্যে নিজের দ্বীন বিক্রি করে ফেলবে। এজন্যে বলেছেন- সকালে মু'মিন অবস্থায় উঠেছিলো আর সন্ধ্যায় কাফের হয়ে ঘুমালো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।

'এখনো তো আমি যুবক'- এটি একটি শয়তানী ধোঁকা

তাই কিসের অপেক্ষায় আছো? যদি নেক আমল করতে হয়, যদি মুসলমানের মতো বাঁচতে হয়, তাহলে কিসের প্রতীক্ষা করছো? যে আমল করার আছে, তাড়াতাড়ি করে ফেলো। এখন আমরা সকলে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখি- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতো আমল করছি কি না। আমাদের অন্তরে দিনরাত চিন্তা জাগে যে, এখন থেকে নেক আমল করবো। আর শয়তান ধোঁকা দিতে থাকে যে, এখনো তো জীবনের অনেক সময় অবশিষ্ট আছে। এখনো তো তরুণ বয়স। সামনে প্রৌঢ়ত্ব আসবে। তারপর বার্ধক্যে উপনীত হবো। তখন নেক আমল আরম্ভ করবো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি আমাদের শিরা-উপশিরা সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন, শয়তান তাদেরকে এভাবে ধোঁকা দিবে। তাই বলে দিয়েছেন- তাড়াতাড়ি নেক কাজ করে ফেলো। যেসব নেক কাজের কথা শুনছো, সেগুলোর উপর আমল করতে থাকো। আগামী দিনের অপেক্ষায় থেকো না। কারণ, জানা নেই আগামীকালের ফেতনা তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌছাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

নফ্‌সকে ফুসলিয়ে কাজ নাও

আমার শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী ছাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) বলতেন যে, নফ্‌সকে একটু ধোঁকা দিয়ে তার দ্বারা কাজ আদায় করো। তিনি নিজের ঘটনা বলেন যে, প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিলো। শেষ বয়সে দুর্বল অবস্থায় একদিন তাহাজ্জুদের সময় চোখ খুলে যায়, আলহামদুলিল্লাহ। ভীষণ অলসতা আর ক্লান্তি কাজ করছিলো। মনে

উদয় হলো, আজ শরীরটা ভালো না। অলসতাও লাগছে। বয়স তো কম হয়নি। তাহাজ্জুদের নামায ওয়াজিব-ফরযও নয়। শুয়ে থাকো। একদিন তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিলে এমন কী হবে? হযরত বলেন- আমি চিন্তা করলাম, কথা তো ঠিক। তাহাজ্জুদ ওয়াজিব-ফরয নয়। শরীরও ভালো নয়। কিন্তু সময়টি তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুলিয়াতের।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, তখন জমিনবাসীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত নিবিষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষক আহ্বান করে- আছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? তাকে ক্ষমা করা হবে।[১]

এমন সুবর্ণ সময়কে হেলায় নষ্ট করা ঠিক নয়। নফ্সকে ফুসলিয়ে বললাম- আচ্ছা উঠে বসো। বসে সামান্য দু'আ করো। দু'আ করে ঘুমিয়ে পড়ো। সুতরাং উঠে বসলো এবং দু'আ করতে আরম্ভ করলো। দু'আ করতে করতে আমি নফস্কে বললাম- মিঞা! উঠে যখন বসেছো। ঘুমও চলে গেছে। তাহলে হাম্মামে যাও। এস্তেঞ্জা সারো। তারপর আরামে ঘুমাও! হাম্মামে গিয়ে এস্তেঞ্জা সারার পর মনকে বলি- এবার ওযু-ও সেরে নাও! কারণ, ওযু করে দু'আ করলে কবুল হওয়ার বেশি আশা রয়েছে। তাই ওযু করে, বিছানায় এসে বসে দু'আ আরম্ভ করি। তখন নফ্সকে বুঝাই যে, বিছানায় বসে বসে কী দু'আ করছো! তোমার দু'আ করার যেই জায়গা রয়েছে, সেখানেই গিয়ে দু'আ করো। এভাবে নফ্সকে জায়নামায পর্যন্ত নিয়ে যাই। গিয়েই দু'রাকাত তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ফেলি।

তারপর বলেন- এই নফ্সকে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে কাজে লাগাতে হয়। যেভাবে নফ্স তোমার দ্বারা নেক কাজে বিলম্ব করাতে চায়, তেমনিভাবে তুমিও তার সঙ্গে একইরূপ আচরণ করো। তাকে টেনে টেনে নেক কাজে নিয়ে আসো। ইনশাআল্লাহ, এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ঐ আমল করার তাওফীক দান করবেন।

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৮৪৬, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬১, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৪০৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১১২০, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৩৫৬, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭১৯৬

কোথায় রাষ্ট্রপ্রধান, আর কোথায় আল্লাহর মহিমা?!

একবার বলেন যে, ফজর নামাযের পর দুই ঘণ্টা পর্যন্ত নিজের নিয়মিত আমল, তিলাওয়াত, যিকির ও তাসবীহ্ পাঠে অতিবাহিত করি। একদিন কিছুটা অলসতা লাগছিলো। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, আজ তো বলছো অলসতা লাগছে। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। উঠতে পারছি না। আচ্ছা বলো, এখন যদি কেউ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সংবাদ নিয়ে আসে যে, আপনাকে একটি পুরস্কার দেয়ার জন্যে ডাকা হয়েছে। তখনও কি অলসতা থাকবে? তখনও কি এ ক্লান্তি থাকবে? নফ্স জবাব দিলো- না, তখন অলসতা ও ক্লান্তি থাকবে না। বরং দৌড়ে গিয়ে ঐ পুরস্কার নেয়ার চেষ্টা করবো। এরপর নিজের নফ্সকে বলি যে, এটিও আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়ার সময়। এই হাজির হওয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ হবে। তাহলে কিসের অলসতা, আর কিসের ক্লান্তি! এসব অলসতা আর ক্লান্তি ছুঁড়ে ফেলো। এ কথা চিন্তা করে নিজের মনকে উদ্বুদ্ধ করি এবং আমল করতে আরম্ভ করি। নফ্স ও শয়তান মানুষকে প্রতারিত করছে। তোমরাও তাদেরকে ফুসলাও এবং দ্রুত আমল করার ফিকির করো।

জান্নাতের প্রকৃত সন্ধানী

দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

'উহুদ যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। মুসলমান ও কাফেরের মাঝে লড়াই হচ্ছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো কম, কাফেরদের বেশি। মুসলমানগণ নিরস্ত্র, কাফেররা সশস্ত্র। সবদিক থেকেই যুদ্ধটি ছিলো কঠিন। এমতাবস্থায় বেদুঈন কিসিমের এক লোক খেজুর খাচ্ছিলো। লোকটি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের দ্বারা যে যুদ্ধ করাচ্ছেন, এতে যদি আমরা নিহত হই তাহলে আমাদের পরিণতি কী হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- এর পরিণতি হবে জান্নাত। তোমরা তখন সোজা জান্নাতে চলে যাবে। হযরত জাবের

রাযি. বলেন- লোকটিকে আমি খেজুর খেতে দেখছিলাম। কিন্তু যখনই সে শুনলো যে, এর পরিণতি হবে জান্নাত, তখনই সে খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে যুদ্ধে নেমে পড়লো এবং শহীদ হয়ে গেল।'[১]

তিনি যখন শুনেছেন যে, এ জিহাদের পরিণতি হবে জান্নাত, তখন খেজুরগুলো খেয়ে জিহাদে অংশ নিবেন এতোটুকু বিলম্বও সহ্য হয়নি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে জান্নাতে পৌছে দিয়েছেন। এটা এরই বরকত ছিলো যে, নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হতেই অবিলম্বে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন এবং সে অনুপাতে আমল করেছেন।

আযানের শব্দ শোনামাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা

হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন- উম্মুল মু'মিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ির বাইরে যেসব কথা বলেন এবং যেভাবে জীবন যাপন করেন তা তো আমাদের সবার জানা। কিন্তু আপনি বলুন! ঘরের মধ্যে তিনি কী আমল করেন? (তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ঘরের মধ্যে গিয়ে জায়নামায বিছিয়ে নামায, যিকির ও তাসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল থাকেন।) হযরত আয়েশা রাযি. বললেন-

'তিনি ঘরে তাশরীফ এনে আমাদের সঙ্গে ঘর-বাড়ির কাজে অংশ নেন। আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনেন। আমাদের সঙ্গে রসালাপ করেন। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। তবে একটি বিষয়, যখনই আযানের শব্দ কানে পড়ে, তখন তিনি এমনভাবে উঠে চলে যান, যেমন কিনা তিনি আমাদেরকে চেনেনই না।'[২]

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৩৭৪০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫১৮, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৩১০৩, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৩৭৯৪

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৪৯৪৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৩, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৩০৯৩

শ্রেষ্ঠ দান

তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ
الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ
وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ
كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

'এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলো- কোন্ দানের সওয়াব সর্বাধিক। তিনি বললেন- সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো, তুমি তোমার সুস্থাবস্থায় দান করবে। এমতাবস্থায় দান করবে, যখন তোমার অন্তরে মালের মহব্বত রয়েছে। যখন সম্পদ বিলাতে মন চায় না। যখন সম্পদ খরচ করতে কষ্ট হয় এবং আশঙ্কা থাকে যে, দান করার ফলে পরবর্তীতে আমি অভাবের শিকার হবো। পরবর্তীতে কী অবস্থা হয় তা তো আমার জানা নেই। এমতাবস্থায় যে দান করবে তার সওয়াব হবে অধিক। তারপর তিনি বললেন- দান করার চিন্তা মনে আসলে তখন বিলম্ব করো না।'

এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিছু লোক আছে, যারা দানকে বিলম্বিত করতে থাকে। তারা চিন্তা করে, যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন অসিয়ত করে যাবো যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পদ থেকে অমুককে এ পরিমাণ দিবে, অমুককে এ পরিমাণ দিবে। আর অমুক কাজে এ পরিমাণ ব্যয় করবে ইত্যাদি। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, 'তুমি তো বলছো- এ পরিমাণ সম্পদ অমুককে দিবে, কিন্তু এখন তো আর ঐ সম্পদ তোমার নেই। এখন তো তা অন্যের হয়ে গেছে। কারণ, শরীয়তের মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থ অবস্থায় দান করে বা অসিয়ত করে যায় যে, এ পরিমাণ সম্পদ অমুককে দিবে, আর ঐ রোগে তার মৃত্যু হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তার সম্পদের কেবল এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার দান কার্যকর হবে। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ পাবে উত্তরাধিকারীরা। তা উত্তরাধিকারীদের হক।

কারণ, মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থাতেই সম্পদের সঙ্গে ওয়ারিশদের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

সে চিন্তা করেছিলো যে, শেষ জীবনে সব সম্পদ সদকায়ে জারিয়ার কোনো কাজে লাগাবে। তাহলে সবসময় সওয়াব পেতে থাকবে। কিন্তু ওটা তো নিরুপায়ের দান। আসল সওয়াবের দান তো ঐটা, যা সুস্থাবস্থায়, সম্পদের প্রয়োজনের সময়, অন্তরে সম্পদের মহব্বত এবং তা সঞ্চয়ের চিন্তা থাকা অবস্থায় করা হয়।

একতৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে অসিয়ত কার্যকর হয়

এখানে এ বিষয়টি ভালো করে বুঝুন যে, কতক লোক সদকায়ে জারিয়ার কাজে সম্পদ ব্যয় করা এবং মৃত্যুর পর তার সওয়াব পাওয়ার আশায় অসিয়ত করতে আগ্রহী থাকে। কিন্তু সে তার জীবদ্দশায় এবং সুস্থাবস্থায় যদি অসিয়ত লিখে যায় যে, আমার মৃত্যুর পর এ পরিমাণ সম্পদ অমুক অভাবীকে যেন দিয়ে দেয়া হয়। তাহলে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে এ অসিয়ত কার্যকর হবে। এর অতিরিক্তের মধ্যে হবে না। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন-

'দান করার আগ্রহ সৃষ্টি হলে সাথে সাথে তার উপর আমল করো।'

নিজের আয়ের একটি অংশ দান করার জন্যে পৃথক করুন

এর একটি পদ্ধতি আমি আপনাদের সামনে পূর্বেও আলোচনা করেছি। বুযুর্গগণ এর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কোনো মানুষ এর উপর আমল করলে তার দান করার তাওফীক হবে। অন্যথায় আমরা তো নেক কাজকে বিলম্বিত করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। সে পদ্ধতিটি হলো, আপনার আয়ের একটি অংশ নির্দিষ্ট করুন যে, এ অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করবো। আল্লাহ তা'আলা যতোটুকু তাওফীক দেন ততোটুকুই করুন। নিজের আয়ের এক দশমাংশ হোক বা বিশ ভাগের এক ভাগ হোক ইত্যাদি। আপনার আমদানি যখন হাতে আসবে, তার মধ্য থেকে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ পৃথক করে রাখুন। এর জন্যে একটি খাম রাখুন। তার মধ্যে এ টাকা রাখতে থাকুন। ওই খামই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে- 'আমাকে খরচ করো। উপযুক্ত খাতে আমাকে ব্যয়

করো।' এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা খরচ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন। এমন করা না হলে, খরচ করার সুযোগ সামনে এলে মানুষ খরচ করবে কি করবে না, চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু খামটি থাকলে এবং আগে থেকেই এর মধ্যে টাকা সংরক্ষিত থাকলে সে নিজেই স্মরণ করিয়ে দিবে। সুযোগ সামনে আসলে তখন আর চিন্তা করার প্রয়োজন পড়বে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি নিজ নিজ সামর্থ্য মতো এই নিয়ম বানিয়ে নেয়, তাহলে তার জন্যে খরচ করা সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা পরিমাণ দেখেন না

মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা পরিমাণ ও সংখ্যা দেখেন না। তিনি দেখেন আবেগ ও ইখলাস। যার আয় একশ' টাকা, সে যদি আল্লাহর পথে এক টাকা দান করে, সে ওই ব্যক্তির সমান, যার আয় এক লক্ষ টাকা আর সে আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার টাকা দান করে। বরং অসম্ভব নয় যে, এক টাকা দানকারী ব্যক্তি নিজ ইখলাসের গুণে তার চেয়েও আগে চলে যেতে পারে। তাই পরিমাণ দেখবেন না। আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফযীলত লাভ করতে হবে, সেদিকে দেখুন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে নিজ আয়ের অল্প হলেও অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করুন।

আমার ওয়ালেদ মাজেদ (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর আমল

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) সবসময় তাঁর পরিশ্রমলব্ধ আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগ, আর বিনা পরিশ্রমে অর্জিত আয়ের এক দশ ভাগের এক ভাগ পৃথক খামের মধ্যে রেখে দিতেন। এক টাকাও যদি আসতো তখনই তার ভাংতি করে এক দশমাংশ ঐ খামের মধ্যে রেখে দিতেন। একশ' টাকা আসলে দশ টাকা রেখে দিতেন। কখনো ভাংতি টাকা না থাকার কারণে সাময়িক সমস্যা দেখা দিলে তার জন্যে পৃথক ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু সারা জীবনে কখনো এর ব্যতিক্রম করতে দেখিনি এবং সারা জীবনে কখনো ঐ খাম শূন্যও হতে দেখিনি। এ আমলের ফল এই যে, মানুষ যখন এভাবে টাকা বের করে পৃথক করে রাখে, তখন ঐ খাম নিজেই

স্মরণ করিয়ে দেয় যে- আমাকে ব্যয় করো। সঠিক কাজে ব্যবহার করো। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা দান করার তাওফীক দিয়ে থাকেন।

প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য মোতাবেক দান করবে

একবার এক ব্যক্তি বললো, ছাহেব! আমার নিকট তো কিছুই নেই, আমি কোত্থেকে দান করবো? আমি নিবেদন করলাম- এক টাকা তো আছে, তা থেকে এক পয়সা তো বের করতে পারেন। যে ব্যক্তি একেবারে ফকীর, তার কাছেও এক টাকা থাকে। এক টাকা থেকে এক পয়সা দিয়ে দিলে এমন কিছু কমবে না। অতএব এক পয়সাই দান করুন। এই ব্যক্তির এক পয়সা দান করা, আর অন্য ব্যক্তির এক লাখ টাকা থেকে এক হাজার টাকা দান করার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এ জন্যে পরিমাণ দেখবেন না। যখন যে আমলের আগ্রহ হয়, তা করে ফেলুন।

এটা হলো আত্ম-সংশোধনের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। নিজেকে টালবাহানা করা থেকে বাঁচান। এভাবে আমল করলে ইনশাআল্লাহ এর বরকতে সঠিক পথে সম্পদ ব্যয় করার বড় বড় পথ উন্মুক্ত হবে। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

কিসের প্রতীক্ষায় আছো?

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ، فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ. أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

'সাত জিনিসের আগমনের পূর্বে দ্রুত নেক আমল করে নাও। তোমরা কি নেক আমল করার জন্যে এমন অভাব-অনটনের প্রতীক্ষায়

আছো, যা ভুলিয়ে দেয়? নাকি এমন সচ্ছলতার প্রতীক্ষায় আছো, যা মানুষকে অবাধ্য করে তোলে? নাকি এমন রোগের প্রতীক্ষায় আছো, যা তোমাদেরকে অসুস্থ করে দিবে? নাকি অবসাদকারী বার্ধক্যের প্রতীক্ষায় আছো? নাকি সেই মৃত্যুর অপেক্ষায় আছো, যা অকস্মাৎ এসে পড়বে? নাকি দাজ্জালের প্রতীক্ষায় আছো? দাজ্জাল হবে অদেখা জিনিসসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম জিনিস, যার প্রতীক্ষা করা হচ্ছে। নাকি কিয়ামতের প্রতীক্ষায় আছো! তাহলে শুনে রাখো! কিয়ামত হবে বড়ই বিপদজনক!'[1]

হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। এতে 'মুবাদারাত ইলাল খাইরাত' তথা নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا

'সাত জিনিস আগমনের পূর্বে দ্রুত নেক আমল করে নাও।'

যেগুলোর পরে আর নেক আমল করার সুযোগ পাবে না। তারপর তিনি একটি ব্যতিক্রমী আঙ্গিকে এ সাতটি বিষয় তুলে ধরেছেন।

অভাবের প্রতীক্ষায় আছো কি?

هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا

'তোমরা কি নেক আমল করার জন্যে এমন অভাব-অনটনের প্রতীক্ষায় আছো, যা ভুলিয়ে দেবে।'

এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, এখন তুমি সচ্ছল আছো। হাতে টাকা-পয়সা আছে। পানাহার সামগ্রীর অভাব নেই। আরাম-আয়েশে জীবন কাটছে। এমতাবস্থায় তুমি নেক আমলে অবহেলা করছো। তাহলে কি তুমি এ প্রতীক্ষায় আছো যে, এ সচ্ছলতা যখন হাতছাড়া হয়ে যাবে। আল্লাহ না করুন, যখন অভাব-অনটন চলে আসবে। সেই অভাবের তাড়নায় অন্য সবকিছু যখন ভুলে যাবে, তখন নেক আমল করবে? তুমি যদি এরূপ চিন্তা করে থাকো যে, এ সচ্ছল অবস্থায় আনন্দ-ফুর্তিতে দিন

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭৯৫২, রিয়াযুস সালিহীন, পৃ. ৫৯

কাটছে। যখন অন্য রকম সময় আসবে, তখন নেক আমল করবো। এর উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন- যখন অর্থ-সংকট দেখা দিবে, তখন নেক আমল থেকে আরো দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন মানুষ এত অস্থির হয়ে পড়ে, জরুরী কাজও ভুলে যায়। এমন সময় আসার আগে, অর্থ সংকট দেখা দেয়ার আগে, জীবিকার পেরেশানীতে পড়ার আগে যে সচ্ছলতা তুমি লাভ করেছো, তা গনীমত মনে করে নেক আমলে ব্যয় করো।

সচ্ছলতার প্রতীক্ষায় আছো কি?

তারপর বলেন-

أَوْ غِنًى مُّطْغِيًا

'নাকি তুমি এমন সচ্ছলতার প্রতীক্ষায় আছো, যা মানুষকে অবাধ্য করে তোলে।'

অর্থাৎ, এখন অনেক বেশি সম্পদশালী নও, তাই চিন্তা করছো যে, এখন কিছুটা অর্থসংকট রয়েছে, কিংবা অর্থসংকট তো নেই, কিন্তু মন চাচ্ছে আরো কিছু টাকা-পয়সা হোক। আরো কিছু সম্পদ লাভ হোক। তখন নেক আমল করবো। মনে রেখো! যদি অধিক সচ্ছলতা চলে আসে, অনেক বেশি টাকা-পয়সা হাতে আসে এবং সম্পদের স্তূপ হস্তগত হয়, তাহলে এর পরিণতিতে আশঙ্কা আছে, এ ধন-দৌলত তোমাকে আরো বেশি অবাধ্যতায় নিপতিত করবে। কারণ, মানুষের যখন ধন-সম্পদ বেড়ে যায়, অধিক আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা হয়, তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায়। তাই যা কিছু করার এখনই করে নাও।

অসুস্থতার প্রতীক্ষায় আছো কি?

أَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا

'নাকি এমন রোগের প্রতীক্ষায় আছো, যা তোমাকে অসুস্থ করে দিবে।'

অর্থাৎ, এখন তো সুস্থ আছো। শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক আছে। দেহে শক্তি-সামর্থ্য আছে। এখন কোনো আমল করতে চাইলে সহজে করতে পারবে। তারপরও আমল করছো না, তাহলে কি ওই সময়ের জন্যে নেক আমলকে

বিলম্বিত করছো, যখন এ সুস্থতা হাতছাড়া হয়ে যাবে? আল্লাহ না করুন, যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে নেক আমল কি তখন করবে? আরে সুস্থ অবস্থায় যখন নেক আমল করতে পারছো না, তখন অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে করবে? আল্লাহই জানেন- সেই অসুস্থতা কেমন হবে এবং কখন আসবে? তাই অসুস্থতা আসার আগেই নেক আমল করে নাও!

বার্ধক্যের প্রতীক্ষায় আছো কি?

أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا

'নাকি অবসাদকারী বার্ধক্যের প্রতীক্ষায় আছো?'

তুমি মনে করছো, এখন তো মাত্র যুবক। বয়সইবা কত হয়েছে? দুনিয়ার এমন কি-ই বা দেখেছি? যৌবনের এ সময়টা ভোগ-বিলাসে কাটুক। তারপর নেক আমল করবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন- 'তুমি কি বার্ধক্যের প্রতীক্ষায় আছো?' অথচ অনেক সময় বার্ধক্যে মানুষের হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। কোনো কাজ করতে চাইলেও পারে না। তাই বার্ধক্য আসার আগেই নেক আমল করে নাও। বার্ধক্য অবস্থায় মুখে দাঁত থাকে না। পেটে হজম শক্তি থাকে না। তখন তো গোনাহ্ করার শক্তিও থাকবে না। তখন যদি গোনাহ থেকে বেঁচেও থাকো, তো এমন কী বড় কিছু করে ফেললে? যখন যৌবন আছে, দেহে শক্তি আছে, পাপের উপকরণ আছে, গোনাহের ব্যবস্থা আছে, মনে পাপকাজের চাহিদা আছে, এমতাবস্থায় যদি মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তা হবে নবীগণের সত্যিকারের অনুসরণ। এ সম্পর্কে শেখ সাদী রহ. বলেন-

وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری

আরে! বুড়ো হয়ে গেলে তো হিংস্র বাঘও পরহেযগার হয়ে যায়। কোনো নীতিদর্শন তাকে পরহেযগার বানায়নি। পরহেযগার বানায়নি খোদাভীতিও। বরং অক্ষম হয়ে যাওয়ায় সে পরহেযগার হয়ে গেছে। সে ছিড়ে-ফেড়ে খেতে পারে না। পূর্বের সেই শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। তাই সে পরহেযগার হয়ে এক কোণে বসে আছে। মনে রেখো!

যৌবনকালে তাওবা করা হলো নেককারদের স্বভাব। তাঁদের নিদর্শন। হযরত ইউসুফ আ.-এর বিষয়টি লক্ষ্য করো। পূর্ণ যৌবন। শক্তি-সামর্থ্য পরিপূর্ণ। পরিস্থিতি অনুকূল। এমতাবস্থায় গোনাহের আহ্বান করা হচ্ছে। এমন সময় তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়-

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ

'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় আমার রব উত্তম আশ্রয়স্থল।'[১]

এ হলো নবীসুলভ চরিত্র। মানুষ যৌবনকালে গোনাহ থেকে তাওবা করবে। যুবক থাকাবস্থায় নেক আমল করবে। বৃদ্ধাবস্থায় তো কোনো কাজ করতে পারে না। হাত-পা চালানোর শক্তি নেই। এখন আর কী গোনাহ করবে? গোনহের সুযোগই হাতছাড়া হয়ে গেছে।

তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, তুমি কি চিন্তা করছো যে, যখন বৃদ্ধ হবো, তখন নেক আমল করবো? তখন নামায শুরু করবো? তখন আল্লাহর যিকির করবো? হজ্জ ফরয হলে- চিন্তা করো যে, অধিক বয়স হলে তখন হজ্জে যাবো। আল্লাহই ভালো জানেন, জীবনের কতো দিন আর অবশিষ্ট রয়েছে? কতোটুকু আর অবকাশ হাতে রয়েছে? বার্ধক্য আসবে কিনা? আর যদি আসেও তখন পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে না প্রতিকূলে, তা তো জানা নেই। তাই এখনই আমল করে নাও।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছো কি?

أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا

'নাকি তুমি সেই মৃত্যুর অপেক্ষায় আছো, যা অকস্মাৎ এসে পড়বে?'

এখনতো তুমি নেক আমলকে বিলম্বিত করছো। কাল করবো, পরশু করবো, আরো কিছুদিন যাক তারপর আরম্ভ করবো। তুমি কি জানো না, মৃত্যু অকস্মাৎ চলে আসতে পারে? কতক সময় তো মৃত্যু আসে আগাম সংবাদ দিয়ে। সতর্ক করে। আর কখনো চলে আসে বিনা

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৩

নোটিশেই। বর্তমান বিশ্বে তো দুর্ঘটনার পরিমাণ এত বেশি যে, কিছুই বলা যায় না, কখন কার সাথে কী হয়ে যায়? সাধারণত আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করতে থাকেন।

মালাকুল মউতের সাক্ষাৎ

একটি ঘটনা আছে- একবার এক লোকের মালাকুল মউতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। (আল্লাহ জানেন কতোটুকু সঠিক। তবে ঘটনাটি শিক্ষণীয়।) লোকটি হযরত আযরাঈল আ.-কে বলে- জনাব! আপনার কাজকর্ম বড় বিস্ময়কর। যখন মর্জি এসে হাজির। দুনিয়ার নিয়ম হলো, কেউ কাউকে সাজা দিলে প্রথমে তাকে বার্তা দেয় যে, অমুক সময় তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে, সে জন্যে প্রস্তুত থেকো। আর আপনি কোনো প্রকার বার্তা পাঠানো ছাড়াই চলে আসেন। হযরত আযরাঈল আ. উত্তর দেন- 'আরে ভাই! আমি তো এত বেশি বার্তা পাঠাই যে, দুনিয়ার কেউই তা দেয় না। কিন্তু এর কী সমাধান যে, কেউ তা শোনেই না। তুমি জানো না, যখন জ্বর আসে, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন মাথা ব্যথা হয়, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন বার্ধক্য আসে, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন চুল পাকে, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন মানুষের নাতি হয়, তাও হয় আমার পাঠানো বার্তা। আমি তো অবিরাম বার্তা পাঠাতে থাকি। তোমরা তো শোনো না, সে ভিন্ন কথা। সমস্ত রোগ-ব্যাধিই আল্লাহ তা'আলার পাঠানো সতর্কবার্তা যে, দেখো! তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

অর্থাৎ, আখেরাতে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, আমি কি তোমাদেরকে এতোটুকু হায়াত দেইনি, যার মধ্যে কোনো নসীহত গ্রহণকারী নসীহত গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারতো। উপরন্তু তোমাদের কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী এসেছে।[১]

আগত এ 'নাযীর' তথা 'ভীতি প্রদর্শনকারী' কে? এর তাফসীরে কতক মুফাসসির বলেন যে, এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. সূরা ফাতির, আয়াত ৩৭

ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। তিনি মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে।

কতক মুফাসসির বলেন যে, এ আয়াতে 'নাযীর' দ্বারা পাকা চুল উদ্দেশ্য। যখন মাথার বা দাড়ির চুল পেকে যায়, এটা মানুষের জন্যে 'নাযীর' তথা ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে ভীতি প্রদর্শন করতে এসেছে যে, সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তৈরী হও।

কতক তাফসীরকারক লিখেছেন, 'নাযীর' দ্বারা উদ্দেশ্য নাতি। যখন কারো ঘরে নাতি জন্ম হয়, তখন সে নাতি ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে থাকে যে, সময় ঘনিয়ে এসেছে, তৈরী হয়ে যাও। এক আরব কবি এ বিষয়টিকেই তার কবিতায় উপস্থাপন করেছেন-

إِذَا الرِّجَالُ وَلَدَتْ أَوْلَادُهَا
وَبَلِيَتْ مِنْ كِبَرٍ أَجْسَادُهَا
وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَعْتَادُهَا
تِلْكَ زُرُوْعٌ قَدْ دَنَا حِصَادُهَا

'যখন মানুষের নাতির জন্ম হয়।
বার্ধক্যের কারণে দেহ নির্জীব হয়ে যায়।
একের পর এক রোগ দেখা দিতে থাকে।
এক রোগ গেলে আরেক রোগ আসে।
তাহলে বুঝে নাও যে,
এ শস্য কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

মোটকথা, এ সবই আল্লাহ তা'আলার পাঠানো বার্তা। যদিও আল্লাহর সাধারণ নিয়ম হলো, তিনি বার্তা পাঠিয়ে থাকেন, কিন্তু কতক সময় বিনা নোটিশে অকস্মাৎ মৃত্যু চলে আসে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন- তুমি কি এমন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছো, যা বিনা নোটিশে ও অকস্মাৎ চলে আসবে। জানা তো নেই, কয়টা শ্বাস আর অবশিষ্ট আছে। তার প্রতীক্ষা কেন করছো?

দাজ্জালের প্রতীক্ষায় আছো কি?

তারপর বলেন-

أَوِ الدَّجَّالَ

'না কি দাজ্জালের প্রতীক্ষায় আছো?'

তুমি চিন্তা করছো যে, বর্তমান যুগ তো নেক আমলের অনুকূল নয়! তাহলে কি দাজ্জালের যুগ অনুকূল হবে? দাজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করবে, সেই ফেতনার যুগে কি তুমি নেক আমল করতে পারবে? আল্লাহ ভালো জানেন, তখন কী অবস্থা হবে। গোমরাহীর কতো কারণ ও উপকরণ দেখা দিবে। তাহলে কি তুমি সেই সময়ের অপেক্ষায় আছো?

فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ

'দাজ্জাল হবে অদেখা জিনিসসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম জিনিস, যার প্রতীক্ষা করা হচ্ছে।'

অতএব তার আত্মপ্রকাশের আগেই নেক আমল করে নাও!

কিয়ামতের প্রতীক্ষায় আছো কি?

সবশেষে বলেন-

أَوِ السَّاعَةَ، فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَأَمَرُّ

নাকি তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষায় আছো! তাহলে শুনে রাখো! কিয়ামত যখন আসবে, তা এতই বিপজ্জনক হবে, যার কোনো প্রতিকার মানুষের কাছে থাকবে না। তাই তা আসার পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

পুরো হাদীসের সারকথা হলো- কোনো নেক আমল বিলম্বিত করো না। আজকের নেক আমল কালকের জন্যে রেখে দিও না। বরং নেক আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হলে সাথে সাথে তার উপর আমল করো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নফল ইবাদতের গুরুত্ব*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত

পূর্বের অধ্যায়ে গোনাহের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ! এ বিষয়ে প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়টি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ফযীলত সম্বলিত। এটি একটি শুভ লক্ষণ যে, আজ যিলহজ মাসের প্রথম তারিখে এ অধ্যায়ের আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে। যিলহজ মাসের প্রথম দশককে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য দিনের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'রমাযানের পর কোনো দিন এমন নেই, যার মধ্যে ইবাদত করা আল্লাহ তা'আলার নিকট এত অধিক পছন্দনীয়, যতো পছন্দনীয় যিলহজ মাসের প্রথম দশকের ইবাদত।'

তারপর তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে-

'এর এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এক রাতের ইবাদত (সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে) শবে কদরের ইবাদতের সমান।'[১]

---

* ইসলাহী মাওয়ায়েয, খণ্ডঃ ২, পৃ. ২৩-৪৬

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬৮৯, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৮

হাদীসের শব্দ ব্যাপক, তাই উলামায়ে কেরাম বলেন- এ দিনগুলোতে যে কোনো ইবাদতই অধিক পরিমাণে সম্পাদন করা হবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাতেই উপরোক্ত সওয়াবের আশা রয়েছে।

ইবাদত ঃ মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য

পূর্বের বয়ানগুলোতে দু'টি বিষয়ে আমি অধিক জোর দিয়ে এসেছি।

এক. নফল ইবাদতের তুলনায় গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্নবান হওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিদিনের গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি প্রত্যেকেরই অধিক পরিমাণে যত্নশীল হওয়া উচিত।

দুই. হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ, মানুষ হুকুকুল ইবাদকে দ্বীনের বাইরের বিষয় মনে করে।

আমি বারবার তুলে ধরেছি যে, দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছে-

১. আক্বায়েদ তথা বিশ্বাস্য বিষয়
২. ইবাদত তথা বন্দেগী
৩. মু'আমালাত তথা লেনদেন, আয়-রোজগার
৪. মু'আশারাত তথা সমাজ-সামাজিকতা
৫. আখলাকিয়াত তথা অভ্যন্তরীণ চরিত্র

বর্তমান যুগে মানুষ আকীদা ও ইবাদতের মধ্যে দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি শাখাকে দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বাইরের মনে করে থাকে। এসব বিষয়ে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে গোনাহ বলেই মনে করে না। অথচ বান্দার হকের বিষয়টি এতই জটিল যে, হকদার মাফ না করা পর্যন্ত শুধু তাওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা সে গোনাহ মাফ হয় না। তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইবাদতের মৌলিক কোনো গুরুত্ব নেই। বরং আল্লাহ তা'আলার যে কোনো প্রকারের ইবাদতই মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

'আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।'[১]

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

ফেরেশতা ও মানুষের ইবাদতের পার্থক্য

মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাগণ যদিও ইবাদত করতো, তবুও আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র নিজের ইবাদতের জন্যে মানুষকে এ কারণে সৃষ্টি করেন যে, ফেরেশতাদের ইবাদত মূলত তাদের কোনো যোগ্যতার কারণে নয়। কেননা, তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অবৈধ কোনো চাহিদাই নেই। তারা গোনাহ করতে চাইলেও সে যোগ্যতা তাদের মধ্যে নেই। তাদের ক্ষুৎ-পিপাসা নেই। তন্দ্রা-নিদ্রা নেই। অন্য কোনো জৈবিক চাহিদাও তাদের অন্তরে জাগ্রত হয় না। তাদেরকে যে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে, তাতেই তারা নিমগ্ন থাকে। মানুষ এর বিপরীত। মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন- আমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, যার মধ্যে সব ধরনের চাহিদা থাকবে। ভালো কাজের চাহিদা থাকবে, থাকবে মন্দ কাজের চাহিদাও। ক্ষুধা ও পিপাসা থাকবে, থাকবে জৈবিক চাহিদাও। তবে এই মাখলুকের পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষতা এই যে, তারা যখন নিজেদের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার ইবাদত করবে, তখন তারা তোমাদের চেয়েও অগ্রগামী হবে। তোমরা যদিও সর্বদা তাসবীহ, তাকদীস ও ইবাদতে মগ্ন রয়েছো, কিন্তু মানুষ এমন হবে যে, তার চোখে ঘুমের প্রাবল্য থাকবে এবং আরামের বিছানা সুখকর নিদ্রার স্বাদ গ্রহণের জন্যে তাকে আহ্বান করতে থাকবে, এতদসত্ত্বেও যখন সে বিছানা ছেড়ে যিকির ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকবে, তখন তারা তোমাদেরকেও অতিক্রম করে যাবে। এদের সম্পর্কেই কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকে।'[১]

তাদের ভয় এ বিষয়ে যে, জানা নেই, আল্লাহর দরবারে এ আমল কবুল হলো কি না। আর আশা এ বিষয়ে যে, হয়তো আল্লাহ তা'আলা এ আমলের বরকতে আমার উপর দয়া করবেন।

---

১. সূরা সাজদাহ, আয়াত ১৬,

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ⑰ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑱

'তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত।'[১]

তাই আসল উদ্দেশ্য হলো, খাহেশাতের প্রতিমূর্তি এ মানুষ পরোয়ারদিগারের বন্দেগীর জন্যে প্রস্তুত হবে এবং অন্যান্য হুকুমও পালন করতে থাকবে। তাই কোনোভাবেই ইবাদতের গুরুত্বকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা যদি সঠিকভাবে ইবাদত করার তাওফীক দান করেন, তাহলে এ ইবাদত মানবজীবনের উদ্দেশ্যকেই শুধু পূর্ণতা দান করে না, বরং নফস ও শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা করতে মানুষকে শক্তিও যোগায়।

ইবাদত দুই প্রকার

এ পর্যায়ে এ বিষয়টিও বোঝা জরুরী যে, ইবাদত দুই প্রকার।

এক. ঐ সমস্ত ইবাদত, যেগুলো সম্পাদন করা জরুরী। যেমন, ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতসমূহ। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও এক পর্যায়ে এর অন্তর্ভুক্ত।

দুই. নফল ইবাদত। অর্থাৎ কেউ এসব ইবাদত করলে তো সওয়াব পাবে, কিন্তু না করলে কোনো গোনাহ হবে না।

এ অধ্যায়টি ইবাদতের এই দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা সম্বলিত। অর্থাৎ একজন মানুষের জন্যে তার নিয়মিত আমলের মধ্যে কিছু পরিমাণ নফল আমল শামিল করা দরকার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নিজের নিয়মিত আমলের মধ্যে নফলকে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া মানুষ নফস ও শয়তানের মোকাবেলায় পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন করতে পারে না।

নফল ইবাদত: আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের দাবি

আমাদের শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন- ফরয হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। যেগুলো পালন করা জরুরী। আর নফল হলো আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের দাবি। যখন কারো সাথে মহব্বত

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত ১৭-১৮

হয়, তখন মানুষ শুধু আইনের সর্ম্পকের উপর ক্ষান্ত করে না। বরং তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করে। যেমন, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। স্বামী যদি সে ক্ষেত্রে শুধু আইনী সম্পর্ক বজায় রাখে, যেমন মোহর দিলো, খোরপোশ দিলো, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যেভাবে জীবন-যাপন করে থাকে, সেভাবে জীবন-যাপন করলো না। তাহলে যদিও এ কাজটি আইনের চাহিদা পুরো করছে, কিন্তু মহব্বতের দাবি পুরো করছে না। যা আসল প্রয়োজন।

کچھ اور ہے درکار میری تشنہ لبی کو
ساقی سے میرا واسطہ جام نہیں ہے

'আমার তৃষ্ণা নিবারণে প্রয়োজন অন্য কিছু,
সাকীর সাথে আমার সম্পর্ক পেয়ালা কেন্দ্রিক নয়।'

এমনিভাবে এক ব্যক্তি শুধু ফরয ও ওয়াজিব আদায় করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার কেবল আইনানুগ সম্পর্ক হলো। কিন্তু এ সম্পর্ক নীরস ও শুষ্ক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের নিয়মিত আমলের মধ্যে নফলকেও শামিল করে, সে মহব্বতের দাবিও পুরো করছে।

অধিক পরিমাণে নফল ইবাদতকারী আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

'আমার বান্দা যতো বেশি নফল আদায় করে, ততো বেশি আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি একটি সময় এমন আসে যে, আমিই তার জিহ্বা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে কথা বলে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে পথ চলে।'[১]

অর্থাৎ, বান্দার জিহ্বায় সে কথাই উচ্চারিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলার প্রিয়। অপর এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'তোমরা যে ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করতে দেখবে, তার নৈকট্য লাভ করবে। (অর্থাৎ, তার সাহচর্য অবলম্বন করবে)

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬০২১

কারণ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার উপর হিকমতের কথা ঢেলে দেয়া হয়।'[১]

ইবাদতের আধিক্য প্রশংসনীয়

এ অধ্যায়ের প্রথম হাদীস বর্ণনাকারী হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.। তিনি বলেন-

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ قَوْمًا يَحْسَبُهُمُ النَّاسُ بِمَرْضٰى وَمَا هُمْ بِمَرْضٰى. قَالَ الْحَسَنُ: جَهَدَتْهُمُ الْبَلَاءُ.

'হযরত হাসান বসরী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন- 'আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের উপর তাঁর রহমত নাযিল করুন, যাদেরকে দেখে মানুষ মনে করে, তারা অসুস্থ। অথচ বাস্তবে তারা অসুস্থ নয়। হযরত হাসান বসরী রহ. এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন- ইবাদতের আধিক্য তাদের দেহের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে।'[২]

অপর এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

'আল্লাহ তা'আলার যিকির এত বেশি করো, যেন মানুষ তোমাদেরকে পাগল বলতে আরম্ভ করে।'[৩]

বর্তমান যুগে তিরস্কার করা হয় যে, মৌলবীদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। তারা দুনিয়ার ধন-দৌলত ও শান-শওকত ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাজ নিয়ে পড়ে আছে। এমতাবস্থায় মানুষের উচিত- এই তিরস্কারকে নিজেদের জন্যে খোশখবর মনে করা। কারণ, নবী কারীম

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৪৪৬

২. কিতাবুয যুহদ লিবনিল মুবারাক, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৯২, জামিউল আহাদীস, খণ্ডঃ ১৩, পৃ. ১২৪, হাদীস নং ১২৭২২, কানযুল উম্মাল, খণ্ডঃ ৬, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং ১৬৫৭১

৩. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১১২২৬

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও বন্দেগী করার কারণে যখন তোমাদেরকে পাগল বলতে আরম্ভ করা হয়, তখন এটা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার আলামত হয়ে থাকে। এ জন্যে এ সমস্ত তিরস্কারের কারণে ঘাবড়ানো উচিত নয়।

ইবাদতরত ব্যক্তির নিকট থেমে যাও!

হযরত কা'আব রাযি. একবার এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার পথে দেখেন যে, এক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি অল্প সময়ের জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে যান। দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত ও দু'আ শুনতে থাকেন। বাহ্যত ঐ ব্যক্তির নিকট দাঁড়ানোর কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিলো না। কারণ, সে তার ইবাদতে মগ্ন আছে, আর ইনি নিজের সফরে বের হয়েছেন। এখানে দাঁড়িয়ে সফরকে ব্যাহত করার কী প্রয়োজন? কিন্তু তিনি এ কথা চিন্তা করে থেমে যান যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল, তার নিকট অল্প সময়ের জন্যে দাঁড়িয়ে তার কথা শোনাও অনেক সময় মানুষের জন্যে কল্যাণকর হয়ে থাকে। জানা তো নেই, এ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কেমন মকবুল এবং তার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের ধারা কী পরিমাণ বর্ষিত হচ্ছে। অল্প সময়ের জন্যে আমিও যদি সেখানে দাঁড়িয়ে যাই, হতে পারে রহমতের সেই বৃষ্টির ছিটা-ফোঁটা আমার উপরও পড়বে। এ কথা শিক্ষা দেয়ার জন্যেই হযরত কা'আব রাযি. ঐ ব্যক্তির নিকট থেমে যান।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর একটি বাণী

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ (কুদ্দিসা সিররুহু) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন- আমি কোনো জায়গা অতিক্রমকালে সেখানে কারো ওয়ায-নসীহত হলে- নসীহতকারী ব্যক্তি যতো সাধারণই হোক না কেন- আমি অল্প সময়ের জন্যে অবশ্যই তার নিকট দাঁড়িয়ে যাই এবং এ নিয়তে তার কথা শুনি যে, হয়তো তার মুখ দিয়ে এমন কোনো কথা বের হবে, যা আমার অন্তরে প্রভাব ফেলবে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপকৃত করবেন। অনেক সময় এমনও হয় যে, একটি বাক্য মানুষের জীবনধারা পাল্টানোর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়।

একটি বাক্য জীবন পাল্টে দিলো

হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামা কা'নাবী রহ. উচ্চস্তরের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। সুনানে আবী দাউদে তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তার নাম শু'বা। পরবর্তীতে তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস হন। কিন্তু প্রথম জীবনের দিকে উচ্ছৃঙ্খল ও পাপাচারী ছিলেন। তিনি দেখলেন, একজন মুহাদ্দিস ঘোড়ায় আরোহণ করে আসছেন। আল্লাহ জানেন, তাঁর অন্তরে কী উদয় হলো যে, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন এবং অসৌজন্যমূলকভাবে বললেন- 'হে শায়খ! আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে দিন।'

তিনি বললেন- 'হাদীস শোনার তরীকা এটা নয়। অন্য কোনো সময় তা শোনো।'

শু'বা বললেন- না! আমি এখনই শুনবো। একটি হাদীস হলেও শোনান।

হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রহ.-এর অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হলো। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন, তার অবস্থার উপযোগী একটি হাদীস শুনিয়ে দেই। তখন তিনি এ হাদীসটি শোনালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

'যখন তোমার মধ্যে লজ্জা না থাকে, তখন যা ইচ্ছা তাই করো।'[১]

শু'বা বলেন- যখন এই হাদীস আমার কানে প্রবেশ করলো, তখন আমার অন্তরে এমন প্রভাব হলো যে, আমার মনে হলো, এ হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমারই জন্যে ইরশাদ করেছেন। অন্তরে এমন রেখাপাত করলো যে, বিগত জীবন থেকে তাওবা করার সংকল্প জাগলো। আমি তাওবা করলাম।

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৩২২৪, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪১৬৪, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৬৪৮৫, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, হাদীস নং ৩৩৯

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন সুউচ্চ মার্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন যে, এখন শু'বা ইবনে হাজ্জাজকে 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' বলা হয়। বোঝা গেলো, অনেক সময় একটি বাক্যই মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর নসীহত

এ জন্যে আমার ওয়ালেদ মাজেদ (কুদ্দিসা সিররুহু) এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এই নসীহতও করেন যে, যখন কেউ মৌলবী ও বক্তা হয়ে যায়, তখন সে চিন্তা করে যে, আমাকে তো ওয়াজ করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, ওয়াজ শোনার জন্যে নয়। এ কারণে সে কারো ওয়াজ শোনাকে নিজের জন্যে মানহানিকর মনে করে। তাই তোমরা মন থেকে এমন চিন্তা বের করে দাও। যেখানেই কোনো নেক কাজের কথা বলা হবে, যদি শোনার সুযোগ থাকে তাহলে এই নিয়তে তা শোনো যে, আল্লাহর রহমতে কোনো কথা আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং আমার জীবনের পরিবর্তনের কারণ হতে পারে।

বর্তমানে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া মুশকিল যে, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম (হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.) একজন সাধারণ বক্তার ওয়াজ এই নিয়তে শুনতেন যে, হয়তো কোনো নেক কথা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবে। এটাই সেই মাকাম, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস ও মাকবুল বান্দাদেরকে দান করেন।

মৃত্যু আসার পূর্বে ইবাদত করুন

মোটকথা, হযরত কা'আব রাযি. তার তিলাওয়াত ও দু'আ শুনে যখন সম্মুখে অগ্রসর হন, তখন বলেন–

'মুবারকবাদ সেসব লোককে, যারা নিজেদের জন্যে কিয়ামত দিবসের পূর্বেই কাঁদে। কারণ, আগে না কাঁদলে কিয়ামতের দিন কাঁদতে হবে, কিন্তু তা কোনো কাজে আসবে না।'[১]

---

১. কিতাবুয যুহদ লিবনিল মুবারাক, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩২, হাদীস নং ৯৬,

এ কথার মর্ম এই যে, যে বান্দা আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে নেক আমল করছে এবং মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর সামনে মোনাজাত করছে, সে ব্যক্তি সফলকাম।

কুরআনে হাকীমেও বারবার তাকিদ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় চলে আসার পূর্বে নেক আমল করো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠

'আমার দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করো, তোমার উপর মৃত্যু আসার আগেই। তখন তুমি বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে অবকাশ দিন, আমি পুনরায় দুনিয়ায় গিয়ে দান-খয়রাত করে এবং নেক আমল করে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'[১]

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

'যখন কারও নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।'[২]

তাই আগেই আল্লাহর সামনে কেঁদে কেঁদে তাওবা করলে এবং ইবাদতে মগ্ন হলে তা হবে প্রশংসাযোগ্য।

নফলের আধিক্য জান্নাতী ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করবে

এ অধ্যায়ের পরবর্তী হাদীস এই, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدَّرَجَةَ فِى الْجَنَّةِ فَوْقَ الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَرْفَعُ بَصَرَهُ، فَيَلْمَعُ لَهُ بَرْقٌ يَكَادُ وَيَخْطَفُ بَصَرَهُ؛ فَيَقُوْلُ: مَا هٰذَا؟ فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا نُوْرُ أَخِيْكَ، فَيَقُوْلُ: أَخِيْ فُلَانٌ؛ كُنَّا نَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا جَمِيْعًا

১. সূরা মুনাফিকূন, আয়াত ১০
২. সূরা মুনাফিকূন, আয়াত ১১

وَقَدْ فُضِّلَ عَلَيَّ هٰكَذَا. قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: اَنَّهُ كَانَ أَفْضَلُ مِنْكَ عَمَلًا، ثُمَّ يُجْعَلُ فِيْ قَلْبِهِ الرِّضَا حَتّٰى يَرْضٰى.

'জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মানুষের জন্যে যেসব স্তর রেখেছেন, সেগুলোর এক স্তর থেকে অন্য স্তরের মধ্যে আসমান-যমীনের দূরত্ব সমান ব্যবধান হবে। জান্নাতে এক ব্যক্তি নিজের স্তরে বসা থাকবে। সে উপরের দিকে তাকাবে। তার মনে হবে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। ফলে তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সে সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, এটা কী জিনিস? তাকে উত্তর দেয়া হবে- এটা তোমার অমুক ভাইয়ের নূর (যার স্তর তোমার উর্ধ্বে)। সে অবাক হয়ে বলবে, আমরা তো দুনিয়ায় এক সঙ্গে থাকতাম। আমাদের আমলও ছিলো একই রকম। তাহলে কী কারণে সে এত উচুঁ স্তরে পৌছে গেলো? তাকে উত্তর দেয়া হবে, তার আমল তোমার আমলের চেয়ে উত্তম ছিলো। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ মর্যাদা দান করেছেন। তারপর ঐ ব্যক্তির অন্তরে ঐ স্তরেই থাকার জন্যে সন্তুষ্টি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে সে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।'[১]

এ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, নিজের আমলকে মান ও পরিমাণ উভয় দিক থেকে উন্নত করা কাম্য। আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়া এ জন্যেই বানিয়েছেন, যেন মানুষ নেক আমলে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

'এবং প্রতিযোগীদের এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করা উচিত।'[২]

অর্থাৎ, তোমরা যে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে একে অপরের উপর অগ্রগামী হওয়ার চিন্তায় রয়েছো, এগুলো আসলে পরস্পরের প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। পরস্পরের উপর অগ্রগামী হওয়ার

---

১. কিতাবুয্ যুহদ, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩৩, হাদীস নং ১০০
২. সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত ২৬

প্রতিযোগিতা তো আখেরাতের বিষয়ে হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

'নিজের রবের মাগফিরাত ও সেই জান্নাতের দিকে দৌড়াও, যার প্রশস্ততা আসমান-যমীনের সমান।'[১]

হযরত মাসরুক রহ.-এর নফল ইবাদত

এ অধ্যায়ের পরবর্তী হাদীস একজন তাবেয়ীর অবস্থা সম্পর্কিত-

عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ قَالَتْ: مَا كَانَ مَسْرُوْقٌ يُوْجَدُ اِلَّا وَسَاقَاهُ قَدِانْتَفَخَتَا مِنْ طُوْلِ الصَّلَاةِ. قَالَتْ: اِنْ كُنْتُ لَاَجْلِسُ خَلْفَهٗ فَأَبْكِيْ رَحْمَةً لَهٗ.

'হযরত মাসরুক রহ.-এর স্ত্রী বলেন– আমি সারাজীবন দীর্ঘ নামাযের দরুন মাসরুকের পায়ের গোছা ফোলা অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলেন– রাতের বেলা যখন তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন আমি অনেক সময় তাঁর পিছনে বসে থাকতাম। তাঁর দাঁড়ানো দেখে আমার কান্না চলে আসতো।'[২]

হযরত মাসরুক ইবনে আজদা' রহ. কুফার বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস তাবেয়ীগণের অন্যতম। আরবী ভাষায় 'মাসরুক' শব্দের অর্থ- 'চুরিকৃত'। শিশুকালে একজন তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো। তাই তার উপাধি হয় 'মাসরুক'। পরবর্তীতে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার আসল নাম সবাই ভুলে যায়। তাঁর স্ত্রী তাঁর নফল ইবাদতের অধিক্যের প্রতি গুরুত্বরোপের এই চিত্র তুলে ধরেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর অধিক নফলের প্রতি গুরুত্বারোপ

এ অধ্যায়ের পরবর্তী হাদীস বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর নফলের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ সম্পর্কিত। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে। তিনি বলেন–

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩

২. কিতাবুয্ যুহদ, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৯৫

إِذَا هَدَأَتِ الْعُيُوْنُ قَامَ، فَسَمِعْتُ لَهُ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ حَتَّى يُصْبِحَ

'যখন মানুষ শোয়ার জন্যে বিছানায় চলে যেতো, তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমি তাঁর বিছানার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় তাঁর আওয়াজ শুনতে পেতাম। সারারাত এ আওয়াজ আসতো, অবশেষে ভোর হয়ে যেতো।' (যেন তিনি সারারাত আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকতেন।)[১]

বর্তমানে আমরা, আপনারা তাঁর বর্ণিত হাদীস ও ফিক্হ সম্পর্কে অবগত। তাঁকে 'আফকাহুস সাহাবা' তথা 'সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকতম ফকীহ' নামে স্মরণ করা হয়। তাঁর ফতওয়ার উপরেই হানাফী মাযহাবের ভিত্তি। কিন্তু তাঁর ইবাদত সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবগত। তিনি কুরআনের আয়াত تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ 'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকে'-এর বাস্তব নমুনা ছিলেন।

সারা জীবন ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। একবার তিনি এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এক বুড়ী তাঁর সম্পর্কে বললো- ইনি এমন ব্যক্তি, যিনি ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েন। বাস্তবে তখন ইমাম ছাহেব রহ. ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন না। কিন্তু ঐ বুড়ীর মুখে এ কথা শুনে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠলো। তিনি চিন্তা করলেন যে, আল্লাহর এ বান্দী আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে যে, আমি ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করি! সেদিন থেকেই তিনি সংকল্প করলেন, আমি ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়বো। তারপর সারাজীবন তিনি এ নিয়ম মেনে চলেন।[২]

---

১. কিতাবুয্ যুহদ, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩২, হাদীস নং ৯৭

২. আলখাইরাতুল হিসান ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফাতিন নু'মানঃ ৩৭

হযরত মুয়াযা আদবিয়া রহ.-এর নামায

এ কথাও মনে রাখবেন যে, নফলের প্রতি এমন গুরুত্বারোপ শুধু পুরুষদের মধ্যেই পাওয়া যায় না, বরং এ বিষয়ে নারীদেরও কীর্তি রয়েছে। হযরত মুয়াযা আদবিয়া রহ. তাবেয়ী মহিলা ছিলেন এবং উঁচুস্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর একটি উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে-

إِنِّيْ أَعْجَبُ مِنْ أَعْيُنٍ تَنَامُ عَلَى الْمَرْجِعِ وَتَعْلَمُ دُوْنَ رِكَابِهَا فِي الْقُبُوْرِ.

'ঐ চোখের উপর আমার বিস্ময় জাগে, যা রাতে ঘুমায়, অথচ তার জানা আছে যে, কবরে গিয়ে কেবলই ঘুমাতে হবে।'

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.-এর রোনাজারি

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.- যিনি উচ্চস্তরের একজন তাবেয়ী এবং হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর শাগরিদ। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয় যে, তিনি অত্যন্ত হাস্যরসিক ও প্রফুল্ল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর এক শাগরিদ বলেন- দিনের বেলায় তো আমরা তাঁর হাসির আওয়াজ শুনতাম, কিন্তু রাতের বেলায় শুনতাম কান্নার আওয়াজ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. বর্ণনা করেন– একবার রাতের বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন যে, তাঁর পবিত্র পা ফুলে তা থেকে রক্ত বের হতে থাকে। লোকেরা নিবেদন করলো- 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো আপনার আগে-পরের সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাহলে এত কষ্ট স্বীকার করছেন কেন?' তিনি বললেন– আমি কি আল্লাহ তা'আলার শোকরগুজার বান্দা হবো না?'[১]

তিনি যখন আমার সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন– তাই তার মহব্বতের দাবি হলো, আমিও বেশি বেশি মেহনত ও ইবাদত করবো।

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১০৬২, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৫০৪৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৭, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৬২৬, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৪০৯, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৭৪৮৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাযি. বলেন–

اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ.

'একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে হাজির হই। তিনি নামায পড়ছিলেন। তাঁর ভেতর থেকে পাতিল উতলানোর মতো আওয়াজ বের হচ্ছিল।'[১]

অর্থাৎ, নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে রোনাজারি করার কারণে এ ধরনের শব্দ বের হতো। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইযাম এ পদ্ধতি অনুসরণের পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছেন এবং এর উপর আমল করে উম্মতকে দেখিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামায

এ অধ্যায়ের পরবর্তী হাদীসটি দীর্ঘ। তাই আমি এর সারকথা তুলে ধরছি। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- 'আমি একবার রাতের বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়ি। তিনি যখন তাকবীর বললেন, তখন সাথে এ কথাগুলোও বললেন- ذُوْ الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ। তারপর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন। এক রাকাতে পুরো সুরায়ে বাকারা পাঠ করলেন। তারপর যেমন দীর্ঘ কেরাত পড়েছেন, তেমন দীর্ঘ রুকু করলেন। রুকুর মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পাঠ করতে থাকলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন। রুকুর সমান দীর্ঘ কওমা করলেন। তার মধ্যে لِرَبِّيَ الْحَمْدُ পড়তে থাকলেন। তারপর একই সমান দীর্ঘ সিজদাহ করলেন। তার মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়তে থাকলেন। তারপর জলসার মধ্যে সেজদার সমপরিমাণ দীর্ঘ সময় বসে থাকলেন। তাতে رَبِّ اغْفِرْلِيْ পড়তে থাকলেন। এভাবে তিনি এক রাকাত পুরা করলেন। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরান, তৃতীয় রাকাতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা মায়েদাহ পাঠ করলেন। অর্থাৎ চার রাকাত

---

১. সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১১৯৯, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৭৬৯, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৫৭২২, শামায়িলুত তিরমিযী, ২৩

নামাযে সোয়া ছয় পারা এমনভাবে তিলাওয়াত করেন যে, সেগুলোর রুকু, কওমা, সিজদাহ, জলসা ও কেরাত ইত্যাদি এক সমান দীর্ঘ ছিলো।[১]

এ হাদীসটি শুনে অনেক সময় মনে চিন্তা জাগে যে, এমন করা তো আমাদের সাধ্যের বাইরে। মনে রাখবেন– মুসলমানদের আত্মমর্যাদাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি এরূপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকেও মানুষ বানিয়ে পাঠিয়েছিলে। আমাদের মতো মানবীয় চাহিদা তাঁর মধ্যেও ছিলো। কিন্তু উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ ধামে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এত দীর্ঘ ইবাদত করতেন। আমরা সে ধামে পৌছতে না পারলে কিছু হলেও তো করবো।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এ হাদীসে রাতের নামাযের আদব বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়াম, কেরাত, রুকু, সিজদাহ ইত্যাদি লম্বা করতে হবে।

ইবাদতের মধ্যে কোন্ পদ্ধতি উত্তম?

এখন প্রশ্ন জাগে যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উদাহরণস্বরূপ এক ঘন্টা সময় পায়, সে এই সময়ের মধ্যে অধিক রাকাত নামায পড়বে, নাকি রাকাত কম করে কেরাত দীর্ঘ করবে। এর মধ্যে কোন্ পদ্ধতি বেশি উত্তম?

মনে রাখবেন, এ বিষয়ে ফয়সালা এই যে, নিজের নিয়মিত আমল পুরো করা জরুরী। এ কথা চিন্তা করবে না যে, এখনো অনেক সময় রয়েছে। তাই বেশি রাকাত নামায পড়ি। বরং কিয়াম, কেরাত ইত্যাদি দীর্ঘ করবে। তাহাজ্জুদ নামাযে লম্বা লম্বা সূরা পড়া অধিক উত্তম। কিন্তু যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে এক রাকাতেই ছোট দশ সূরা বা ততোধিক সূরা পাঠ করতে পারে। আবার এক রাকআতে একই আয়াত বা একই সূরা বারবার পাঠ করতে পারে।

হাদীস শরীফে আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত বারবার পাঠ করে সারারাত কাটিয়ে দেন। আয়াতটি এই-

---

১. সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১১৩৩, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৭৪০, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২২২৮৬, কিতাবুয্ যুহ্দ, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩৩, হাদীস নং ১০১

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝[১]

'(হে আল্লাহ!) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি মাফ করে দেন, তাহলে আপনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।'[২]

রুকু-সিজদাহও দাঁড়ানোর সমপরিমাণ দীর্ঘ করবে। রুকু ও সিজদাহ-র মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ও سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلٰى একটি পরিমাণ পাঠ করে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আ পড়াও জায়েয আছে। যেমন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।'[৩] পাঠ করলো।

এভাবে আট রাকআত পড়া- যদি তা উপরোক্ত নিয়মমাফিক হয়- অধিক রাকাত পড়ার চেয়ে উত্তম।

ইমামতির নামায হালকা করার নির্দেশ

অথচ সাধারণ নামায সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এত হালকা-পাতলা নামায পড়াতেন যে, দুর্বলতর ব্যক্তিরও কষ্ট অনুভূত হতো না। তিনি ইরশাদ করেন-

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ

'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ইমামতি করবে, সে যেন নিজের নামাযকে হালকা করে।'[৪]

---

১. সূরা মায়েদাহ, আয়াত ১১৮,

২. সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১০০০, সুনানু ইবান মাজাহ, হাদীস নং ১৩৫০

৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২০১

৪. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২১৯, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৮১৪, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৬৭৩, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭১৬২

কারণ, নামাযের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ সব ধরনের লোক থাকে। এখন যদি সূরা বাকারা পড়তে আরম্ভ করা হয়, তাহলে মানুষের কতো কষ্ট হবে! তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন–

إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ

'অনেক সময় নামায পড়া অবস্থায় আমি কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই, তখন আমি নামায হালকা করি, যেন তার মা অস্থির না হয়ে পড়ে।'[১]

সারকথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা নামায দীর্ঘ করতেন এবং ইমামতির নামায হালকা করতেন। আর এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের সামনে তো লম্বা-চওড়া নামায পড়া হয়, আর নির্জনে চেষ্টা করা হয় তাড়াতাড়ি শেষ করার।

তাহাজ্জুদের নামায একটি রাজত্ব

তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বলেন-

از آنکہ یافتم خبر از ملک نیم شب
من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم

'যখন থেকে আমি অর্ধ রাতের রাজত্ব (তাহাজ্জুদ)-এর
সন্ধান লাভ করেছি,
তখন থেকে আমি যবের একটি দানার বিনিময়েও
'নিমরোজে'র রাজত্ব ক্রয় করতে রাজি নই।'

সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর দৃষ্টিতে তাহাজ্জুদের স্বাদ

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন- আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাতের নামাযে যে স্বাদ ও ভাব দান করেছেন, দুনিয়ার বাদশারা যদি তা জানতো, তাহলে তারা খোলা তরবারী নিয়ে আমাদের সঙ্গে লড়তে আসতো এবং তা ছিনিয়ে নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতো। তারা তো এ স্বাদের ছোঁয়াও লাভ করেনি।

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীসনং ৯৭৯

তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত হওয়ার সহজতম পন্থা

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন- যাকে আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত বানান, সে তো আল্লাহর মেহেরবানীতে সে সময়ের বরকত লাভ করে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন দুর্বল লোকও রয়েছে, যারা এ নামাযে অভ্যস্ত নয়। রাতে ওঠা তাদের জন্যে কষ্ট মনে হয়। মন চাইলেও অভ্যাস না থাকার কারণে উঠতে পারে না। এমন ব্যক্তির দু'টি কাজ করা উচিত। এগুলোর বরকতে আল্লাহ তা'আলা হয় তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক দান করবেন, না হয় কিছু হলেও তার বরকত অবশ্যই দান করবেন।

এক. ইশার নামাযের পর সুন্নাত ও বেতেরের মাঝে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকাত নামায পড়বে।

দুই. সংকল্প করবে রাতের যে ভাগেই আমার চোখ খুলবে, অল্প সময়ের জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে যাবো।

কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে, যখন রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত দুনিয়ার উপর নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষক ডেকে ডেকে বলে- আছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। আছে কোনো রিযিকপ্রার্থী, আমি তাকে রিযিক দান করবো। আছে কোনো বিপদগ্রস্থ, আমি তার বিপদ দূর করে দেবো।[১]

সারারাত এভাবে আহবান করা হয়। আমি এই ঘোষকের আহ্বানে সাড়া দেবো- এ কথা চিন্তা করে- বিছানায় উঠে বসবে এবং চাইলে ওযু-নামায ছাড়াই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে দু'আ করবে। সাথে এ দু'আও করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। তারপর ঘুমিয়ে পড়বে।

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৮৪৬, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১২৬১, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৪০৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১১২০, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৩৫৬, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭১৯৬

কোনো ব্যক্তি যদি নিয়মিতভাবে এ আমল করতে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ সে তাহাজ্জুদের নামায থেকে মাহরূম থাকবে না। কোনো এক সময় তার তাওফীক লাভ হবেই। আর যদি তাওফীক লাভ না-ও হয় তবুও আল্লাহর রহমতের কাছে আশা আছে যে, তিনি তাকে তাহাজ্জুদের বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নামায

হাকীকত, আহাম্মিয়াত ও আদব

নামাযের গুরুত্ব*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

'নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি, তা সূরা মু'মিনূনের আয়াত। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ঈমানদারের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যাদের সঙ্গে সফলতার ওয়াদা করা হয়েছে। কারো যদি এসব গুণ লাভ হয়, তাহলে তার সফলতা লাভ হয়ে গেল। অর্থাৎ তার ইহজগতেও সফলতা লাভ হলো এবং পরজগতেও সফলতা লাভ হলো।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ১৯২-২০২,

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৪

'খুশু-খুযু'র অর্থ

আল্লাহ তা'আলা প্রথম গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, সফলতা অর্জনকারী মু'মিন বান্দা তারা, যারা নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বন করে। একজন ঈমানদারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায আদায় করা। এ কারণেই এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দার গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের 'খুশু'র কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণত নামাযের বিষয়ে দু'টি শব্দ ব্যাপক আকারে বলা হয়ে থাকে। একটি 'খুযু' অপরটি 'খুশু'। 'খুযু' অর্থ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দেয়া, আর 'খুশু' অর্থ, অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করা। নামাযের মধ্যে উভয়টিই কাম্য। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে 'খুযু'-ও থাকতে হবে এবং 'খুশু'-ও থাকতে হবে।

'খুযু'-র হাকীকত

'খুযু-র শাব্দিক অর্থ ঝুঁকে যাওয়া। অর্থাৎ নিজেকে নামাযের মধ্যে এভাবে দাঁড় করানো যে, নিজের সমস্ত অঙ্গ আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকানো থাকবে। উদাসীনতা ও অবহেলা থাকবে না। আল্লাহ তা'আলার সামনে আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন দেখার বিষয় হলো, নামাযের মধ্যে কীভাবে দাঁড়ানো আদব এবং কীভাবে দাঁড়ানো বেয়াদবী। আমরা বুদ্ধি দ্বারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এর বর্ণনা দিয়েছেন। তাই নামাযের যে পদ্ধতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক হবে, তা হবে আদব। আর যে পদ্ধতি তার পরিপন্থী হবে, তা হবে বেয়াদবি। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক নামায পড়া উচিত। একবার নামাযের পর সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

'তোমরা সেভাবে নামায পড়বে, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো।'[১]

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫, সুনানুদ দারিমী, হাদীস নং ১২২৫

তাই নামায পড়ার যে পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অবলম্বন করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সে পদ্ধতিই হলো আদব। অন্য কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে তার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে না।

হযরত খোলাফায়ে রাশেদীনের নামাযের শিক্ষা দান

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তা মনে রাখা, সংরক্ষণ করা, অন্যদের পর্যন্ত পৌছানো এবং নিজেদের নামাযকে সে অনুপাতে বানানোর প্রতি হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম গুরুত্বারোপ করতেন। হযরাতে খোলাফায়ে রাশেদীন হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি.- যাঁরা অর্ধেকের বেশি পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেছেন- তাঁরা যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষদেরকে বলতেন যে, নামায এভাবে পড়বে। নিজেরা নামায পড়ে বলতেন যে, আসো! আমি তোমাদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে নামায পড়তেন তা শিখিয়ে দেই। যেন তোমাদের নামায হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তাঁর শাগরিদদের বলতেন-

أَلَا أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

'আমি কি তোমাদেরকে সেভাবে নামায পড়ে দেখাবো না, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন।'[১]

তাই নামাযের মধ্যে 'খুযু'-ও কাম্য। নামাযের সবগুলো রুকন সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদিত হতে হবে। নামাযী ব্যক্তির বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্নাত মোতাবেক হওয়া 'খুশু' পর্যন্ত পৌছার প্রথম ধাপ। একজন মানুষ যখন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঠিক করবে। কিয়াম, রুকু, সিজদাহ ও বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তখন তা হবে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনকে নিবিষ্ট করার প্রথম ধাপ।

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১০৪৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৬৩৯

নামাযের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা উদয় হওয়ার একটি কারণ

বর্তমানে বেশির ভাগ লোক এই অভিযোগ করে থাকে যে, নামাযের মধ্যে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন চিন্তা উদয় হয়। নামাযে মন বসে না। এর বড় একটি কারণ এই যে, আমরা নামাযের বাহ্যিক দিককে সুন্নাত অনুপাতে গড়িনি এবং এর প্রতি যত্নও নেইনি। শিশুকালে যেভাবে নামায পড়া শিখেছিলাম ওভাবেই পড়ে আসছি। এ কথা চিন্তাও করিনি যে, বাস্তবে এ নামায সুন্নাত মোতাবেক হলো কি না। নামায এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফরয যে, ফিকহের কিতাবে এ সম্পর্কে শত শত পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। যার মধ্যে নামাযের এক একটি রুকন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাকবীরে তাহরীমার জন্যে হাত কীভাবে উঠাবে, কীভাবে দাঁড়াবে, কীভাবে রুকু করবে, কীভাবে সিজদাহ করবে, কীভাবে বসবে এসবগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কিতাবে রয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ম শেখার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আসছে, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। এ পর্যন্ত যেভাবে রুকু-সিজদাহ করে আসছে, সেভাবেই রুকু-সিজদাহ করে থাকে। সেগুলোকে সঠিক সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদন করার ফিকির নেই।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর নামাযের প্রতি গুরুত্ব

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. শেষজীবনে বলতেন, কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ পড়তে পড়াতে এবং ফতওয়া লিখতে লিখতে আমার ষাট বছর হয়ে গেলো, এগুলো ছাড়া আমার অন্য কোনো কাজ নেই। কিন্তু ষাট বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনো কোনো কোনো সময় নামাযের মধ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, বুঝতে পারি না, এখন আমি কী করবো? নামায বিষয়ক কিতাব খুলে দেখতে হয় যে, আমার নামায হয়েছে কি না? আমার তো এ অবস্থা। কিন্তু আমি মানুষকে দেখি যে, সারা জীবন নামায পড়ে চলছে, কিন্তু কখনো এ প্রশ্নই জাগে না যে, আমার নামায সুন্নাত মোতাবেক হয়েছে কি না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি মোতাবেক হয়েছে কি না? কখনো মনের মধ্যে এ প্রশ্নই উদয়

হয় না। এর কারণ এই যে, নামাযকে সুন্নাত মোতাবেক বানানোর গুরুত্বই আমাদের অন্তরে নেই। তাই সর্বপ্রথম নামাযকে সঠিক পদ্ধতিতে বানানোর প্রয়োজন রয়েছে।

দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি

এখন আমি সংক্ষেপে নামাযের সঠিক পদ্ধতি বলছি। এসব আয়াতের তাফসীর ইনশাআল্লাহ আগামী জুমাগুলোতে পেশ করবো। মানুষ যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে, তখন সুন্নাত হলো, তার পুরো দেহ কেবলামুখী হতে হবে। তাই যখন দাঁড়াবে, তখন সর্বপ্রথম কেবলামুখী হওয়ার প্রতিই গুরুত্বারোপ করবে। সিনা-ও কেবলামুখী হতে হবে। কোনো কারণে যদি অল্প সময়ের জন্যে সিনা কেবলার দিক থেকে সরে যায়, তাহলে নামায হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এ সমস্ত ছোট ছোট কারণে বলেন না যে, যাও! আমি তোমার নামায কবুল করলাম না। তাই নামায তো হয়ে যাবে, কিন্তু সে নামায দ্বারা সুন্নাতের নূর লাভ হবে না। সুন্নাতের বরকত লাভ হবে না। কারণ, এভাবে দাঁড়ানো সুন্নাতের পরিপন্থী। পায়ের আঙ্গুলগুলি যদি কেবলামুখী হয়ে যায় তাহলে দেহের সবগুলি অংশ কেবলামুখী হয়ে যাবে। এবার বলুন! মানুষ যদি এভাবে সুন্নাত মোতাবেক পা রাখে তাহলে এতে তার কী কষ্ট হবে? কোনো পেরেশানী হবে? কোনো রোগ-ব্যাধি হবে? কিছুই না, শুধু মনোযোগ দেয়ার ব্যাপার। যেহেতু মনোযোগ ও গুরুত্ব নেই, এ কারণে এ ভুলগুলো হয়। একটু মনোযোগ দিলেই সুন্নাত মোতাবেক দাঁড়ানো হবে। ফলে তার নামায 'খুযু'-র গণ্ডির মধ্যে চলে আসবে। ঐ নামায দ্বারা সুন্নাতের নূর ও বরকত লাভ হবে।

নিয়ত করার অর্থ

এখানে একটি মাসআলা পরিষ্কার করে দেই। তা হলো, মনের সংকল্পের নাম 'নিয়ত'। মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়। অনেক মানুষ নিয়তের বিশেষ শব্দমালা মুখে বলাকে জরুরী মনে করে। যেমন বলে- 'যোহরের চার রাকাত ফরয নামায কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।' মুখে এভাবে নিয়ত করাকে মানুষ ফরয-ওয়াজিব বানিয়ে নিয়েছে। যেন কেউ এ শব্দমালা

না বললে তার নামাযই হবে না। এমনও দেখা গেছে যে, ইমাম ছাহেব রুকুর মধ্যে আছে, আর সে ব্যক্তি নিয়তের শব্দমালা উচ্চারণে ব্যস্ত। এর ফলে তার রাকাতও ছুটে যায়। অথচ এসব শব্দ মুখে উচ্চারণ করা জরুরী বা ফরয-ওয়াজিব নয়। মনের মধ্যে যখন এই ইচ্ছা করবে যে, অমুক নামায ইমাম ছাহেবের পিছনে পড়ছি, তো এ ইচ্ছাই যথেষ্ট।

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোর পদ্ধতি

এমনিভাবে তাকবীরে তাহরীমার সময় যখন কান পর্যন্ত হাত ওঠায়, তখন সুন্নাত মোতাবেক উঠানোর প্রতি কোনো গুরুত্ব থাকে না। বরং যেভাবে ইচ্ছা হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করে দেয়। সুন্নাত তরিকা হলো, হাতের তালু কেবলার দিকে থাকবে। বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি বরাবর আসবে। এটা হলো সঠিক পদ্ধতি। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব পদ্ধতি রয়েছে- যেমন, কেউ কেউ হাতের তালু কানের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। কেউ আসমানের দিকে করে। এটি সুন্নাত তরিকা নয়। এভাবে হাত উঠিয়ে নামায শুরু করলে নামায তো হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নাতের বরকত ও নূর লাভ হবে না। শুধু মনোযোগ দেয়ার বিষয়। মনোযোগ দিলেই এ ফায়দা লাভ করতে পারে।

হাত বাঁধার সঠিক পদ্ধতি

হাত বাঁধার বিষয়টিও একই রকম, কেউ সিনার উপর বাঁধে। কেউ একেবারে নিচে নামিয়ে দেয়। কেউ কব্জির উপর হাত রেখে দেয়। এসব পদ্ধতি সুন্নাতের খেলাফ। সুন্নাত তরিকা হলো, নিজের ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কব্জি ধরবে, মাঝের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে এবং নাভির সামান্য নিচে হাত বাঁধবে। এটি হলো সুন্নাত তরিকা। এ অনুপাতে আমল করলে সুন্নাতের বরকতও লাভ হবে এবং নূরও লাভ হবে। আর যদি এরূপ না করে এমনিতে হাতের উপর হাত রেখে দেয়, তাহলে কোনো মুফতী বলবে না যে, নামায হয়নি। নামায হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নাত মোতাবেক হবে না। শুধু সামান্য মনোযোগ দেয়ার বিষয়।

কেরাতের সঠিক পদ্ধতি

হাত বাঁধার পর ছানা পড়বে। তারপর (আ'উযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে) সূরা ফাতিহা এবং আরেকটি সূরা পড়বে। একজন নামাযী এসব

কিছুই নামাযের মধ্যে পড়ে। কিন্তু পড়ে উর্দূর আঙ্গিকে। অর্থাৎ তার উচ্চারণ ও আঙ্গিক সুন্নাত মোতাবেক হয় না। কেরাত পড়ার যে পদ্ধতি, সে অনুপাতে হয় না। সঠিক পদ্ধতি হলো, কুরআনে কারীম তাজবীদসহ এবং তার প্রত্যেক হরফ সঠিক 'মাখরাজ' থেকে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে। মানুষ মনে করে যে, তাজবীদ ও কেরাত শিক্ষা করা খুব কঠিন কাজ। অথচ এগুলো শেখা কঠিন কিছু নয়। কারণ, কুরআন শরীফে যেসব হরফ ব্যবহার হয়েছে, তা মোট উনত্রিশটি। সেগুলোর বেশির ভাগ হরফ উর্দূতেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা খুবই সহজ। তবে আট দশটি হরফ এমন আছে, যেগুলোর অনুশীলন করতে হয়। যেমন, 'ث' কীভাবে উচ্চারণ করবে, 'ح' কীভাবে উচ্চারণ করবে, 'ض' ও 'ظ' এর মধ্যে পার্থক্য কী? কোনো মানুষ এ কয়েকটি মাত্র হরফকে যদি ভালো কোনো কারী ছাহেবের কাছে মশক করে। যেন 'ح' উচ্চারণ করার সময় যেন 'ہ' বের না হয়। কারণ, আমাদের দেশে 'ح' এবং 'ہ'-এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু আরবী ভাষায় উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অনেক সময় একটির জায়গায় আরেকটি পড়লে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু আমাদের এ বিষয়ে ফিকির নেই, তাই সেদিকে মনোযোগ দেয়া হয় না।

সারকথা

নিজের মহল্লার মসজিদের ইমাম ছাহেব বা কারী ছাহেবের নিকট গিয়ে কয়েকদিন অনুশীলন করলে ইনশাআল্লাহ সবগুলো হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণ হবে এবং নামায সুন্নাত মোতাবেক হবে। আজকে নামাযে দাঁড়ানো থেকে নিয়ে সূরায়ে ফাতিহা পর্যন্তের এ কয়টি কথা আলোচনা করলাম। ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে অবশিষ্ট কথা আগামী জুমায় আলোচনা করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নামায একটি বিনয়সিক্ত ইবাদত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

'নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায়কারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। এর বাইরে যে অন্বেষণ করবে, তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।'[১]

গত জুমায় আমি এ আয়াতসমূহের তাফসীরে নিবেদন করেছিলাম যে, নামাযের মধ্যে 'খুযু' ও 'খুশু' উভয়টিই কাম্য। 'খুযু'-র সম্পর্ক

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ২৩৯-২৫০

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৭

মানুষের বাহ্যিক অঙ্গের সঙ্গে। আর 'খুশু'র সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সঙ্গে। 'খুযু'র অর্থ হলো, নামাযের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে থাকবে, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। এ বিষয়ে আমি নামাযের বিভিন্ন রুকনের অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের সামনে বয়ান করেছি। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো, দাঁড়ানো, রুকু করা, কওমা করা, সিজদাহ করা এবং জলসা করার পদ্ধতি আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আরো দু'-তিনটি কথা রয়েছে। সেগুলো আলোচনা করার পর 'খুশু'র অর্থ এবং তা অর্জন করার পদ্ধতি আলোচনা করবো।

রুকু ও সিজদার মধ্যে হাতের আঙ্গুলের অবস্থান

রুকুর মধ্যে হাতের আঙ্গুল খোলা থাকবে। আঙ্গুল দ্বারা হাঁটু ধরতে হবে। আর সিজদাবস্থায় হাতের আঙ্গুল বন্ধ থাকা সুন্নাত। হাত এমনভাবে মাটিতে রাখবে, যেন চেহারা হাতের মাঝ বরাবর, হাতের তালু কাঁধের নিকট, বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর এবং কনুই পাঁজর থেকে পৃথক থাকে। পাঁজরের সঙ্গে মিলে না থাকে।

'আত্তাহিয়্যাতু'র মধ্যে বসার পদ্ধতি

'আত্তাহিয়্যাতু'র জন্যে যখন বসবে, তখন ডান পা খাড়া থাকবে। আঙ্গুলি কেবলামুখী থাকবে। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। হাতের আঙ্গুলি রানের উপর এভাবে রাখবে, যেন তার শেষ প্রান্ত হাঁটুর উপর থাকে। আঙ্গুলকে হাঁটুর নিচে ঝুলিয়ে দেয়া ভালো নয়।

সালাম ফেরানোর পদ্ধতি

সালাম ফেরানোর সঠিক পদ্ধতি এই যে, যখন ডানদিকে সালাম ফেরাবে, তখন পুরো ঘাড় ডানদিকে ঘুরিয়ে দিবে। নিজের কাঁধের উপর দৃষ্টি দিবে। বামদিকে সালাম ফেরানোর সময় পুরো ঘাড় বামদিকে ফিরিয়ে দিবে। তখন বাম কাঁধের উপর দৃষ্টি দিবে। এগুলো ছোট ছোট কয়েকটি বিষয়। এগুলোর প্রতি যদি খেয়াল রাখা হয় তাহলে নামায সুন্নাত মোতাবেক হয়ে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের নূর লাভ হবে। তার বরকত লাভ হবে। এর মাধ্যমে

নামাযের মধ্যে 'খুশু' অর্জনেও সহযোগিতা লাভ হবে। এগুলোর জন্যে অধিক সময়ও লাগে না এবং বেশি পরিশ্রমও করতে হয় না। পয়সাও খরচ হয় না। অথচ এর ফলে নামায সুন্নাত মোতাবেক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

'খুশু'র হাকীকত

দ্বিতীয় যে বিষয়ের আলোচনা আজকে করবো তা হলো 'খুশু'। 'খুশু'-র অর্থ হলো, অন্তর আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যাওয়া। অর্থাৎ মানুষের অন্তর আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হওয়া। এ কথা অনুভব করা যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এর সর্বোচ্চ পর্যায় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তোমরা এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেমন কিনা তোমরা আল্লাহকে দেখছো। আর যদি এরূপ চিন্তা করা সম্ভব না হয় তাহলে কমপক্ষে এই চিন্তা করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।[১]

এটা হলো 'খুশু'-র সর্বোচ্চ স্তর।

অস্তিত্ব বিশ্বাস করার জন্যে দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরী নয়

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, আমরা তো আল্লাহ তা'আলাকে দেখছিনা এবং এটাও দেখছিনা যে, তিনি আমাদেরকে দেখছেন। তাই এরূপ চিন্তা কীভাবে করবো? এর উত্তর এই যে, এ দুনিয়ায় সবকিছু চোখে দেখে জানা যায় না। অনেক জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলো মানুষ নিজ চোখে দেখে না কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্তরে এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, যেন সে নিজ চোখে তা দেখেছে। যেমন, এ মাইকের মাধ্যমে আমার আওয়াজ মসজিদের বাইরেও যাচ্ছে। মসজিদের বাইরে যেসব লোক রয়েছেন, তারা আমাকে দেখছেন না, কিন্তু আমার আওয়াজ শুনে তারা

---

১. সহীহুল বুখারী হাদীস নং ৪৮, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩৫, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯০৪, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪০৭৫

এ কথা নিশ্চিত বিশ্বাস করছে যে, আমি মসজিদের মধ্যে রয়েছি। তাদের বিশ্বাস সেই পর্যায়েই রয়েছে, চোখে দেখলে যেই পর্যায়ের হয়ে থাকে। তাই না দেখে শুধু আওয়াজ শোনার মাধ্যমেও কোনো মানুষের অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ হচ্ছে। কেউ যদি বলে- তুমি বক্তাকে নিজ চোখে না দেখা সত্ত্বেও তার অস্তিত্বের বিশ্বাস কি করে করলে? তখন সে উত্তর দিবে যে, আমি নিজ কানে তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সে উপস্থিত রয়েছে।

বিমানের দৃষ্টান্ত

আপনারা সকাল-সন্ধ্যা বিমান উড়তে দেখেন। বিমানে উপবিষ্ট কোনো মানুষ চোখে পড়ে না। চালককেও দেখা যায় না। কিন্তু আপনারা শতভাগ বিশ্বাস করেন যে, বিমানে মানুষ বসা আছে এবং কোনো পাইলট তা চালাচ্ছে। অথচ সেই পাইলট এবং বিমানে উপবিষ্ট লোকদেরকে আপনারা চোখে দেখেননি। কারণ, চালক ছাড়া বিমান চলে না। আর এটা সম্ভবও নয় যে, বিমান চলছে আর তার মধ্যে চালক থাকবে না। কেউ যদি আপনাকে বলে যে, এ বিমানটি চালক ছাড়া নিজে নিজেই বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনি তাকে নির্বোধ বলবেন।[১]

আলো সূর্যের প্রমাণ বহন করে

মসজিদের বাইরে থেকে ভিতরে আলো আসছে। কিন্তু সূর্য দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেক মানুষের শতভাগ বিশ্বাস থাকে যে, এ আলোর পিছনে সূর্য রয়েছে। অথচ সূর্য চোখে দেখা যাচ্ছে না। তাই আলো দেখে যেভাবে সূর্য বোঝা যায়, বিমান দেখে যেভাবে তার চালক বোঝা যায়, একইভাবে বিস্তৃত এ জগৎ, পাহাড়, জঙ্গল, বাতাস, পানি, সমুদ্র, নদী, মাটি, আবহাওয়া এ সবকিছুই একজন স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে।

---

১. এ কথা যথাস্থানে ঠিক আছে। তবে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে এখন এমন বিমান আবিষ্কার করা হয়েছে, যা চালক ছাড়া আকাশে ওড়ে। তবে পৃথিবীতে থেকে মানুষ তা কন্ট্রোল করে থাকে। যে চালকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। হযরত সাধারণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। –সংকলক

প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ

মানুষ যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন চিন্তা করবে যে, আমার সামনে যতো জিনিস আছে, সবই আল্লাহ তা'আলার সত্তার ইঙ্গিত বহন করে। এই যে আলো- যা চোখে দেখা যাচ্ছে- এর পিছনে সূর্য রয়েছে। কিন্তু সূর্যের পিছনে কে রয়েছে? সূর্য কে সৃষ্টি করেছেন? তার মধ্যে আলো কে দিয়েছেন? এ সবকিছু আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর স্রষ্টা হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। তাই নামাযের মধ্যে মানুষ এ কথা চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা যে আমার সামনে আছেন তা এমন নিশ্চিত, যেমন কিনা আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখছি। এই চিন্তা অন্তরে বদ্ধমূল করে নামায পড়ে দেখো, কেমন ভাবের সৃষ্টি হয়! আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এ ভাব দান করুন। আমীন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'এমনভাবে নামায পড়ো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। যদি তুমি আল্লাহকে দেখছো না, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।'

প্রথম ধাপ: শব্দের প্রতি মনোযোগ দেয়া

নামায পড়ার এটি সর্বোচ্চ পর্যায়। সর্বোচ্চ এ পর্যায়ে পৌছার জন্যে প্রাথমিক কিছু ধাপ রয়েছে। এ ধাপগুলো যদি মানুষ অতিক্রম করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সর্বোচ্চ ধাপে পৌছে দেন। সে ধাপগুলো কী? হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন যে, এর প্রথম ধাপ হলো- নামাযের মধ্যে যেসব শব্দ মুখে উচ্চারণ করা হয় তার দিকে মনোযোগ দেয়া। যেমন, আপনি মুখে বলছেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝। তখন আপনার জানা থাকতে হবে যে, আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝। উচ্চারণ করছি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের নামাযের অবস্থা এই হয়েছে যে, 'আল্লাহু আকবার' বলে নিয়ত বাঁধলে একটি সুইচ অন হয়ে গেলো, আর মেশিন চলতে আরম্ভ করলো। যেহেতু নামায পড়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই মুখ দ্বারা শব্দমালা আপনা-আপনি বের হতে থাকে। মেশিন চলছে। এমনকি কতক সময় এ কথাও মনে থাকে না যে, প্রথম রাকাতে কোন্ সূরা পড়েছিলাম এবং দ্বিতীয় রাকাতে কোন্ সূরা পড়েছিলাম। বেশিরভাগ সময় এ অবস্থা হয়ে থাকে।

'খুশু'র প্রথম ধাপ

যদি 'খুশু' অর্জন করতে চাও তাহলে মুখে যে শব্দ উচ্চারণ করছো তার দিকে মনোযোগ দাও। মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, অদেখা জিনিসের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রথম প্রথম কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু হযরত থানভী রহ. বলেন- 'খুশু' অর্জন করার প্রথম ধাপ হলো, শব্দমালার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো।

দ্বিতীয় ধাপঃ অর্থের প্রতি মনোযোগ আরোপ করা

দ্বিতীয় ধাপ হলো, ঐ সমস্ত শব্দের অর্থের প্রতি মনোযোগ আরোপ করা। মুখ দিয়ে যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ উচ্চারণ করলে, তখন তার অর্থের দিকে মনোযোগ দাও যে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক এবং এ কথা চিন্তা করো যে, এ শব্দের মাধ্যমে আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি। যখন উচ্চারণ করবে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝ তখন অন্তরে আল্লাহর রহমত-গুণের কথা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন 'রাহমান' তেমনই 'রাহীম'। যখন مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۝ উচ্চারণ করবে, তখন চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে কিয়ামতের দিনের মালিক স্বীকার করছি। যখন اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝ উচ্চারণ করবে, তখন তার অর্থের কথা চিন্তা করবে- হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। যখন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ বলবে, তখন অন্তরে এ কথা হাজির করবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছি- হে আল্লাহ! আমাকে সীরাতে মুস্তাকীম দান করুন। আর যখন صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ۝ বলবে, তখন চিন্তা করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে ঐসব লোকের পথ দেখান, যাদের উপর আপনার নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। ঐসব লোকের পথ আমি চাই না, যাদের উপর আপনার গজব অবতীর্ণ হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ জন্যে প্রথমে শব্দের প্রতি মনোযোগ দিবে, তারপর অর্থের প্রতি মনোযোগ আরোপ করবে। মোটকথা, নিজের পক্ষ থেকে নামাযের মধ্যে এ সব জিনিসের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবে। এ সবের প্রতি যখন মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে, তখন নামাযের মধ্যে যেসব চিন্তা উদয় হয়, সেগুলো দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নামাযের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা উদয় হওয়ার বড় কারণ

সাথে এ কথাও বলে দেই যে, নামাযের মধ্যে যে সব চিন্তা-ভাবনা উদয় হয়, তার বড় একটি কারণ এটাও যে, আমরা ভালোভাবে ওযু করি না। সুন্নাত মোতাবেক ওযু করি না। উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় গল্প-গুজবরত অবস্থায় ওযু করি। অথচ অযুর অন্যতম আদব হলো- ওযু করার সময় কথা না বলা। বরং ওযু করার মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দু'আসমূহ পাঠ করবে এবং ধীরস্থিরভাবে ওযু করে নামায শুরু হতে কিছু সময় বাকী থাকতেই মসজিদে আসবে। মসজিদে এসে প্রথমে সুন্নাত, তারপর নফল আদায় করবে। নামাযের পূর্বে যে সুন্নাত ও নফলের বিধান দেয়া হয়েছে, তা মূলত ফরয নামাযের ভূমিকা। যাতে করে ফরয নামাযের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার দিকে তার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং বিক্ষিপ্ত চিন্তা আসা বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্ত আদব পালন করে মানুষ যখন নামায পড়বে, তখন অন্যান্য চিন্তা আসবে না।

মনোযোগ বিচ্যুত হলে পুনরায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনো

কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক যেহেতু উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে, এ জন্যে এ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো চিন্তা চলে আসে, তাহলে এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধরবেন না। পুনরায় যখন সজাগ হবে, তখন আবারও এ সমস্ত শব্দের প্রতি মনোযোগ দিবে। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝ পড়া পর্যন্ত মনোযোগ ছিলো, কিন্তু مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۝ পড়ার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগ অন্যত্র চলে গেছে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ বলেছে, তখন স্মরণ হয়েছে যে, আমি তো অন্যত্র চলে গিয়েছি, তখন পুনরায় মনযোগকে ফিরিয়ে আনবে। এমনিভাবে যতোবার মনযোগের বিচ্যুতি ঘটবে, ততোবার ফিরিয়ে আনবে। অবিরাম এ কাজ করতে থাকবে।

'খুশু' অর্জন করার জন্যে অনুশীলন ও পরিশ্রম প্রয়োজন

মনে রাখবেন! এ দুনিয়ায় কোনো উদ্দেশ্যই মেহনত ও অনুশীলন ছাড়া লাভ হতে পারে না। প্রত্যেক কাজের জন্যেই অনুশীলন করতে হয়। একইভাবে 'খুশু' অর্জন করার জন্যেও কিছু মেহনত ও অনুশীলন করতে হয়। আর তা হলো এই সংকল্প করবে যে, যখন নামায পড়বো,

মুখে উচ্চারিত শব্দের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবো। মনোযোগ সরে গেলে পুনরায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনবো। আবারও বিচ্যুত হলে আবারও ফিরিয়ে আনবো। যতোবার বিচ্যুত হবে ততোবার ফিরিয়ে আনবো। এর উপর আমল করার ফল এই হবে যে, আজ মনোযোগ দশবার বিচ্যুত হয়ে থাকলে ইনশাআল্লাহ আগামীকাল বিচ্যুত হবে আটবার। তার পরের দিন ইনশাআল্লাহ ছয়বার বিচ্যুত হবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ আনুপাতিক হারে কমতে থাকবে। এ কথা চিন্তা করে ছেড়ে দেয়া যাবে না যে, এ কাজ আমার সাধ্যের বাইরে। আমার চেষ্টা বৃথা। বরং লেগে থাকবে। চেষ্টা করতে থাকবে। সারাজীবন চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ছাড়বে না। আল্লাহ তা'আলার রহমতে একদিন এমন আসবে, যখন আপনার বেশিরভাগ মনোযোগ নামায এবং তাতে পঠিত শব্দমালার দিকেই নিবদ্ধ থাকবে।

তৃতীয় ধাপ: আল্লাহ তা'আলার ধ্যান

এ ধাপ অর্জিত হলে তৃতীয় ধাপে পা রাখতে হবে। সেই তৃতীয় ধাপ হলো, নামাযের মধ্যে এ কথার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়েছি। যখন এ মনোযোগ লাভ হবে, তখন লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলো, ইনশাআল্লাহ। এই হলো, 'খুশু' অর্জন করার সারকথা। নিম্নের আয়াতে কুরআনে কারীম যার নির্দেশ দিয়েছে-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

যে সকল মু'মিন নিজেদের নামাযের মধ্যে 'খুশু' অর্জন করে তারা সফলকাম।[১]

অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে সফলতা দান করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমাদের নামাযের মধ্যে খুশু' সৃষ্টি করে দিন। আমাদের মনোযোগ জমিয়ে দিন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-২

নামাযের হেফাজত করুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿٤﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٧﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾

'নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মু'মিনগণ (১), যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত (২)। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে (৩)। যারা যাকাত আদায়কারী (৪)। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে (৫), নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না (৬)। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী (৭)।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৫, পৃ. ২৮৪-২৯৭

এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (৮)। এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে (৯)। এরাই হলো সেই ওয়ারিস (১০), যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে (১১)।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

এগুলো সূরায়ে মু'মিনূনের প্রথমদিকের আয়াত। বেশ কিছুদিন ধরে এর উপর বয়ান চলছে। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের পরিশুদ্ধি ও সফলতার জন্যে যে সমস্ত গুণ প্রয়োজন সেগুলোর আলোচনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এ সমস্ত গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান হয়েছে। আজ এ বিষয়ের শেষ বয়ান। মু'মিনদের গুণাবলী সম্পর্কিত শেষ আয়াত সংক্রান্ত এ বয়ান। আয়াতটি এই-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

অর্থাৎ, এরা এমন লোক, যারা নিজেদের নামাযের হেফাজত করে, এরাই জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হবে। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। জান্নাতুল ফেরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ ধাম।

এক নজরে সবগুলো গুণ

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে যে সমস্ত গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, মনে বসানোর জন্যে পরিশেষে পুনরায় একবার সেগুলোর উপর দৃষ্টি বুলাই। তিনি বলেছেন- ঐ সমস্ত মু'মিন সফলকাম, যাদের মধ্যে এসব গুণ রয়েছে-

১. তারা নিজেদের নামাযে 'খুশু' অবলম্বনকারী।

২. তারা অহেতুক, অসার ও অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে।

৩. তারা যাকাতের উপর আমল করে। এ সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, এর দু'টি অর্থ। একটি হলো- তারা যাকাত আদায় করে, যা তাদের উপর ফরয। দ্বিতীয় হলো, তারা নিজেদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে।

---

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-১১

৪. তারা নিজেদের চরিত্রকে মন্দ অভ্যাস থেকে পরিশুদ্ধ করে।

৫. তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী, স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতিরেকে।

আগের যুগে দাসী ছিলো। তাদের সাথে জৈবিক চাহিদা পুরো করা জায়েয ছিলো। এ আয়াতে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেদের জৈবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। শুধুমাত্র নিজেদের স্ত্রী বা আল্লাহ তা'আলা যেসব দাসীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হালাল করেছেন তাদের সঙ্গে এ সম্পর্ক রাখে। এরা তিরস্কৃত হবে না। তবে যারা এদের ছাড়া জৈবিক চাহিদা পূরণের অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণ করবে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা অপরাধী বলে গণ্য হবে।

৬. তারা নিজেদের আমানত রক্ষা করে। অর্থাৎ তাদের কাছে যে আমানত রাখা হয়েছে তার মধ্যে খিয়ানত করে না।

৭. তারা অঙ্গীকার পূরণকারী। কারো সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে না।

আলহামদুলিল্লাহ! এসব গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

প্রথম ও শেষ গুণের ঐক্য

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা অষ্টম গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

'ঐ সমস্ত মু'মিন কামিয়াব, যারা নিজেদের নামাযের হেফাজত করে।'

মুমিনদের সফলতা লাভের জন্যে কুরআনে কারীম এ আটটি গুণ বর্ণনা করেছে। এ সমস্ত গুণের আলোচনার সূচনাও করা হয়েছে নামায দিয়ে এবং সমাপ্তও করা হয়েছে তা দিয়েই। সর্বপ্রথম গুণ বর্ণনা করেছেন- যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বনকারী, আর শেষ গুণ বর্ণনা করেছেন- যে সমস্ত লোক নিজেদের নামাযের হেফাজতকারী। এ থেকে জানা গেল যে, মু'মিনের জন্যে সাফল্য লাভের সর্বাধিক

গুরুত্বপূর্ণ পন্থা নামায। নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বন করার অর্থ কী তা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

নিয়মিত নামায আদায় ও সময়ানুবর্তিতা

নামাযের হেফাজতের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তার একটি হলো, নিয়মিত নামায আদায় করা। অনিয়মিত হলে হবে না। কখনো পড়বে, কখনো ছাড়বে তা নয়। বরং নিয়মিত নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, নামাযের সময়ের প্রতি পরিপূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এ নামাযগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

'নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।'[১]

অর্থাৎ, নামায আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি ফরয, যার সময় তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, অমুক নামাযের সময় এতোটায় শুরু হয় এবং এতোটায় শেষ হয়। যেমন, ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদিক থেকে শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের আগে শেষ হয়। যোহরের সময় সূর্য ঢলার পর শুরু হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে শেষ হয়। আছরের সময় দ্বিগুণ ছায়া থেকে শুরু হয়। সূর্যাস্তের আগে শেষ হয়। এভাবে প্রত্যেক নামাযের একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। তাই শুধু নিয়মিত নামায পড়লে হবে না, বরং নামাযের সময়েরও অনুবর্তী হতে হবে। যথাসময়ে নামায পড়তে হবে।

এটি মুনাফিকের নামায

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- এটি মুনাফিকের নামায যে, আছরের নামাযের সময় হয়ে গেল আর সে উদাসীন হয়ে বসে থাকলো। অবশেষে যখন সূর্য দিগন্তে নেমে গেল (সূর্য যখন দিগন্তে নেমে যায় এবং এমন হলুদ বর্ণ ধারণ করে যে, বিনা কষ্টে তার দিকে তাকানো যায়, তখন আছরের নামায পড়া মাকরূহ।)

---

১. সূরা নিসা, আয়াত ১০৩

তখন সে উঠে দ্রুত চারটি ঠোকর মারলো এবং নামায শেষ করলো, এটি মুনাফিকের নামায।[১]

তাই নামায পড়াই শুধু বিষয় নয়। মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলাই সব নয়। বরং তার সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সঠিক সময়ে তা আদায় হয়। ফজর নামাযের সময় সূর্যোদয় হলে শেষ হয়ে যায়। এ জন্যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামায পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরী। এক ব্যক্তি উদাসীন হয়ে শুয়ে থাকলো, তারপর সূর্যোদয়ের পর উঠে নামায পড়লো। সে কাযা নামায পড়লো ঠিক, কিন্তু এতে নামাযের হেফাজত হলো না। কারণ, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যে সময় নামায পড়তে বলেছেন, সে সময় নামায আদায় করা হয়নি।

আল্লাহর আনুগত্যের নাম দ্বীন

আমি বারবার আপনাদেরকে বলে থাকি যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানার নাম হলো দ্বীন। সময়ের মধ্যে কোনো কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা যখন হুকুম দিয়েছেন, অমুক নামায অমুক সময়ের পূর্বে আদায় করো, তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করে ঐ সময়ের পূর্বে আদায় করা জরুরী। সূর্যোদয় হচ্ছে, এমন সময় কেউ নামায পড়ার নিয়ত করলো, এমন করা হারাম। তাই সময়ের মধ্যে নামায পড়া এবং সময়ের অনুবর্তী হওয়া নামাযের হেফাজতের অন্তর্ভুক্ত।

জামাতের সাথে নামায আদায় করুন

নামাযের হেফাজতের তৃতীয় বিষয় হলো, নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। পরিপূর্ণভাবে আদায় করার অর্থ হলো, পুরুষ হলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করা জরুরী। পুরুষের জন্যে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। বরং কতিপয় আলেম জামাতের সঙ্গে নামায পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। তবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট ওয়াজিবের

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৫০, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৫০৭, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১১৫৬১

নিকটবর্তী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কোনো পুরুষ যদি বাড়িতে একা নামায পড়ে তাহলে এটা অসম্পূর্ণভাবে নামায আদায় করা হলো। ফুকাহায়ে কেরাম একে 'আদায়ে কাসের' তথা 'অসম্পূর্ণ আদায়' বলে থাকেন। 'আদায়ে কামেল' তথা 'পরিপূর্ণ আদায়' হলো, মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করা। সওয়াব ও ফযীলতের দিক থেকেও জামাতের সাথে নামায আদায় করার মর্যাদা অধিক।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- একা নামায পড়ার তুলনায় জামাতের সাথে নামায পড়ায় সাতাইশ গুণ অধিক সওয়াব দেয়া হয়।[১]

মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে কয়েক মিনিট বেশি সময় ব্যয় হবে। এ কারণে এত বড় সওয়াব ছেড়ে দেয়া এবং অসম্পূর্ণভাবে নামায আদায় করা কতো বড় ক্ষতির কারণ। কাজেই পুরুষদের জন্যে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা জরুরী।

নামাযের প্রতীক্ষায় থাকার সওয়াব

আল্লাহ তা'আলা মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়েছেন। নামাযের প্রতীক্ষায় যে পরিমাণ সময় মসজিদে বসে থাকা হয়, আল্লাহ তা'আলা ঐ পরিমাণ সময়ের নামাযের সওয়াব দিয়ে থাকেন। যেমন, আপনারা এখন নামাযের প্রতীক্ষায় মসজিদে বসে আছেন। যতক্ষণ সময় আপনারা বসে আছেন, চুপচাপও যদি বসে থাকেন, কোনো কাজও যদি না করেন, নামাযও পড়লেন না, তিলাওয়াতও করলেন না, যিকিরও করলেন না, শুধুই বসে থাকলেন, তবুও যেহেতু নামাযের প্রতীক্ষায় বসে আছেন, তাই নামায পড়লে যে পরিমাণ সওয়াব হতো ঐ পরিমাণ সওয়াবই পাওয়া যাবে। এজন্যে কেউ যদি আগেই মসজিদে চলে যায়, তাহলে সে অনবরত নামাযের সওয়াব পেতে থাকবে এবং আমলনামায় নেকী বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মোটকথা, নামাযের হেফাজতের মধ্যে জামাতের সাথে নামায আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত।

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬০৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৯, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৮২৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৫০৮০, মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ২৬৪

তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে তিনি যখন মসজিদে নববীতে ইমামতি করতেন, তখন সকল সাহাবী তাঁর পিছনে জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। কিন্তু মুনাফিক কিসিমের কিছু লোক জামাতে নামায আদায় করতো না। তারা জামাতে হাজির হতো না। তারা ছিলো মুনাফিক, তাদের অন্তরে ঈমান ছিলো না, শুধু মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করতো, এ কারণে তারা বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে জামাতে আসতো না। তবে কোনো সাহাবীর ব্যাপারে এ কথা চিন্তাও করা যায় না যে, তিনি জামাতের নামায ত্যাগ করবেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে- 'আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের ইমামতির জন্যে অন্য কাউকে দাঁড় করাই এবং তাকে নামায আরম্ভ করতে বলি। তারপর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখি কারা বসে আছে। জামাতে আসেনি। যাদেরকে দেখবো, জামাতে আসেনি, আমার মন চায় তাদের বাড়িগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।'[১]

জামাতে নামায পড়ার ফায়দা

আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট ও ক্রোধ অনুমান করুন! মসজিদের মিনার থেকে ঘোষিত হচ্ছে-

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

'নামাযের দিকে আসো, কামিয়াবীর দিকে আসো।' আর এ ব্যক্তি ঘরে বসে আছে। এ ডাক তার কানে প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধ থেকে হেফাজত করুন। আমীন। আমরা যদি ঘরে বসে থাকি, জামাতে না আসি, তখন যেন এ হাদীসের কথা চিন্তা করি যে, এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন চাইবে আমাদের বাড়ি-ঘর

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ২২৪২, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪০, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২০১, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৮৩৯, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৬১, মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ২৬৬, সুনানুদ দারিমী, হাদীস নং ১১৮৬

আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিতে। আল্লাহ তা'আলা মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়েছেন। একে মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্র বানিয়েছেন। তারা এখানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। তাছাড়া এর আরেকটি ফায়দা এ-ও রয়েছে যে, যখন মুসলমানগণ পরস্পরে মিলিত হয়, তখন একে অপরের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হয়। একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। আরও অসংখ্য ফায়দা রয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো- আল্লাহর হুকুম পালন করতে মসজিদে আসো।

খ্রিস্টানদের অনুকরণ করবেন না

আমাদের সমাজে শুধু জুমার নামাযের জন্যে মসজিদে আসার যে সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে। সারা সপ্তাহে মসজিদে আসার কোনো চিন্তা মাথায় জাগে না। এর কারণ এই যে, আমরা ইসলামকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা করেছি। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা শুধু রবিবার দিন তাদের উপাসনালয়ে সমবেত হয়। বাকী দিনগুলোতে ছুটি। এখন তো রবিবারেও যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে দেখুন, গীর্জা বিরান হয়ে আছে। পাদ্রীরা বেকার বসে আছে। ইবাদতের জন্যে সেখানে কেউ আসেই না। মোটকথা, দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা রবিবারে গীর্জায় আসতো। আল্লাহ রক্ষা করুন, আমরাও মনে করেছি যে, শুধু জুমার দিন মসজিদে যেতে হবে। অথচ জুমার নামায যেমন ফরয, তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ফরয। জুমার দিন মসজিদে নামায আদায় করা যেভাবে জরুরী। একইভাবে অন্যান্য দিনেও মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা জরুরী। কারণ, জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিবের নিকটবর্তী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। মোটকথা, জামাতের সাথে মসজিদে নামায আদায় করা নামাযের হেফাজতের অন্তর্ভুক্ত।

মহিলারা আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করবে

মহিলাদের জন্যে হুকুম হলো, নামাযের সময় হওয়ার পর অবিলম্বে নামায আদায় করবে। মহিলারা এ ব্যাপারে খুবই ত্রুটি করে থাকে। নামাযকে পিছাতে থাকে। সময় যখন মাকরূহ হয়ে যায়, তখন নামায

পড়ে। তাদের জন্যে আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া উত্তম। আর পুরুষদের জন্যে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা জরুরী।

নামাযের গুরুত্ব লক্ষ্য করুন!

আল্লাহ তা'আলা সফলকাম বান্দাদের গুণাবলীর আলোচনা শুরুও করেছেন নামায দ্বারা, শেষও করেছেন নামায দ্বারা। এ কথা বোঝানোর জন্যে যে, একজন মু'মিনের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায। হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর যখন অর্ধেক পৃথিবীর অধিক ভূখণ্ডের উপর রাজত্ব ছিলো- বর্তমানে তো মানুষ ছোট ছোট রাজত্ব পেয়ে নিজেকে বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান আরো না জানি কী কী ভাবে। হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর খেলাফতকালে তাঁর অধীনে যে পরিমাণ ভূখণ্ড ছিলো, বর্তমানে তা প্রায় পনেরোটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। হযরত ওমর ফারূক রাযি. একাই এর পুরোটার শাসক ছিলেন। সে সময় তাঁর প্রশাসনের অধীনে যতো গভর্নর ছিলেন, তাদের নামে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তা 'মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকে'র মধ্যে রয়েছে। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

'মনে রেখো! তোমাদের সব কাজের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায। যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করলো এবং নিয়মিতভাবে নামায আদায় করলো, সে তার দ্বীনের হেফাজত করলো। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করলো সে অন্যান্য জিনিস আরো বেশি নষ্ট করবে।'[১]

জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী

এ কারণে কুরআনে কারীম এ সমস্ত গুণের বর্ণনা শুরুও করেছে নামায দ্বারা, শেষও করেছে নামায দ্বারা। যাদের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া যাবে-

---

১. মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ৫

১. নামাযের মধ্যে 'খুশু'
২. অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকা
৩. যাকাত দেয়া
৪. চরিত্র সংশোধন করা
৫. সতীত্ব রক্ষা করা
৬. আমানত ও অঙ্গীকার পুরা করা
৭. নামাযের হেফাজত করা

এসব গুণের উল্লেখ করে বলেন- এরাই হলো ঐ সব লোক, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হবে এবং চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এসমস্ত গুণ দান করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর অসীম রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নামায এবং ব্যক্তির পরিশুদ্ধি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

নামায সম্পর্কে এতোটুকু বিষয় তো সব মুসলমানই জানেন যে, এটি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। একটি মহিমান্বিত ইবাদত। দ্বীনের স্তম্ভ। একই সঙ্গে নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মানুষের ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্যে অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ

'অহীর মাধ্যমে আপনার উপর যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেয়।'[১]

এ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নামাযের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা মানুষকে সব ধরনের অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বাধা দিয়ে তার নৈতিক চরিত্রে পরিশুদ্ধি আনে। অনেক বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে এ আয়াতের মর্ম এই বোঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে বিশেষভাবে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যে, যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে, ধীরে ধীরে তার থেকে

---

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত ৪৫

গোনাহ ও বদ-অভ্যাস দূর হতে থাকবে। তবে শর্ত হলো, নামাযকে একটা বোঝা মনে করে মাথা থেকে নামিয়ে দিবে না, বরং নামায আদায় করাটা কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক 'ইকামতে সালাত' হতে হবে।

'ইকামতে সালাতে'র শাব্দিক অর্থ নামাযকে সোজা করা। যার মর্ম হলো, তার সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী আদব ঠিক সেভাবে আদায় করার চেষ্টা করা, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছেন। যেমন, প্রথমত নামাযের সমস্ত শর্ত, সুন্নাত ও আদবের সঠিক ইলম অর্জন করে সাধ্যমত তা পালন করার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণ 'খুযু-খুশু' সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যভুক্ত তা করে এভাবে নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো, যেন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলছে। এভাবে নামায কায়েমকারীগণের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনা আপনি নেক কাজ করার তাওফীক লাভ হয়। মন্দ কাজ থেকে বাঁচার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও মন্দ চরিত্র ও মন্দ আমলের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তার বোঝা উচিত যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

'যে ব্যক্তির নামায তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কর্ম থেকে বাধা দেয় না তার নামায কিছুই নয়।'[১]

বাস্তবে আদব ও শর্তসহ নামায আদায় করা হলে তা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নামাযী ব্যক্তির এক বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এ সম্পর্ক যার লাভ হয়েছে, ক্রমান্বয়ে তার অন্যান্য গোনাহ থেকে বিরত না থাকা সম্ভবই না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো হলো যে, সে রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে আর সকালে চুরি করে। তিনি বললেন- অতি সত্বর নামায তাকে চুরি থেকে বাধা দিবে। বাস্তবেই অল্প কিছুদিন পর সে ব্যক্তি চুরি থেকে তাওবা করে।[২]

---

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৪৫
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৪৬

আজকাল আমাদের কেউ কেউ বাহ্যিকভাবে নিয়মিত নামাযী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের গোনাহ ও পাপকাজে লিপ্ত থাকে। হাদীসের ভাষ্যমতে, তাদের নামাযে কোথাও ত্রুটি রয়েছে। ঐ ত্রুটি যদি দূর করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা মোতাবেক তাদের নামায অবশ্যই মন্দ কাজ থেকে বাধা দিবে। এভাবে এ ইবাদত তার নৈতিক পরিশুদ্ধির উৎকৃষ্টতম মাধ্যম হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে জাহেরী ও বাতেনী সমস্ত আদবসহ নামায আদায় করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার উৎকৃষ্টতম ফল লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এক নজরে নামাযের রুকনসমূহ*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ—যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

আমি সূরায়ে মু'মিনূনের প্রথম কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। দুই সপ্তাহ পূর্বে এর ব্যাখ্যামূলক আলোচনা শুরু করেছি। এ আয়াতগুলোতে

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ২০৪-২২০,

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৭

আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ঈমানদারের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যাদেরকে কুরআনে কারীম সফলকাম বলেছে। দুনিয়া-আখেরাতে যারা সফলতা লাভ করবে। এ আয়াতে বর্ণিত তাদের সর্বপ্রথম গুণ হলো, নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বন করা। ইরশাদ হয়েছে- সে সকল মু'মিন সফলকাম, যারা নিজেদের নামাযে 'খুশু' অবলম্বনকারী।

আমি পূর্বেও বলেছি যে, সাধারণত এ বিষয়ে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি 'খুশু', আর অপরটি হলো 'খুযু'। 'খুশু' অর্থ, মনকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করা। আর 'খুযু' অর্থ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দেয়া। গত জুমায় আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম যে, নামাযের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে রাখলে 'খুযু' লাভ হবে। তাকবীরে তাহরীমার পদ্ধতি, হাত বাঁধার সুন্নাত তরীকা ও কেরাতের সঠিক পদ্ধতি আরজ করেছিলাম।

দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকা

'কিয়াম' তথা নামাযে দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকা হলো, একদম সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকবে। সিজদার জায়গায় দৃষ্টি থাকার কারণে মানুষের শরীরের উপরের সামান্য অংশ সম্মুখপানে ঝুঁকানো থাকবে। এর অধিক ঝুঁকানো পছন্দনীয় নয়। কতক লোক নামাযের মধ্যে অনেক বেশি ঝুঁকে যায়। ফলে মেরুদণ্ড কিছুটা বেঁকে যায়। এটা সুন্নাতের পরিপন্থী, যা অপছন্দনীয়। তাই এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো উচিত, যেন মেরুদণ্ড বেঁকে না যায়। তবে মাথা কিছুটা ঝুঁকানো থাকবে, যাতে দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকে। এটা হলো দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকা।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকবে

নামাযে নিশ্চলভাবে দাঁড়াবে। নড়াচড়া করবে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ۝

'এবং আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো।'[১]

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮

অর্থাৎ 'আল্লাহর সামনে নামাযে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকো।' বেশিরভাগ মানুষ বিষয়টি লক্ষ্য করে না। নামাযে দাঁড়িয়ে নড়া-চড়া করতে থাকে। বিনা কারণে কখনো নিজের হাত নাড়ে, কখনো ঘাম মোছে, কখনো কাপড় ঠিক করে। কুরআনে কারীম আমাকে এবং আপনাকে যেই 'কুনুতের' নির্দেশ দিয়েছে, এসব কিছু তার পরিপন্থী।

তুমি 'আহ্কামুল হাকিমীনের' দরবারে দাঁড়িয়ে আছো

তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষ যখন দুনিয়ার সাধারণ কোনো শাসকের সামনেও দাঁড়ায় তখন আদব প্রদর্শন করে। বেয়াদবী করে না। উদাসীনভাবে দাঁড়ায় না। তা হলে যখন তুমি আহ্কামুল হাকেমীনের সামনে দাঁড়িয়েছো, তখন অবহেলা দেখানো, শিথিলভাবে দাঁড়ানো, অহেতুক হাত-পা নাড়ানো নামাযের আদবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুন্নাতের খেলাপ। ফুকাহায়ে কেরাম এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, কেউ যদি এক রুকনের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে তিনবার হাত নাড়ে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আমি পিছনের জুমাগুলোতে বর্ণনা করেছি।

রুকুর সুন্নাত তরীকা

কিয়ামের পর আসে রুকু। রুকুর মধ্যে মেরুদণ্ড সোজা রাখবে। অনেক লোক রুকুর মধ্যে মেরুদণ্ড পুরোপুরি সোজা রাখে না। এটি সুন্নাতের পরিপন্থী। বরং কতক ফকীহের নিকট এ কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যে মেরুদণ্ড পুরোপুরি সোজা রাখবে। হাতের আঙ্গুলি খুলে হাঁটু ধরবে। হাঁটু সোজা রাখবে। বাঁকা করবে না। শিথিল করবে না। সটান রাখবে। এটা হলো রুকুর সুন্নাত তরীকা। এই তরীকার মধ্যে যতো ত্রুটি হবে, সুন্নাত থেকে ততোই দূরে সরে যাবে এবং নামাযের নূর ও বরকত ততো হ্রাস পাবে।

'কওমা'-এর সুন্নাত তরীকা

রুকুর পর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে দাঁড়ানোকে 'কওমা' বলে। এই কওমার একটি সুন্নাত বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। তা হলো, কওমার মধ্যেও কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। পুরোপুরি না দাঁড়িয়েই সিজদায়

চলে যাওয়া উচিত নয়। একটি হাদীসে এক সাহাবী বর্ণনা করেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিলো যে, যতো সময় তিনি রুকুতে অবস্থান করতেন, ঐ পরিমাণ সময় কওমাতেও অবস্থান করতেন। উদাহরণস্বরূপ রুকুতে যদি পাঁচবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়তেন, তাহলে পাঁচবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়তে যে পরিমাণ সময় লাগতো প্রায় ঐ পরিমাণ সময় কওমাতেও কাটাতেন। তারপর সিজদায় গমন করতেন। আজ আমরা রুকু থেকে উঠতে উঠতে মুহূর্তের মধ্যে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে সাথে সাথে সিজদায় চলে যাই। এটি সুন্নাত তরীকা নয়।

'কওমা'র দু'আ

হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কওমার মধ্যে এই দু'আ পড়তেন-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

'হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা আপনার। এমন প্রশংসা, যা আসমান-জমিনকে পরিপূর্ণকারী, তার মধ্যবর্তী জায়গাকে পরিপূর্ণকারী এবং এরপর আরো যা কিছু আপনি চাইবেন তা পরিপূর্ণকারী।'[১]

কতক হাদীসে এই দু'আ এসেছে-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى

'হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা আপনার। এমন প্রশংসা, যা পরিমাণে অধিক, পবিত্র ও বরকতময়। এমন প্রশংসা, যেমন আমাদের রব চান এবং সন্তুষ্ট হন।'[২]

এতে জানা গেল যে, এই দু'আ পড়তে যে পরিমাণ সময় লাগে সেই পরিমাণ সময় তিনি কওমায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাই কওমার মধ্যে শুধু

---

১. সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৯৪, হাদীস নং ২৪৩৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খণ্ডঃ ২, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৯০৬, মুসনাদুত তয়ালেসী, খণ্ডঃ ১, পৃ. ২৩, হাদীস নং ১৫২

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭, , সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১০৫২

মাথা উঠিয়েই সিজদায় চলে যাওয়া ঠিক নয়। বরং কেউ যদি সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যায় তাহলে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো জরুরী।

এক ব্যক্তির নামাযের ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এমনভাবে নামায পড়লেন যে, রুকুতে গিয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন। রুকু থেকে দাঁড়িয়েই সিজদায় গেলেন। সিজদায় গিয়ে দ্রুত সিজদাহ করে উঠলেন। এভাবে তিনি দ্রুত রুকনগুলো আদায় করে নামায সম্পন্ন করলেন। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে সালাম আরজ করলেন। উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন- 'দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো! কারণ, তুমি নামায আদায় করোনি।' লোকটি উঠে গিয়ে পুনরায় নামায পড়লেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারও সেভাবেই পড়লেন, যেভাবে প্রথমবার পড়েছিলেন। কারণ, এভাবে পড়াই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। নামায পড়ার পর পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে সালাম আরজ করলেন। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন-

قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

'যাও! নামায পড়ো! কারণ, তুমি নামায পড়োনি।'

তৃতীয়বারও তিনি একইভাবে নামায আদায় করে ফিরে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো তাকে বললেন-

قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

'যাও! নামায পড়ো! কারণ, তুমি নামায পড়োনি।'

তৃতীয়বারও যখন তিনি একই কথা বললেন, তখন তিনি নিবেদন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে বলে দিন, আমি কী ভুল করেছি এবং কীভাবে আমার নামায পড়া উচিত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামাযের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।[১]

শুরুতেই নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা না করার কারণ

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- 'যাও! নামায পড়ো! কারণ, তুমি নামায পড়োনি।' কিন্তু প্রথমবারই নামাযের সঠিক পদ্ধতি তিনি কেন বলে দেননি? এর কারণ এই যে, আসলে ঐ ব্যক্তিরই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো যে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়ে এলাম, অথচ আপনি বলছেন আমি নামায পড়িনি। আমার কী ভুল হয়েছে? তিনি যেহেতু জিজ্ঞাসা করেননি তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেননি। এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষের অন্তরে জানার আগ্রহ সৃষ্টি না হলে অনেক সময় তাকে জ্ঞান দান করা বৃথা যায়। এ কারণে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন যে, তার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হোক। তৃতীয়বার যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি বললেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرِنِيْ وَعَلِّمْنِيْ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন কীভাবে নামায পড়া উচিত।'

তখন তিনি তাকে নামায পড়া শিখিয়ে দেন।

ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায় করুন

যাইহোক, একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগ্রহের অপেক্ষায় ছিলেন যে, তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলে তখন শিখিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় বিষয় এই ছিলো যে, হয়তো তিনি চিন্তা করলেন, সে দু'-তিনবার ফিরে নামায পড়ার পর যখন নামাযের সঠিক পদ্ধতি শিখবে, তখন তা অন্তরে গেঁথে যাবে এবং এ শিক্ষার গুরুত্ব হবে অধিক।

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৭১৫, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৬০২, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৯

এ কারণে তিনি তিনবার নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। তারপর বলেছেন- যখন তুমি নামায পড়বে, প্রত্যেক রুকনকে সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করবে। যখন কেরাত পড়বে, ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করবে। যখন দাঁড়াবে, প্রশান্তির সাথে দাঁড়াবে। যখন রুকুতে যাবে, শান্তভাবে রুকু করবে। যাতে তোমার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। যখন রুকু থেকে উঠে দাঁড়াবে, এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, যেন মেরুদণ্ড বাঁকা না থাকে। যখন সিজদায় যাবে, ধীরস্থিরভাবে সিজদাহ করবে। যখন সিজদাহ থেকে উঠবে, ধীরস্থিরভাবে উঠবে। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সেই বিবরণ শুনলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার উসিলায় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো বিবরণ শোনার ও শেখার সুযোগ লাভ করি।

নামায পুনরায় পড়তে হবে

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন- 'যাও! নামায পড়ো! কারণ, তুমি নামায পড়োনি।' তার অর্থ এই যে, রুকু, কওমা বা সিজদাহর মধ্যে যদি এ ধরনের ত্রুটি রয়ে যায় তাহলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। তাই রুকুর মধ্যে যদি মেরুদণ্ড সোজা না হয় বা কওমার মধ্যে মেরুদণ্ড সোজা না হয়, শুধু ইশারা করেই পরবর্তী রুকনে চলে যায়- যেমন অনেক মানুষই এরকম করে থাকে- তাহলে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। এ কারণে এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং রুকুর মধ্যে যে পরিমাণ সময় লাগে কওমার মধ্যেও ঐ পরিমাণ সময় লাগানো উত্তম।

'কওমা'র একটি আদব

এক সাহাবী বলেন- অনেক সময় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি রুকু থেকে উঠে কওমার জন্যে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েছেন যে, আমাদের মনে হয়েছে, তিনি হয়তো ভুলে গেছেন। আসলে তিনি রুকু লম্বা করেছিলেন। তাই কওমাও লম্বা করেছেন। তারপর তিনি সিজদায় গেছেন। এটা হলো কওমার আদব।

সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি

কওমার পর মানুষ সিজদাহ করে থাকে। সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি হলো, সোজা সিজদায় চলে যাবে। সিজদায় যাওয়ার সময় আগেই কোমর ঝুঁকাবে না। মাটিতে হাঁটু না লাগা পর্যন্ত শরীরের উপরের অংশ পুরোপুরি সোজা থাকবে। যখন মাটিতে হাঁটু রাখবে, তখন দেহের উপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে সিজদায় চলে যাবে। এ পদ্ধতি অধিক উত্তম। কিন্তু কেউ যদি আগেই ঝুঁকে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। তবে ফকীহগণ ওই পদ্ধতিকে অধিক পছন্দ করেছেন।

সিজদায় যাওয়ার ক্রম

সিজদায় যাওয়ার ক্রম এই যে, প্রথমে হাঁটু মাটিতে রাখতে হবে, তারপর দুই হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটিতে রাখতে হবে। এটা সহজে মনে রাখার উপায় হলো, যে অঙ্গ মাটির যতো কাছে তা ততো আগে মাটিতে রাখতে হবে। হাঁটু মাটির অধিক কাছে, অতএব হাঁটু মাটিতে প্রথমে যাবে, তারপর হাত কাছে, তাই এরপর হাত রাখতে হবে। তারপর নাক কাছে। সর্বশেষ কপাল মাটিতে রাখতে হবে। এটা সিজদায় যাওয়ার ক্রম। এই ক্রমে সিজদায় যেতে হবে।

পায়ের আঙ্গুল মাটিতে ঠেকানো

সিজদাহ করার সময় উপরোক্ত অঙ্গসমূহ সিজদাহ করে থাকে। তাই দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা, নাক ও কপাল এসব অঙ্গ সিজদায় যাওয়া উচিত এবং মাটিতে রাখা উচিত। বেশিরভাগ মানুষ সিজদার মধ্যে পা মাটিতে রাখে না। পায়ের আঙ্গুল উপরে উঠানো থাকে। পুরো সিজদার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও যদি আঙ্গুল মাটিতে না ঠেকে তাহলে সিজদাই হবে না। ফলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা পরিমাণও আঙ্গুল মাটিতে ঠেকে তাহলে সিজদা ও নামায শুদ্ধ হবে। তবে সুন্নাতের খেলাফ হবে। কারণ, সুন্নাত হলো পুরো সিজদার মধ্যে উভয় পায়ের আঙ্গুল মাটিতে ঠেকানো থাকবে। আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী থাকবে। আঙ্গুল মাটিতে ঠেকেছে, কিন্তু কেবলামুখী হয়নি, তাহলেও সুন্নাতের পরিপন্থী হবে।

সিজদার মধ্যে আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ হয়

সিজদাহ এমন এক জিনিস, যার চেয়ে অধিক মজার ইবাদত দুনিয়াতে আর একটিও নেই। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সিজদার চেয়ে বড় কোনো মাধ্যম নেই। হাদীস শরীফে এসেছে- বান্দা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর এত নিকটবর্তী হয় না, সিজদাহ অবস্থায় যতো নিকটবর্তী হয়।[১]

কারণ, যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে, তখন তার পুরো অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকানো থাকে। তাই সিজদার মধ্যে সমস্ত অঙ্গ ঝুঁকানো থাকা উচিত। সেই পদ্ধতিতে ঝুঁকানো থাকা উচিত, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং যার উপর তিনি আমল করেছেন।

মহিলারা চুলের খোঁপা খুলে দিবে

এ কারণে বলা হয়েছে যে, মহিলাদের জন্যে চুলের খোঁপা বেঁধে রেখে নামায পড়া মাকরূহমুক্ত নয়। তবে নামায হয়ে যাবে। এ কারণে যে, উলামায়ে কেরাম বলেছেন- যদি খোঁপা বাঁধা থাকে তাহলে চুল সিজদায় যাবে না। কারণ, তখন চুল উপরে উঠে থাকবে। ফলে পুরোপুরি সিজদাহ লাভ হবে না। এ কারণে মহিলাদের উচিত, নামায শুরু করার আগে খোঁপা খুলে ফেলা, যাতে সিজদার মধ্যে চুল নিচের দিকে থাকে এবং চুলও সিজদার নূর ও বরকত লাভ করতে পারে। কারণ, সিজদা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার এই পরিমাণ নৈকট্য লাভ হয় না।

নামায মুমিনের মেরাজ

দেখুন! আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজের এমন এক মহিমান্বিত মর্যাদা দান করেছেন, যা সৃষ্টিজগতের আর কারো লাভ হয়নি। সেই ধামে তিনি পৌছেছেন,

---

১. সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৪, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১১২৫, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৭৪১, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৯০৮৩

যেখানে জিবরাঈল আ.-ও পৌছতে পারেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন যে, আমরা-আপনারা তার কল্পনাও করতে পারবো না। মেরাজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাক ভাষায় নিবেদন করেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নৈকট্যের এত উঁচু মাকাম দান করলেন, আমার উম্মত এ মাকাম কীভাবে লাভ করবে?' আল্লাহ তা'আলা প্রত্যুত্তরে নামাযের উপঢৌকন দান করেন এবং বলেন- যাও! তোমার উম্মাতকে বলবে- তারা যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। উম্মাত যখন নামায পড়বে তখন তারা সিজদাও করবে, যখন সিজদাহ করবে তখন আমার নৈকট্য লাভ হবে। এজন্যে বলা হয়েছে-

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'নামায মু'মিনের মেরাজ।'[১]

কারণ, আমাদের-আপনাদের ক্ষমতা নেই যে, সাত আসমান অতিক্রম করে উর্ধ্ব জগতে চলে যাবো। 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পৌছে যাবো। কিন্তু সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় প্রত্যেক মু'মিনকে এ মেরাজ দান করা হয়েছে। সিজদায় যাও এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো। তাই সিজদা কোনো মামুলী বিষয় নয়। অতএব গুরুত্বের সাথে সিজদা করুন।

সিজদার ফযীলত

আপনি যখন নিজের পুরো অস্তিত্বকে আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দেন, তখন সমস্ত সৃষ্টিজগত আপনার সামনে অবনত থাকে।

سر بر قدم حسن، قدم بر کلاه وتاج

'যখন তুমি সৌন্দর্যের আধার আল্লাহর পায়ে সিজদারত হও,
তখন তোমার পা থাকে সমস্ত রাজ-মুকুটের উপরে।'

অর্থাৎ, সমগ্র জগত তোমার পদানত হয়।

---

১. তাফসীরে হাক্কী, খণ্ডঃ ৮, পৃ. ৪৫৩, রূহুল আ'আনী, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৮৯

ইকবাল বলেন-

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

এই একটি সিজদাহ হাজার সিজদাহ থেকে মুক্তি দেয়। কারণ, মানুষ যদি আল্লাহর সামনে সিজদাবনত না হয়, তাহলে তাকে সব জায়গায় মাথা নত করতে হয়। কখনো শাসকের সামনে, কখনো অফিসারের সামনে, কখনো ধনীর সামনে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে সিজদাহ করে, সে অন্য কারো সামনে মাথা নত করে না। তাই মর্যাদা, মহব্বত ও আন্তরিকতার সাথে সিজদাহ করুন।

সিজদায় অপার্থিব ভাব

হযরত শাহ ফযলুর রহমান ছাহেব গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। একবার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক বুযুর্গ। যখন থানভী রহ. ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি আস্তে করে তাঁকে বললেন-

'মিয়াঁ আশরাফ আলী! একটি কথা বলি, তা হলো- আমি যখন সিজদায় যাই, তখন মনে হয় যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদর করলেন।'

মোটকথা, সিজদাহ মহব্বতের সঙ্গে করুন। ভালোবাসার সাথে করুন। কারণ, এই সিজদাহ আপনাকে সহস্র সিজদাহ থেকে মুক্তি দিচ্ছে। আপনাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করছে। যা অন্য কোনোভাবে লাভ হতে পারে না।

সিজদার মধ্যে কনুই পৃথক রাখা

তাই যখন সিজদাহ করবে, সহীহ তরীকায় করবে। সিজদার মধ্যে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তেমনভাবে থাকা উচিত, যেমন থাকতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তা হলো, কনুই পাঁজর থেকে পৃথক থাকবে। তবে কনুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখার ফলে পার্শ্ববর্তী নামাযী

ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। অনেক মানুষ কনুই এত বেশি ছড়িয়ে দেয় যে, ডান-বামের নামাযীদের কষ্ট হয়। এ তরীকাও সুন্নাতের খেলাপ। নাজায়েয। কারণ, কোনো মানুষকে কষ্ট দেয়া কবীরা গোনাহ। সিজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى বলবে। অধিক বলার তাওফীক হলে পাঁচবার, সাতবার, এগারোবার বলবে। মহব্বত, আযমত ও গুরুত্বের সাথে পড়বে।

'জলসা'র অবস্থা ও দু'আ

প্রথম সিজদা করে বসাকে 'জলসা' বলে। 'জলসা'র মধ্যে কিছু সময় স্থিরভাবে বসা উচিত। বসেই দ্বিতীয় সিজদায় চলে যাওয়া ঠিক নয়। এক সাহাবী বলেন- জলসার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরিমাণ সময় বসতেন, যে পরিমাণ সময় তিনি সিজদাহ করতেন। এ সুন্নাতটিও পরিত্যক্ত হয়ে চলেছে। 'জলসা'র মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই দু'আ পড়া প্রমাণিত আছে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

'হে আল্লাহ! আমার গোনাহসমূহ মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে আবৃত করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।'[1]

তাই 'জলসা'র মধ্যে এ পরিমাণ সময় বসা উচিত, যে পরিমাণ সময়ে এ দু'আ পাঠ করা সম্ভব। তারপর দ্বিতীয় সিজদায় যাবে।

যাই হোক, তাকবীরে তাহরীমা থেকে সিজদা পর্যন্ত এক রাকাতের বর্ণনা সম্পন্ন হলো। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে অবশিষ্ট আলোচনা আগামী জুমায় করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৮৮৮

সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়ুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى، وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

নামায দ্বীনের স্তম্ভ। সুন্নাত মোতাবেক নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। আমরা উদাসীনভাবে নামাযের রুকনসমূহ যার যেমন বুঝে আসে, তেমনভাবে আদায় করি। নামাযের রুকনসমূহ সুন্নাত মোতাবেক আদায় করার কোনো চিন্তা-ফিকির আমাদের মধ্যে নেই। এ কারণে আমাদের নামায সুন্নাতের নূর ও বরকত শূন্য থাকে। অথচ নামাযের রুকনসমূহ ঠিকঠিকভাবে আদায় করতে সময়ও অধিক ব্যয় হয় না, পরিশ্রমও অধিক লাগে না। শুধু একটু মনোযোগ দেয়ার বিষয়। আমরা যদি সামান্য একটু মনোযোগ দেই, সঠিক পদ্ধতি শিখে নিই এবং তা অভ্যাসে পরিণত করি, তাহলে যে সময়ে আজ আমরা নামায আদায় করছি, সে সময়ের মধ্যেই সুন্নাত মোতাবেক নামায আদায় হতে পারে। যার প্রতিদান ও পুরস্কার এবং নূর ও বরকত হবে বর্তমানের নামাযের চেয়ে অনেক বেশি।

হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম নামাযের একেকটি আমল খুব মনোযোগের সাথে সুন্নাত মোতাবেক আদায় করার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। তারা পরস্পরের নিকট থেকে সুন্নাতের শিক্ষা লাভ করতেন।

এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে অধম এক মজলিসে নামাযের সুন্নাত পদ্ধতি এবং এতদসংক্রান্ত যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির প্রচলন রয়েছে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে তার দ্বারা শ্রোতাগণের অনেক ফায়দা হয়। অনেক বন্ধু মত দেন যে, বিষয়গুলি ছোটো একটি পুস্তিকা আকারে বের হলে তা দ্বারা সবাই উপকৃত হতে পারতো। তাই ছোট্ট এই পুস্তিকায় সুন্নাত তরীকা মোতাবেক এবং

---

* 'সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়ুন' (পুস্তিকা)

আদবসহ নামায আদায় করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা একে আমাদের সবার জন্যে উপকারী করুন এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ! নামাযের মাসআলা সম্পর্কিত ছোটো-বড় অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এখানে নামাযের সব মাসআলা বলা উদ্দেশ্য নয়। শুধু নামাযের রুকনসমূহ সুন্নাত মোতাবেক আদায় করার জন্যে কয়েকটি জরুরী কথা বর্ণনা করা হবে। এবং ঐ সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে সর্তক করা হবে, যেগুলো আজকাল ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত এ কয়টি বিষয়ের উপর আমল করলে ইনশাআল্লাহ কমপক্ষে নামাযের বাহ্যিক আকৃতি সুন্নাত মোতাবেক হবে। তখন একজন মুসলমান তার পরওয়ারদেগারের দরবারে না হলেও এটুকু নিবেদন করতে পারবে যে-

تیرے محبوب کی یا رب! شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اسکو تو کردے، میں صورت لے کے آیا ہوں

'হে প্রভু! তোমার মাহবুবের সাদৃশ্য নিয়ে এসেছি,
আমি আকার এনেছি, তুমি প্রাণ দান করো।'

নামায শুরু করার পূর্বে

নামায শুরু করার পূর্বে এ কথাগুলো স্মরণ রাখুন এবং তার উপর আমল করার বিষয়ে নিশ্চিত হোন!

১. আপনার চেহারা কেবলামুখী হওয়া জরুরী।

২. আপনাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকতে হবে। ঘাড় নত করে থুতনি বুকের সাথে লাগানো মাকরূহ। বিনা কারণে সিনা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ানোও ঠিক নয়। এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, যেন দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকে।

৩. আপনার পায়ের আঙ্গুলসমূহও কেবলামুখী হতে হবে। উভয় পা সোজা কেবলামুখী থাকতে হবে। পা ডানে-বামে বাঁকা রাখা সুন্নাতের পরিপন্থী।

৪. উভয় পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবধান থাকতে হবে।

৫. জামাতে নামায পড়লে, কাতার সোজা হতে হবে। কাতার সোজা করার উত্তম পন্থা হলো, প্রত্যেকে উভয় পায়ের গোড়ালির শেষ মাথা কাতারের বা দাগের শেষ মাথায় রাখবে।

৬. জামাতে দাঁড়ানো অবস্থায় এ বিষয়ে নিশ্চিত হোন যে, ডানে-বামে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের বাহুর সঙ্গে আপনার বাহু মিলেছে। মাঝে কোনো খালি জায়গা নেই।

৭. পায়জামা, লুঙ্গি, প্যান্ট, জুব্বা ইত্যাদি গিরার নিচে ঝুলানো সর্বাস্থায় নাজায়েয। বলা বাহুল্য যে, নামাযের মধ্যে তা আরো বেশি খারাপ। তাই পায়জামা গিরার উপরে হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।

৮. হাত আস্তিন দ্বারা পুরোপুরি ঢাকা থাকতে হবে। শুধু হাতের কব্জি খোলা থাকবে। অনেকে আস্তিন উঠিয়ে নামায পড়ে। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। এমন কাপড় পরে নামাযে দাঁড়ানো মাকরূহ, যেগুলো পরে মানুষ অন্যের সামনে যায় না।

নামায শুরু করার সময়

১. মনে মনে নিয়ত করবে যে, আমি অমুক নামায পড়ছি। মুখে নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করা জরুরী নয়।

২. হাত কান পর্যন্ত এভাবে উঠাবে, যেন হাতের তালু কেবলামুখী থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতির সঙ্গে লেগে যাবে বা তার বরাবর হবে। অবশিষ্টাঙ্গুলি সোজা উপরের দিকে থাকবে। অনেক লোক হাতের তালু কেবলামুখী না করে কানমুখী রাখে। কতক লোক হাত দ্বারা কান

ঢেকে রাখে। কতক লোক হাত দিয়ে কানের লতি ধরে বসে। এসব পদ্ধতি ভুল এবং সুন্নাতের খেলাপ। এগুলো ত্যাগ করা উচিত।

৩. উপরোক্ত পদ্ধতিতে হাত উঠানোর সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তারপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। অবশিষ্ট আঙ্গুল তিনটি বামহাতের পিঠের উপর এমনভাবে বিছিয়ে দিবে যেন সবগুলোর মাথা কনুইয়ের দিকে থাকে।

৪. উভয় হাত নাভির সামান্য নিচে রেখে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাঁধবে।

দাঁড়ানো অবস্থায়

১. একা নামায পড়লে বা ইমামতি করলে প্রথমে 'সানা' তারপর সূরায়ে ফাতিহা তারপর অন্য কোনো সূরা পড়বে। আর যদি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তাহলে শুধু 'সানা' পড়ে চুপ থাকবে এবং মনোযোগসহ ইমামের কেরাত শুনবে। আর যদি ইমাম আস্তে আস্তে কেরাত পড়ে তাহলে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে সূরায়ে ফাতেহার ধ্যান করবে।

২. কেরাত পড়ার সময় সূরায়ে ফাতিহা পড়তে প্রত্যেক আয়াতে শ্বাস ফেলা উত্তম। একশ্বাসে কয়েক আয়াত পড়বে না। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ পড়ে শ্বাস ফেলবে। তারপর الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ পড়ে শ্বাস ফেলবে। তারপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ পড়ে শ্বাস ফেলবে। এভাবে পুরো সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। তবে পরবর্তী কেরাতে একশ্বাসে একাধিক আয়াত পড়লেও কোনো সমস্যা নেই।

৩. বিনা প্রয়োজনে শরীরের কোনো অঙ্গ নাড়াবে না। যতো স্থির হয়ে দাঁড়াবে, ততোই উত্তম। চুলকানো বা অন্য কোনো প্রয়োজন হলে শুধু এক হাত ব্যবহার করবে। তাও ভীষণ প্রয়োজনের সময় এবং ন্যূনতম পরিমাণ।

৪. দেহের পুরো ভর এক পায়ের উপর দিয়ে অন্য পা এমনভাবে শিথিল করে ছেড়ে দেয়া যে, তার মধ্যে বক্রতা চলে আসে, আদবের পরিপন্থী। এ থেকে বিরত থাকবে। উভয় পায়ের উপর সমান ভর দিবে।

আর এক পায়ের উপর যদি জোর দেয় তবে এভাবে দিবে যাতে অন্য পায়ের মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি না হয়।

৫. হাই আসলে তা দমন করার পুরোপুরি চেষ্টা করবে।

৬. দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকবে। এদিক-ওদিক বা সামনের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকবে।

রুকু অবস্থায়

রুকুতে যাওয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে-

১. নিজের দেহের উপরের অংশ এ পরিমাণ ঝুঁকাবে, যেন ঘাড় ও পিঠ সমান থাকে। তার চেয়ে বেশি বা কম ঝুঁকাবে না।

২. রুকু অবস্থায় ঘাড় এত বেশি ঝুঁকাবে না যে, থুঁতনি বুকের সাথে লেগে যায়। আবার এত উঁচুও করবে না যে, ঘাড় মেরুদণ্ড থেকে উঁচু হয়ে যায়। ঘাড় ও কোমর বরাবর হওয়া উচিত।

৩. রুকুর মধ্যে পা সোজা রাখবে। পায়ের মধ্যে যেন ভাঁজ না পড়ে।

৪. উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ খোলা অবস্থায় হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখবে যে, প্রত্যেক দুই আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক থাকবে। এভাবে ডান হাত দ্বারা ডান হাঁটু এবং বাম হাত দ্বারা বাম হাঁটু ধরবে।

৫. রুকু অবস্থায় কনুই ও বাহু সটান থাকবে। তার মধ্যে ভাঁজ পড়া উচিত নয়।

৬. কমপক্ষে এতোটুকু সময় রুকুর মধ্যে বিলম্ব করবে, যেন ধীরস্থিরভাবে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা যায়।

৭. রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের দিকে থাকবে।

৮. উভয় পায়ের উপরে সমান ভর থাকা উচিত। উভয় পায়ের গিরা পরস্পরে বরাবর থাকা উচিত।

রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময়

১. রুকু থেকে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, যেন দেহের মধ্যে কোনো ভাঁজ না থাকে।

২. এ অবস্থাতেও দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকবে।

৩. যারা রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে শরীর ঝোঁকা অবস্থাতেই সিজদায় চলে যায় তাদের উপর পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব। তাই কঠোরভাবে এটা থেকে বিরত থাকবে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সিজদায় যাবে না।

সিজদায় যাওয়ার সময়

সিজদায় যাওয়ার সময় নিম্নের পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

১. সর্বপ্রথম হাঁটু ভাঁজ করে এমনভাবে মাটির দিকে নিয়ে যাবে, যেন বুক সামনের দিকে ঝুঁকে না যায়। হাঁটু যখন মাটিতে লাগবে তখন বুক ঝুঁকাবে।

২. হাঁটু মাটিতে না ঠেকা পর্যন্ত দেহের উপরের অংশ ঝুঁকানো থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকবে। বর্তমানে সিজদায় যাওয়ার এ বিশেষ আদবের ব্যাপারে অবহেলা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বেশিরভাগ মানুষ শুরু থেকেই সামনের দিকে বুক ঝুঁকিয়ে সিজদায় যায়। বিনা ওযরে এমন করা উচিত নয়।

৩. হাঁটুর পর প্রথমে হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটিতে রাখবে।

সিজদা অবস্থায়

১. সিজদার মধ্যে উভয় হাতের মাঝখানে এমনভাবে মাথা রাখবে, যেন দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি বরাবর হয়ে যায়।

২. সিজদার মধ্যে দুই হাতের আঙ্গুল মিলানো থাকবে। আঙ্গুলসমূহের মাঝে ফাঁক থাকবে না।

৩. আঙ্গুলসমূহের মাথা কিবলার দিকে থাকবে।

৪. কনুই মাটি থেকে উপরে থাকবে। মাটিতে কনুই ঠেকানো ঠিক নয়।

৫. উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে থাকবে। পাঁজরের সাথে একেবারে মিলিয়ে রাখবে না।

৬. কনুইদ্বয় ডানে-বামে এত বেশি ছড়িয়ে দিবে না, যে কারণে পাশের নামাযীর কষ্ট হয়।

৭. রান পেটের সাথে মিলানো থাকবে না, বরং পৃথক থাকবে।

৮. পুরো সিজদার সময় নাক মাটিতে ঠেকানো থাকবে। মাটি থেকে পৃথক হবে না।

৯. উভয় পা এভাবে খাড়া রাখতে হবে, যেন গোড়ালী উপর দিকে থাকে এবং সবগুলো আঙ্গুল ভালোভাবে মুড়িয়ে কেবলামুখী থাকে। যারা নিজেদের পায়ের গঠনের কারণে সবগুলো আঙ্গুল কেবলার দিকে ফেরাতে সক্ষম নন তারা যতোটুকু পারেন গুরুত্বের সাথে ততোটুকুই ফেরাবেন। বিনা কারণে আঙ্গুলসমূহকে মাটির সাথে ঠেকিয়ে সোজা করে রাখা ঠিক নয়।

১০. লক্ষ্য রাখতে হবে, সিজদার মধ্যে পা যেন মাটি থেকে উপরে উঠে না যায়। কতক মানুষ এমনভাবে সিজদা করে যে, পায়ের কোনো আঙ্গুল এক মুহূর্তের জন্যেও মাটিতে ঠেকে না। এভাবে সিজদা আদায় হয় না। ফলে নামাযও হয় না। সতর্কতার সাথে এ থেকে বিরত থাকবে।

১১. সিজদা অবস্থায় কমপক্ষে এতোটুকু সময় দেরী করবে, যেন ধীরস্থিরভাবে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলতে পারে। কপাল মাটিতে ঠেকিয়েই অবিলম্বে তুলে ফেলা নিষেধ।

দুই সিজদার মাঝে

১. এক সিজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে উভয় হাঁটু মাটিতে রেখে সোজা হয়ে বসবে। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। মাথা সামান্য উপরে উঠিয়ে সোজা না হয়েই দ্বিতীয় সিজদা করা গোনাহ। এরূপ করলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

২. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা এমনভাবে খাড়া করবে, যেন আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী হয়ে যায়। অনেকে উভয় পা খাড়া করে গোড়ালির উপর বসে, এ পদ্ধতি সঠিক নয়।

৩. বসা অবস্থায় উভয় হাত রানের উপর রাখবে। তবে আঙ্গুলসমূহ হাঁটুর নিচে ঝুলানো থাকবে না। বরং আঙ্গুলের শেষ প্রান্ত হাঁটুর শুরুর অংশ পর্যন্ত চলে যাবে।

৪. বসা অবস্থায় দৃষ্টি কোলের দিকে নিবদ্ধ থাকবে।

৫. এতোটুকু সময় দেরী করবে, যার মধ্যে কমপক্ষে একবার سُبْحَانَ الله বলা যায়। আর যদি এই পরিমাণ দেরী করে, যার মধ্যে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

পড়া যায়, তাহলে উত্তম। তবে ফরয নামাযের মধ্যে এ দু'আ পড়ার প্রয়োজন নেই। নফল নামাযের মধ্যে পড়া উত্তম।

দ্বিতীয় সিজদা এবং তা থেকে ওঠা

১. দ্বিতীয় সিজদাতেও প্রথমে উভয় হাত, তারপর নাক তারপর কপাল মাটিতে রাখবে।

২. প্রথম সিজদার মতোই দ্বিতীয় সিজদার অবস্থা হবে।

৩. সিজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত, তারপর হাঁটু উঠাবে।

৪. সিজদা থেকে ওঠার সময় মাটিতে ভর না দেয়া উত্তম। তবে শরীর যদি ভারী হয় বা অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে কষ্ট হয় তাহলে ভর দেয়াও জায়েয আছে।

৫. ওঠার পর প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে সূরায়ে ফাতেহার পূর্বে- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে।

বৈঠক অবস্থায়

১. দুই সিজদার মাঝে বসার যে নিয়ম বলা হয়েছে, এখানেও সে নিয়মেই বসবে।

২. আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন 'اَشْهَدُ اَنْ لَا' বলবে, তখন শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে এবং 'اِلَّا اللهُ' বলার সময় নামিয়ে দিবে।

৩. ইশারা করার পদ্ধতি এই যে, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানাবে, কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অনামিকা বন্ধ করে রাখবে এবং তর্জনী এমনভাবে উঠাবে, যেন আঙ্গুল কেবলার দিকে ঝুঁকানো থাকে। সোজা আসমানের দিকে উঠানো উচিত নয়।

৪. 'إِلَّا اللهُ' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নিচে নামাবে (তবে রানের সাথে একেবারে মিলিয়ে দিবে না, বরং সামান্য উঁচু রাখবে)। অবশিষ্ট আঙ্গুলসমূহ ইশারা করার সময় যে অবস্থায় ছিলো শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকবে।

সালাম ফেরানোর সময়

১. উভয় দিকে সালাম ফেরানোর সময় ঘাড় এ পরিমাণ ঘোরাবেন যেন পিছনে বসা ব্যক্তি আপনার গাল দেখতে পায়।

২. সালাম ফেরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে থাকবে।

৩. ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে যখন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবে, তখন এই নিয়ত করবে যে, ডান দিকে যে সমস্ত মানুষ ও ফেরেশতা রয়েছে তাদের সালাম করছি। এবং বামদিকে সালাম ফেরানোর সময় বাম দিকের মানুষ ও ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করবে।

দু'আর পদ্ধতি

১. দু'আর পদ্ধতি এই যে, উভয় হাত সিনা বরাবর উঠাবে। উভয় হাতের মাঝে সামান্য ফাঁক থাকবে। দুই হাতকে একেবারে মিলিয়েও দিবে না, আবার অনেক বেশি ফাঁকও রাখবে না।

২. দু'আ করার সময় হাতের ভিতরের অংশ চেহারার সামনে রাখবে।

মহিলাদের নামায

উপরে নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা ছিলো পুরুষদের জন্যে। মহিলাদের নামাযে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে পুরুষদের থেকে ব্যবধান রয়েছে। মহিলাদের নিম্নের মাসআলাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

১. নামায শুরু করার পূর্বে মহিলাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, তাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ছাড়া পুরো দেহ কাপড় দ্বারা ঢাকা রয়েছে। কতক মহিলা চুল উন্মুক্ত (খোলা) রেখে নামায পড়ে।

কারো কনুই খোলা থাকে। কারো কান খোলা থাকে। কতক মহিলা এত ছোট ওড়না ব্যবহার করেন যে, তার নিচ দিয়ে চুল দৃষ্টিগোচর হয়। এ সবগুলো পদ্ধতিই নাজায়েয। নামাযের মধ্যে চেহারা, হাত ও পা ছাড়া শরীরের যে কোনো অঙ্গের এক চতুর্থাংশ যদি এ পরিমাণ সময় খোলা থাকে যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা যেতে পারে, তাহলে নামাযই হবে না, আর যদি এর চেয়ে কম সময় খোলা থাকে, তাহলে নামায তো হয়ে যাবে, কিন্তু গোনাহ হবে।

২. মহিলাদের জন্যে কামরার মধ্যে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং বারান্দায় নামায পড়া আঙ্গিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

৩. নামায শুরু করার সময় মহিলারা কান পর্যন্ত নয়, বরং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। ওড়নার ভিতরে রেখেই হাত উঠাবে, বাইরে বের করবে না। (বেহেশতী যেওর)

৪. মহিলারা সিনার উপরে এভাবে হাত বাঁধবে যে, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে। পুরুষদের ন্যায় নাভির নিচে হাত বাঁধা তাদের উচিত নয়।

৫. রুকুর মধ্যে মহিলাদের জন্যে পুরুষদের মতো মেরুদণ্ড পুরোপুরি সোজা করা জরুরী নয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কম ঝোঁকা উচিত। (তাহতাবী আলাল মারাকীঃ ১৪)

৬. রুকু অবস্থায় পুরুষদের হাতের আঙ্গুলসমূহ হাঁটুর ওপর খোলা অবস্থায় রাখা উচিত, কিন্তু মহিলাদের জন্যে আঙ্গুল মিলিয়ে রাখার বিধান। অর্থাৎ আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রাখবে না। (দুররে মুখতার)

৭. মহিলারা রুকুর মধ্যে পা পুরোপুরি সোজা রাখবে না, বরং হাঁটুকে সামনের দিকে সামান্য বাঁকা করে দাঁড়াবে। (দুররে মুখতার)

৮. পুরুষদের জন্যে রুকুর মধ্যে বাহু পাঁজর থেকে পৃথক ও সটান রাখার বিধান, কিন্তু মহিলারা উভয় বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াবে। (প্রাগুক্ত)

৯. মহিলাদের উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়ানো উচিত। বিশেষ করে পায়ের দুই গিরা প্রায় মিলিত হওয়া উচিত। পায়ের মাঝে ফাঁক থাকবে না। (বেহেশতী যেওর)

১০. সিজদায় যেতে পুরুষদের এই পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, হাঁটু মাটিতে না ঠেকা পর্যন্ত তারা বুক ঝোঁকাবে না। কিন্তু মহিলারা শুরু থেকে সিনা ঝুঁকিয়ে সিজদায় যেতে পারে।

১১. মহিলাদের এভাবে সিজদা করা উচিত যে, পেট রানের সঙ্গে এবং বাহু পাঁজরের সঙ্গে পুরোপুরি মিলানো থাকবে। মহিলারা পা খাড়া না করে ডান দিকে বিছিয়ে দিবে।

১২. পুরুষদের জন্যে সিজদার মধ্যে কনুই মাটিতে রাখা নিষেধ, কিন্তু মহিলাদের কনুইসহ হাত মাটিতে রাখা উচিত। (দুররে মুখতার)

১৩. দুই সিজদার মাঝে এবং 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার জন্যে যখন বসবে তখন বাম রান বিছিয়ে বসবে। উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং ডান গোছা উপরে রাখবে। (তাহতাবী)

১৪. পুরুষরা রুকুর মধ্যে আঙ্গুল খোলা রাখা, সিজদার মধ্যে বন্ধ রাখা এবং নামাযের অন্যান্য অংশে স্বাভাবিক রাখার প্রতি যত্ন নিবে। বন্ধও করবে না, আবার খুলেও রাখবে না। কিন্তু মহিলাদের জন্যে সর্বাবস্থায় বন্ধ রাখার বিধান। অর্থাৎ রুকুর মধ্যে, সিজদার মধ্যে, দুই সিজদার মাঝে এবং বৈঠকের সময় আঙ্গুলের মাঝে ফাঁক রাখবে না।

১৫. মহিলাদের জামাত করা মাকরূহ। তাদের একা নামায পড়াই উত্তম। তবে 'মাহরাম' পুরুষ যদি ঘরের মধ্যে জামাতের সাথে নামায আদায় করে তাহলে তাদের সঙ্গে জামাতে অংশ নেয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। তবে এমতাবস্থায় পুরুষদের থেকে একেবারে পিছনে দাঁড়ানো জরুরী। বরাবর কখনোই দাঁড়াবে না।

মসজিদের কতিপয় জরুরী আদব

১. মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

'আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল হোক। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্যে আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।'[১]

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৫, সুনানুন নাসায়ী, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৭২১, সুনানুন নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৩৯৩

২. মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই নিয়ত করবে যে, যতক্ষণ সময় মসজিদে অবস্থান করবো, এ'তেকাফের সঙ্গে অবস্থান করবো। এভাবে ইনশাআল্লাহ এ'তেকাফের সওয়াবও পেয়ে যাবে।

৩. মসজিদে প্রবেশ করে প্রথম কাতারে বসা উত্তম, তবে প্রথম কাতারে জায়গা না থাকলে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে। মানুষের কাঁধ ডিঙিয়ে সম্মুখে যাওয়া জায়েয নেই।

৪. যে সব লোক মসজিদে আগে থেকে বসে যিকির বা তিলাওয়াতে রত আছেন, তাদেরকে সালাম করা উচিত নয়। তবে তাদের কেউ যদি নিজের থেকে তার দিকে মনোযোগ দেয় এবং যিকির ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে তাহলে তাকে সালাম করায় ক্ষতি নেই।

৫. মসজিদে সুন্নাত বা নফল পড়তে হলে এমন জায়গা নির্বাচন করবে, যেখানে সামনে দিয়ে লোক অতিক্রম করার সম্ভাবনা নেই। অনেক লোক সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে নামায শুরু করে দেয়। তাদের কারণে অনেক দূর পর্যন্ত মানুষের অতিক্রম করা কঠিন হয়ে যায়। অনেক জায়গা ঘুরে তাদেরকে যেতে হয়। এমন করা গোনাহ। কোনো ব্যক্তি যদি এমতাবস্থায় নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তাহলে এই অতিক্রম করার গোনাহও নামাযী ব্যক্তির হবে।

৬. মসজিদে প্রবেশ করার পর নামাযের দেরী থাকলে বসার পূর্বে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদে'র নিয়তে দু'রাকআত নামায পড়বে। এর অনেক সওয়াব রয়েছে। যদি সময় না থাকে তাহলে সুন্নাতের মধ্যেই 'তাহিয়্যাতুল মসজিদে'র নিয়ত করবে। আর যদি সুন্নাত পড়ারও সময় না থাকে, জামাত দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ফরযের মধ্যেও এ নিয়ত করা যায়।

৭. যতক্ষণ মসজিদে বসা থাকবে, যিকির করতে থাকবে। বিশেষ করে এই কালিমার ওযীফা পাঠ করতে থাকবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

৮. মসজিদে বসা অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। এমন কোনো কাজও করবে না, যার দ্বারা নামায আদায়কারী ও যিকিরকারীদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে।

৯. নামায দাঁড়িয়ে গেলে প্রথমে আগের কাতার পুরো করবে। সামনের কাতারে জায়গা থাকলে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো জায়েয নেই।

১০. জুমার খুৎবা দেয়ার জন্যে ইমাম যখন মিম্বরের উপর আসবেন, তখন থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কথা বলা, নামায পড়া, কাউকে সালাম করা বা সালামের উত্তর দেয়া জায়েয নেই। এ সময় কেউ যদি কথা বলে তাকে চুপ করতে বলাও জায়েয নেই।

১১. খুৎবার সময় এমনভাবে বসা উচিত, যেমন 'আত্তাহিয়্যাতু'র সময় বসে। কতক লোক প্রথম খুৎবার সময় হাত বেঁধে বসে, আর দ্বিতীয় খুৎবার সময় রানের উপর হাত রাখে। এ পদ্ধতি ভিত্তিহীন। উভয় খুৎবার মধ্যে হাত রানের উপর রেখে বসা উচিত।

১২. এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকবে, যার দ্বারা মসজিদ নোংরা হয়, দুর্গন্ধ ছড়ায় বা অন্যের কষ্ট হয়।

১৩. অন্য কাউকে কোনো ভুল কাজ করতে দেখলে চুপিসারে নরমভাবে তাকে বুঝিয়ে দিবে। সবার সামনে তাকে লজ্জিত করা, ধমকানো বা ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নামাযের মধ্যে উদিত বিভিন্ন চিন্তা থেকে বাঁচার উপায়*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦

'নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায়কারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

এগুলো সূরা মু'মিনূনের প্রথম কয়েকটি আয়াত। যেগুলোর তাফসীরের ধারা আমি কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে আরম্ভ করেছি। এসব

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ২২২-২৩৬,

[১] সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৬

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের ঐ সমস্ত গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, যা তাদের জন্যে সফলতার কারণ। আয়াতে উল্লেখিত 'ফালাহ' এমন ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ, যার মধ্যে দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের সফলতা অন্তর্ভুক্ত। সাফল্যমণ্ডিত মু'মিনগণের প্রথম গুণ এই বর্ণনা করেছেন–

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'সে সকল মু'মিন সফলকাম, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বন করে।'

পিছনের বয়ানগুলোতে এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি।

'খুশু'র তিনটি স্তর

গত জুমায় নিবেদন করেছিলাম যে, 'খুশু' অর্জন করার তিনটি স্তর ও তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ হলো, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করবে সেগুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। দ্বিতীয় ধাপ হলো, ঐ সমস্ত শব্দের অর্থের দিকে মনোযোগ আরোপ করবে। তৃতীয় ধাপ হলো, এই ধ্যান নিয়ে নামায পড়বে, যেন সে আল্লাহ তা'আলাকে দেখছে বা কমপক্ষে এ কথা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। এ আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, ঐ সকল মু'মিন সফলকাম, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বনকারী। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, শুধু নামায পড়ার উপরই ক্ষান্ত কোরো না, বরং নামাযের মধ্যে 'খুশু' অর্জন করার চেষ্টা করো।

বিভিন্ন চিন্তা উদয় হওয়ার অভিযোগ

অধিকাংশ মানুষ অনেক সময়ই এই অভিযোগ করে যে, যখন নামায পড়ি, তখন নানা রকমের চিন্তা উদয় হয়। ভাই! এ সব চিন্তার কারণে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এর সমাধানের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। পেরেশান হয়ে কোনো ফল হয় না। আসল কাজ হলো, যা করণীয় তা করা এবং যে ত্রুটি রয়েছে তা দূর করার পন্থা অবলম্বন করা। ত্রুটি দূর করার পন্থা কী?

নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি

প্রথম পন্থা হলো, আল্লাহ তা'আলা নামাযের পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি কাজ দিয়েছেন। অর্থাৎ নামায তো হলো আসল লক্ষ্য, কিন্তু সেই নামাযের পূর্বে এমন কিছু কাজ রেখেছেন, যেগুলোর মধ্যমে মানুষ মূল নামায পর্যন্ত পৌছে থাকে। এগুলো হলো নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি এবং প্রাথমিক করণীয় বিষয়। মানুষ এগুলো ঠিকভাবে সম্পাদন করলে অনাহুত চিন্তা লোপ পেতে থাকবে।

নামাযের প্রথম প্রস্তুতি: পবিত্রতা অর্জন করা

নামাযের প্রস্তুতিসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম রেখেছেন পবিত্রতা অর্জন করা। প্রত্যেক নামাযের জন্যে পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ

'নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা'[1]

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

'পবিত্রতা ছাড়া কোনো নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।'[2]

পবিত্রতার সূচনা 'এস্তেঞ্জা' (শৌচকর্ম)-এর মাধ্যমে

'এস্তেঞ্জা'র মাধ্যমে পবিত্রতার সূচনা। 'এস্তেঞ্জা' করা ওয়াজিব। পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। পেশাবের পর ফোঁটা পড়ার আশঙ্কা দূর না হওয়া পর্যন্ত 'এস্তেঞ্জা' শেষ করবে না। ফিক্‌হের পরিভাষায় একে 'ইস্তিবরা' বলে। সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না হলে তথা কাপড়ে বা দেহে নাপাকির প্রভাব থাকলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়।

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৫৬, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ২৭১, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৯৫৭

২. সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ৩২৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৯, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ২৬৯

অপবিত্রতা অনাহুত চিন্তার কারণ

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর মধ্যেই কিছু বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। অপবিত্রতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মানুষের অন্তরে অপবিত্র, নোংরা ও শয়তানী চিন্তা এবং কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। তাই নামাযের সর্বপ্রথম ভূমিকা হলো, অপবিত্রতা দূর করার প্রতি যত্নবান হওয়া।

নামাযের দ্বিতীয় প্রস্তুতি: ওযু

প্রস্তুতিমূলক দ্বিতীয় কাজ হলো ওযু। ওযু একটি বিরল-বিস্ময়কর জিনিস। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– মানুষ যখন ওযু করে এবং চেহারা ধোয় তখন আল্লাহ তা'আলা চোখের সমস্ত সগীরা গোনাহ ধুয়ে দেন। যখন পা ধোয়, তখন আল্লাহ তা'আলা পায়ের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। ওযুর মধ্যে যে চারটি অঙ্গ ধোয়া হয়, সাধারণত সেগুলোই মানুষকে গোনাহের দিকে ধাবিত করে। এ সব অঙ্গ দ্বারাই গোনাহ সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা করেছেন যে, বান্দা নামাযের জন্যে আমার দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বেই যেন গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তার হাত, চেহারা ও পা গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। তবে গোনাহ দ্বারা এখানে সগীরা গোনাহ উদ্দেশ্য। কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

ওযু দ্বারা গোনাহ ধুয়ে যায়

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে- কেউ ওযু করলে তার ওযুর প্রবাহিত পানির মধ্যে তিনি গোনাহের আকার দেখতে পেতেন যে, অমুক গোনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ 'কাশফ' দান করেছিলেন। যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা নামাযের পূর্বে ওযুর বিধান এ জন্যে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাই লাভ হয় না, বরং অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা এবং গোনাহ থেকেও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়।

কোন্ ওযু দ্বারা গোনাহ ধুয়ে যায়

কিন্তু ওযুর এ উপকারিতা তখন লাভ হয়, যখন সুন্নাত মোতাবেক ওযু করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন সেভাবে ওযু করা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে মুখ করে ওযু করতেন। এটা ওযুর আদব। এমনিভাবে ওযু আরম্ভ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তেন। ওযু করার সময় কথা বলতেন না। ওযুর দিকে মনোযোগ দিতেন।

ওযুর প্রতি মনোযোগ আরোপ করা

ওযুর দিকে মনোযোগ দেয়ার সর্বোচ্চ বিষয় হলো, চেহারা ধোয়ার সময় চিন্তা করবে যে, আমার চেহারার গোনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। যখন হাত ধোবে, তখন চিন্তা করবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ওযুর মধ্যে হাত ধোয়ার সময় হাতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই এখন আমার হাতের গোনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে পানি ব্যবহারের সময় অপচয় করবে না। পানি নষ্ট করবে না। প্রয়োজন পরিমাণ পানি দ্বারা ওযু করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِيَّاكَ وَالسَّرَفَ وَإِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ.

'পানির অপচয় থেকে বাঁচো, যদিও তুমি প্রবাহিত নদীর তীরে থাকো না কেন?'[১]

পানির নদী প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ নদী থেকে যতো পানি দিয়েই তুমি ওযু করো না কেন তাতে নদীর পানি কমবে না। এরপরও বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রেও অপচয় করা থেকে বিরত থাকো। অহেতুক পানি ব্যয় কোরো না।

ওযুর মাঝের দু'আসমূহ

ওযুর মাঝের দু'আসমূহ পাঠ করবে। হাদীস শরীফে এসেছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর মধ্যে অধিকহারে أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পাঠ করতেন।[২]

---

১. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪১৯, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৬৮৬৮

২. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৫০, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৪৮, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪৬৩

দ্বিতীয় দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ[১]

ওযুর পরে তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ[২]

এসব আদব রক্ষা করে ওযু করার বৈশিষ্ট্য হলো– আপনার মন-মগজে যেসব চিন্তা বাসা বেঁধে আছে, সে সব থেকে পবিত্র করে আপনার মস্তিষ্ককে আল্লাহমুখী করে দিবে।

ওযুর মধ্যে কথা বলা

কিন্তু আমাদের ভুলের সূচনা হয় ওযু থেকে। আমরা যখন ওযু করতে বসি, তখন দুনিয়ার সব ঝামেলা ওযুর মধ্যে চলতে থাকে। কথা বলি, গল্প করি, উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ওযু করি। দ্রুত ফরয শেষ করে মুক্তি লাভ করি। এর ফলে ওযুর উপকারিতা ও ফল থেকে আমরা বঞ্চিত হই। পক্ষান্তরে মনোযোগসহ এবং আদব পুরা করে যদি ওযু করি এবং ওযুর মাঝের দু'আসমূহ পাঠ করতে থাকি, তাহলে নামাযের প্রাথমিক কাজ এবং প্রথম ভূমিকা সঠিক হবে।

নামাযের তৃতীয় প্রস্তুতি: 'তাহিয়্যাতুল ওযু' ও 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'

নামাযের তৃতীয় প্রস্তুতি হলো, ওযু করে জামাতের কিছু সময় পূর্বে মসজিদে যাবে। 'তাহিয়্যাতুল ওযু' ও 'তাহিয়্যাতুল মসজিদে'র নিয়তে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। এ দু'রাকআত নামায ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নয়। কিন্তু এর ফযীলত অনেক। হাদীস শরীফে এসেছে একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাযি.-কে বললেন– হে বেলাল! আমি যখন মেরাজে গেলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে বেহেশত ভ্রমণ করালেন, তখন আমার আগে আগে

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২২, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৬০০৪
২. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৫০

তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম- যেমন বাদশাহের আগে তার দেহরক্ষী গিয়ে থাকে।- তুমি বলো! তুমি বিশেষভাবে কোন্ আমল করে থাকো, যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, জান্নাতে তোমাকে আমার দেহরক্ষী বানানো হয়েছে।

হযরত বেলাল রাযি. উত্তর দিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার তো অন্য কোনো আমলের কথা মনে পড়ছে না, তবে একটা কথা এই যে, যখন থেকে আমি ইসলাম কবুল করেছি, তখন থেকে নিয়ত করেছি যে, যখনই ওযু করবো, সে ওযু দ্বারা দু'রাকাত নামায আদায় করবো। সুতরাং ইসলাম আনার পর থেকে যখনই ওযু করি- তখন নামাযের সময় হোক বা না হোক- (নিষিদ্ধ সময় না হলে) অবশ্যই দু'রাকাত 'তাহিয়্যাতুল ওযু' আদায় করি।

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'এটাই সেই আমল, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন।[১]

'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' কোন্ সময় পড়বে?

যাই হোক, প্রত্যেক ওযুর পর দু'রাকআত নফল পড়তে দু'মিনিট সময় ব্যয় হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর কারণে এত বড় মর্যাদা দান করেছেন। মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে দু'রাকআত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' পড়া উত্তম। তবে কেউ যদি ভুলে বসে যায়, তারপর স্মরণ হয় তাহলে তখনই পড়বে। এতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে বসার পূর্বে পড়া উত্তম। এটি নামাযের তৃতীয় ভূমিকা।

নামাযের চতুর্থ প্রস্তুতি: ফরয নামাযের পূর্বের সুন্নাতসমূহ

নামাযের চতুর্থ ভূমিকা হলো, প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে কয়েক রাকাত 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' বা 'গায়রে মুয়াক্কাদাহ' নামায রাখা হয়েছে। যেমন, ফজরের পূর্বে দু'রাকাত ও যোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাতে

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১০৮১, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৯৭, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬২২, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৮০৫২

মুয়াক্কাদা রয়েছে। আছরের পূর্বে ও ইশার পূর্বে রাখা হয়েছে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ। মাগরিবের নামায যেহেতু দ্রুত পড়ার নির্দেশ, এ জন্যে মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত পড়ার মধ্যে এত ফযীলত নেই। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় এ সময়েও দু'রাকাত প্রমাণিত আছে। তাই ফরয নামাযের পূর্বে যে নামাযগুলো পড়া হয়, সেগুলো হলো চতুর্থ ভূমিকা।

প্রস্তুতিমূলক উক্ত চার কাজ সম্পাদনের পর 'খুশু' লাভ হবে

উক্ত চারটি ভূমিকা অতিক্রম করার পর যখন ফরয নামাযে শামিল হবে, তখন ঐ সমস্যা দেখা দিবে না, যা সাধারণত মানুষের দেখা দিয়ে থাকে। যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই, তখন আমাদের মন থাকে এক জায়গায়, আর মস্তিষ্ক থাকে আরেক জায়গায়। উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় নামায আদায় করি। আযান ও ফরয নামাযের মাঝে পনেরো বা ততোধিক মিনিটের যে বিরতি রাখা হয়, এ বিরতি এ জন্যেই রাখা হয়, যাতে মানুষ এ সময়ে উক্ত ভূমিকাসমূহ পুরো করতে পারে। অর্থাৎ শান্তভাবে ওযু করবে, তারপর ধীরস্থিরভাবে 'তাহিয়্যাতুল ওযু' ও 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করবে, তারপর সুন্নাতসমূহ আদায় করবে। এসব ভূমিকা পালন করার পর যখন ফরয নামাযের জন্যে দাঁড়াবে, তখন ইনশাআল্লাহ 'খুশু', একাগ্রতা ও আল্লাহর দিকে মনোযোগ লাভ হবে। এ সব ভূমিকা সম্পাদনে কয়েক মিনিট সময় ব্যয় হবে, কিন্তু এগুলোর কারণে আমাদের নামায সঠিক হবে। পরিণতিতে সফলতা লাভ হবে।

অনাহূত চিন্তার পরোয়া কোরো না

এরপর এ কথাও বলে দেই যে, এসব ভূমিকা সাম্পাদন করার পরও যদি ফরয নামাযের মধ্যে বিভিন্ন রকমের চিন্তা আসতে থাকে, তাহলে এ জন্যে মোটেও ঘাবড়াবে না। এ সব চিন্তা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট এগুলো মাফ। অনেকে এ সব চিন্তার কারণে নামাযের অবমূল্যায়ন করতে থাকে। অনেকে বলে- আমাদের নামায আর কি! আমরা তো কয়েকবার মাথা ঠুকে আসি। অনেকে বলে- আমাদের নামায সম্পূর্ণ বেকার। কারণ, নামাযের মধ্যে নানারকমের চিন্তা আসে। একেবারেই 'খুশু' থাকে না।

এ সব সিজদার মূল্যায়ন করুন

মনে রাখবেন! এগুলো অবমূল্যায়নের কথা। এ সব কথা আল্লাহর পছন্দ নয়। আরে! এটা দেখুন যে, আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে নামায পড়ার তাওফীক তো লাভ হয়েছে। আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হওয়ার তাওফীক তো লাভ হয়েছে। প্রথমে এই তাওফীক ও নেয়ামতের শোকর আদায় করুন যে, তাঁর দরবারে এসে নামায আদায় করতে পেরেছি। কতো মানুষ রয়েছে, যারা এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। আমিও যদি বঞ্চিত হতাম তাহলে তা কতো বড় বঞ্চনার ব্যাপার হতো! আল্লাহ তা'আলা যে হাজির হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, তা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়।

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے
وہ سجدہ جس کو ترے آستاں سے نسبت ہے

'কবুল হোক বা না হোক, তবু এটি একটি নেয়ামত।
সেই সিজদা, যার সম্পর্ক রয়েছে তোমার দরবারের সঙ্গে।'

আল্লাহর দরবারে মাথা রাখার বাহ্যিক যে সুযোগ লাভ হয়েছে, এটিও অনেক বড় নেয়ামত! এ কারণে শোকর আদায় করুন। তবে নিজের পক্ষ থেকে যে ত্রুটি হয়েছে- 'খুশু' লাভ হয়নি, বিভিন্ন চিন্তা উদয় হয়েছে- এ জন্যে আল্লাহর কাছে মাফ চান।

নামাযের পরের দু'আসমূহ

হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. বলেন– প্রত্যেক ফরয নামাযের পর মানুষ দু'টি কাজ করবে। একটি হলো, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে, আর দ্বিতীয়টি হলো, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলবে।

'আলহামদুলিল্লাহ' বলার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করবে যে- হে আল্লাহ! আপনি আপনার দরবারে হাজির হওয়ার এবং নামায পড়ার তাওফীক দান করেছেন। আর 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলবে এ কারণে যে- হে আল্লাহ! আপনি তাওফীক দান করেছিলেন, কিন্তু আমি সেই নামাযের হক আদায় করতে পারিনি। যেমন নামায পড়া উচিত ছিলো, তেমন নামায পড়তে পারিনি। এ জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। হাদীস শরীফে

এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের সালাম ফেরার পর তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ', 'আস্তাগফিরুল্লাহ', 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পাঠ করতেন।

অথচ তিনি নামায পড়েছেন, কোনো গোনাহ তো করেননি! কিন্তু এ জন্যে ইস্তিগফার করছেন যে, হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদার উপযুক্ত নামায আমি পড়তে পারিনি। এ কারণে ইস্তিগফার পড়ছি।

সারকথা

মোটকথা, এ নামাযের অবমূল্যায়নও কোরো না, আবার আত্মশ্লাঘায়ও লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা যে তাওফীক দিয়েছেন, এ জন্যে শোকর আদায় করো, আর যে ত্রুটি হয়েছে সে জন্যে ইস্তিগফার করো। এবং নিজের সাধ্যমতো নামাযকে অধিকতর উৎকৃষ্ট বানানোর চেষ্টা করো। সারাজীবন এমন করতে থাকো। তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে কবুল করবেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চোখ বন্ধ করে নামায পড়া *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

চোখ খোলা অবস্থায় নামায পড়া সুন্নাত

নামাযের বিষয়ে আসল মাসআলা হলো- চোখ খোলা রেখে নামায পড়তে হবে। নামায পড়ার সুন্নাত তরীকাও হলো চোখ খোলা রাখা। যদিও ফকীহগণ বলেছেন, চোখ বন্ধ করা ছাড়া কারো যদি নামাযে একাগ্রতা না হয়, তাহলে তার জন্যে চোখ বন্ধ করাও জায়েয আছে। তবে সর্বাবস্থায় চোখ খোলা রাখাই উত্তম। এ কারণেই কতক বুযুর্গ বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করতেন না, বরং চোখ খোলা রেখে নামায পড়তেন, এ জন্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বরকত চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার মধ্যেই রয়েছে। নামাযে মন বসুক বা না বসুক, ঐ পর্যায়ের একাগ্রতা হোক বা না হোক, অনাহুত চিন্তা জাগুক বা না জাগুক ইত্তিবায়ে সুন্নাতের সওয়াব রয়েছে চোখ খোলা অবস্থায় নামায পড়ার মধ্যেই। যদিও চোখ বন্ধ অবস্থায় নামায পড়া জায়েয কিন্তু তা উত্তম নয়।

আল্লাহওয়ালাগণ বলেছেন, আসল জিনিস হলো ইত্তিবায়ে সুন্নাত। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মধ্যে যে নূর রয়েছে, তা অন্য কিছুর মধ্যে নেই। এ জন্যে নামাযে মন বসুক বা না বসুক, একাগ্রতা সৃষ্টি হোক বা না হোক চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার মধ্যেই যেহেতু ইত্তিবায়ে সুন্নাত, তাই আমরা চোখ খোলা রেখে নামায পড়বো।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইত্তিবায়ে সুন্নাত

এমনকি শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. বিতর নামাযের পর দুই রাকআত নামায বসে পড়তেন। দাঁড়িয়ে পড়তেন না।

অথচ ফকীহগণ পরিষ্কার লিখেছেন যে, নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়লে পুরা সওয়াব এবং বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব। বিত্রের পরের দুই রাকআত সম্পর্কেও ফকীহগণ এ কথাই লিখেছেন যে, বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব হবে। কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বসে পড়তেন।

এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! এ দুই রাকআত নামায আপনি বসে পড়েন কেন? দাঁড়িয়ে পড়েন না কেন?

উত্তরে হযরত বললেন, বহু রেওয়ায়েতে এ কথা এসেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পরের দুই রাকআত নামায বসে পড়তেন। এ জন্যে আমিও বসে পড়ি।

আরেকজন জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! সওয়াবের ব্যাপারে বিধান কী? কারণ, ফকীহগণ লিখেছেন যে, বসে নামায পড়লে অর্ধেক সওয়াব হয়, আর দাঁড়িয়ে পড়লে হয় পুরা সওয়াব।

হযরত বললেন, সওয়াব তো অর্ধেকই হয়। এটাই নিয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিধানই বয়ান করেছেন এবং ফকীহগণও এ বিধানই লিখেছেন।

তারপর লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, হযরত বসে নামায পড়লে যেহেতু অর্ধেক সওয়াব, তাহলে পুরা সওয়াব পাওয়ার জন্যে আপনি দাঁড়িয়ে পড়েন না কেন?

উত্তরে তিনি বললেন- 'ভাই! আসল কথা এই যে, ইত্তিবায়ে সুন্নাতের কাজে মন বেশি আগ্রহী হয়, যদিও সওয়াব কম হোক না কেন।'

অর্থাৎ, সওয়াব কম পাওয়া গেলেও তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ যেভাবে করেছেন, তা ঐভাবে করতে মন বেশি আগ্রহী হয়। বিত্র নামাযের পর নফলসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বসে পড়া প্রমাণিত রয়েছে। এ জন্যে বসে পড়তে ভালো লাগে। তাতে সওয়াব কম হয়, হোক।

মোটকথা, আমাদের বুযুর্গদের রুচি-প্রকৃতি এই যে, যেভাবে কাজ করার মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাত রয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরো। চোখ খোলা রেখে নামায পড়া সুন্নাত। তাতে যদি ঐ পর্যায়ের একাগ্রতা লাভ নাও

হয় তারপরও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের যে নূর তাতে রয়েছে, তা চোখ বন্ধ করে নামায পড়ার মধ্যে নেই। এটা হলো সাধারণ নিয়ম।

প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যক্তির জন্যে চোখ বন্ধ করে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে

কিন্তু হযরত থানভী রহ. এই মালফূযে বলেন, এক ব্যক্তি নতুন নতুন দ্বীনের পথে অগ্রসর হয়েছে। সে মাত্র নামায পড়তে আরম্ভ করেছে, এখন যদি তুমি তার উপরে অনেক বেশি নিয়ম-কানুন আর শর্ত-শারায়েত আরোপ করো, আর বলো যে, দেখো ভাই! চোখ বন্ধ করে নামায পড়বে না, চোখ খোলা রেখে নামায পড়বে। তাহলে সে পালিয়ে যাবে। তার মনের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে ভয় জন্মাবে। তাই প্রথম পর্যায়ের লোকের উপরে চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা উচিত নয়। সুতরাং হযরত থানভী রহ. বলেন, এ ধরনের লোকের জন্যে চোখ খোলা ও বন্ধ করা উভয় অবস্থাতেই নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে।

অধিক শর্ত ভীতির কারণ

এরপর তিনি এর কারণ বর্ণনা করেন যে- 'পিত্ত বা অম্লপ্রধান লোকেরা অধিক শর্তের কারণে ঘাবড়ে যায়।'

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির শারীরিক উপাদানে অম্ল বা পিত্তের ভাগ বেশি, তার উপরে যদি অধিক শর্ত আরোপ করা হয়, আর বলা হয় যে, এ কাজ এভাবে করো, এভাবে করো না এবং এ কাজ এভাবে করো না, বরং এভাবে করো, তাহলে এই বাধ্যবাধকতার ফলে তার মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হবে। ফলে পূর্বে যে কাজ সে যথেষ্ট পরিমাণ করছিলো, তাও ছেড়ে দিবে। তাই প্রথম পর্যায়ের লোকের উপর বেশি শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। বিশেষ করে তার মনের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে। যেমন বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে শতকরা একশ' ভাগ দুর্বলতা রয়েছে। এমতাবস্থায় অধিক শর্ত মানুষের পেরেশানীর কারণ হয়। এর ফলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই দুর্বল প্রকৃতির মানুষের উপর শর্ত কম আরোপ করা

উচিত। কারণ, শর্ত লাগানোর দ্বারা তার যে উপকার হতো, তা দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ইবাদত করার ফলে তার লাভ হবে- যেমন, তার উপর শর্ত লাগানো হলো যে, তুমি চোখ খোলা রেখেই নামায পড়বে। তাহলে এমতাবস্থায় চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার ফলে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের যে ফায়েদা লাভ হতো। তার দৈহিক দুর্বলতা তার ক্ষতিপূরণ করে দিবে। এ জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের উপর বেশি শর্ত আরোপ করার চিন্তা করা উচিত নয়। তাকে ধরে রেখে ইবাদতের দিকে নিয়ে আসো। যখন ইবাদত করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন শর্ত আরোপ করো।

মূলত প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের ছাড় দেয়া হয়, তাকে ঐ আমলের দিকে নিয়ে আসার জন্যে। ঐ সমস্ত আদব ও শর্তকে অস্বীকার করা বা সেগুলোর গুরুত্বকে বিলুপ্ত করা উদ্দেশ্য নয়। তারবিয়তকারীরা তা খুব ভালো বোঝেন।

একজন খান ছাহেবকে সুপথে আনার ঘটনা

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী রহ.-এর ঘটনা আছে যে, একবার তিনি একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ বিরান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মসজিদটি বিরান হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এটা আবাদ করো না কেন? লোকেরা বললো, এখানে একজন খান ছাহেব আছেন, তিনি এ এলাকার সর্দার। দ্বীনদারীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। না নামাযের সাথে সম্পর্ক আছে, না রোযার সাথে সম্পর্ক আছে। সব সময় মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। তার কাছে বাজারী নারীদের আনাগোনা রয়েছে। তার কারণে পুরা এলাকা খারাপ হয়ে গেছে। খান ছাহেব নামায পড়তে মসজিদে এলে এলাকার সবাই নামায পড়তে আরম্ভ করবে।

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. বললেন, আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও এবং তার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও! লোকেরা খান ছাহেবের বাড়ি দেখিয়ে দিলো। মাওলানা ছাহেব দাওয়াত দেয়ার জন্যে তার বাড়ি গেলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মাওলানা ছাহেব বললেন, 'ভাই খান

ছাহেব! মাশাআল্লাহ আপনি একজন মুসলমান। আপনাদের মহল্লার মসজিদটি বিরান হয়ে পড়ে আছে। আপনি যদি মসজিদে নামায পড়তে যান, তাহলে আপনাকে দেখে অন্যরাও মসজিদে আসবে। ফলে মসজিদ আবাদ হবে। এতে আপনার আমলনামায় অনেক নেকী জমা হবে। মাওলানা এমনভাবে দাওয়াত দিলেন যে, খান ছাহেবের উপর তাঁর কথার প্রভাব পড়লো। খান ছাহেব বললেন, আমি নামায পড়তে তৈরি আছি, কিন্তু আমার দ্বারা ওযু করা সম্ভব নয়। ওযু করার ক্ষমতা আমার নেই। দ্বিতীয় হলো- আমার দ্বারা মদ ছাড়া সম্ভব নয়। তৃতীয়- আমি নারীদের যাতায়াত বন্ধ করতে পারবো না। এমতাবস্থায় আমি কী করে নামায পড়বো। এ জন্যে আমি নামাযে যাই না। মাওলানা ছাহেব তো প্রথমে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, একে কী উত্তর দিবেন!

তারপর তিনি বললেন যে, আচ্ছা আপনি নামায পড়তে তৈরি আছেন কি না? খান ছাহেব বললো, হ্যাঁ আমি নামায পড়তে তৈরি আছি। কিন্তু আমি ওযু করতে পারবো না। মাওলানা ছাহেব বললেন, আচ্ছা আপনি ওযু ছাড়াই নামায পড়ুন। অন্যান্য বিষয়ও চলতে থাকবে। কোনো অসুবিধা নেই। খান ছাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওযু ছাড়া নামায পড়বো! মাওলানা ছাহেব বললেন, হ্যাঁ ওযু ছাড়াই নামায পড়বেন। তবে নামাযের জন্যে মসজিদে যাবেন। খান ছাহেব বললেন, এত সহজ বিষয় হলে ঠিক আছে, যাবো। মাওলানা ছাহেব বললেন, 'ওয়াদা করুন! নামাযের জন্যে আপনি মসজিদে যাবেন।' খান ছাহেব ওয়াদা করলেন, 'হ্যাঁ! আমি ওয়াদা করছি, নামায পড়তে মসজিদে যাবো।'

মাওলানা ছাহেব তার থেকে ওয়াদা তো নিলেন এবং ওযু ছাড়া নামায পড়তে অনুমতিও দিলেন, তবে তার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা ঐ মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দু' রাকআত নামায পড়লেন। নামাযের পর সিজদায় পড়ে খুব কাঁদলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতা এতোটুকুই ছিলো। সামনের কাজ আপনিই করে দিন।'

নামাযের সময় যখন হলো। তখন খান ছাহেবের মনে পড়লো, আমি তো ওয়াদা করেছি, তাই নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া উচিত। তিনি যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ঘর থেকে যখন বের হতে লাগলেন, তখন মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগলো যে, আজ তো প্রথমবার নামাযের জন্যে যাচ্ছি। যদিও মৌলবী ছাহেব বিনা ওযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এতদিন পর প্রথমবার নামায পড়তে যাচ্ছি। কমপক্ষে আজকে ওযু করে নিই। শুধু ওযু নয়, বরং আজ প্রথমদিন গোসল করে যাই। তারপর চাইলে ওযু ছাড়া পড়বো। সুতরাং তিনি গোসল করলেন। পাক-পরিষ্কার কাপড় পরলেন। সুগন্ধি লাগালেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গেলেন। যখন তিনি নামায পড়লেন, তখন তার মনের অবস্থাই পাল্টে গেল। নামায পড়ে ফিরে আসার পর আল্লাহ তা'আলা তার মনের মধ্যে মদ, নারী ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিলেন। তারপর থেকে খান ছাহেব এমন পাকা নামাযী হলেন যে, ওযুসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে আরম্ভ করলেন।

বিনা ওযুতে নামায পড়তে অনুমতিদানের উপর আপত্তি

নিরেট দুনিয়াবিরাগী এখানে আপত্তি করবে যে, মাওলানা ছাহেব খান ছাহেবকে বিনা ওযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ অনেক সময় বিনা ওযুতে নামায পড়া কুফরী পর্যন্ত পৌছে দেয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা এটা দেখে না যে, মাওলানা ছাহেব একদিকে তো খান ছাহেবকে বিনা ওযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন, অপরদিকে তিনি মসজিদে গিয়ে সিজদায় পড়ে কেঁদে কেটে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! এ পর্যন্ত তো আমি নিয়ে এসেছি, বাকিটা আপনার হাতে।

আসল ব্যাপার এই ছিলো যে, কোনো কোনো সময় প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের উপর থেকে শর্ত ও বাধ্যবাধকতা হটিয়ে দিলে তাকে সঠিক পথে আনার জন্যে তা উপকারী হয়। তবে এটা সবার কাজ নয় যে, আপনিও বিনা ওযুতে নামায পড়ার ফতওয়া দিয়ে দিবেন। বরং যেসব বান্দার কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা প্রভাব দান করেন,

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অন্তর্জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং বেদনা ও জ্বালা দান করেন, তাদের জন্যেই এমন কথা মুখ দিয়ে বলার হক রয়েছে। হাফেয শিরাযী রহ.-এর প্রসিদ্ধ কবিতা রয়েছে যে-

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر نبود ز راہ ورسم منزلہا

'খাঁটি পীর বললে মদ দ্বারা জায়নামাযকে রঙ্গিন করো।
অনভিজ্ঞ পথিক গন্তব্যের পথ-পন্থা সম্পর্কে অনবহিত।'

মানুষ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, 'জায়নামাযকে মদ দ্বারা রঙ্গিন করো'। এটা কীভাবে সম্ভব! কিন্তু এ কবিতা মূলত এ ধরনের ক্ষেত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

মোটকথা, প্রাথমিক পর্যায়ের লোক, যে মাত্র এ পথে এসেছে, তার উপর অধিক বাধ্যবাধকতা ও শর্ত লাগানোর জরুরত নেই। একইভাবে কোনো ব্যক্তি সবেমাত্র একাগ্রতা সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হয়েছে, মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে এবং একাগ্রতা সৃষ্টির জন্যে কোনো সময় চোখ বন্ধ করে নামায পড়তে চায়, তাহলে সে চোখ বন্ধ করেই নামায পড়তে থাকুক। এর অনুমতি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এমন ব্যক্তি যখন একাগ্রতার সাথে নামায পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন চোখ খোলা রেখেও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করতে থাকবে। তবে সর্বাবস্থায় সেটাকেই সুন্নাত এবং উত্তম মনে করতে হবে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমস্যা সমাধানে ও বিপদমোচনে সালাতুল হাজাত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهٗ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ، وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফকীহ সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি বর্ণনা করেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার নিকট বা কোনো মানুষের নিকট কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে, তার উচিত সুন্নাত মোতাবেক এবং আদব সহকারে উত্তমরূপে ওযু করবে। তারপর দু'রাকাত নামায পড়বে।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১০, পৃ. ২৬-৫৭

তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবে এবং এই দু'আ পাঠ করবে।[১]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهٗ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সালাতুল হাজাতে'র পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যখনই মানুষের কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে, কোনো অশান্তি সৃষ্টি হবে বা কোনো কাজ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন যেন সে 'সালাতুল হাজাত' পড়ে। উপরোক্ত দু'আ পাঠ করে। তারপর নিজ ভাষায় আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে আশা করা যায়, সে কাজের মধ্যে কল্যাণ থাকলে ইনশাআল্লাহ তা অবশ্যই সম্পন্ন হবে। প্রয়োজনের সময় 'সালাতুল হাজাত' পড়া এবং আল্লাহমুখী হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

এ হাদীসের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, মানুষের কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সে বাহ্যিক ও জাগতিক উপকরণসমূহ অবলম্বন করে থাকে এবং শরীয়তে এ ধরনের উপকরণ অবলম্বন করার অনুমতিও রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমান ও একজন কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একজন কাফের যখন পার্থিব বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করে, তখন সে ঐ উপকরণের উপরেই ভরসা করে। সে মনে করে, আমি যে উপকরণ অবলম্বন করেছি, তার মাধ্যমেই আমার কাজ হয়ে যাবে।

চাকুরির জন্যে চেষ্টা

যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তির উপার্জনের ব্যবস্থা নেই। সে ভালো একটি চাকুরির জন্যে চেষ্টা করছে। চাকুরি পাওয়ার একটি পদ্ধতি এই যে,

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৪৪১, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৩৭৪

চাকুরির খোঁজ করবে, সম্ভাব্য জায়গায় আবেদন করবে, জানাশোনা কেউ থাকলে তার মাধ্যমে সুপারিশ করাবে ইত্যাদি। এগুলো হলো বাহ্যিক উপকরণ। একজন কাফের এসব বাহ্যিক উপকরণের উপরেই পূর্ণ ভরসা করে থাকে। সে চেষ্টা করে, আবেদনপত্র সঠিকভাবে লেখে, ভালোভাবে সুপারিশ করায়, বাহ্যিক সমস্ত উপকরণ অবলম্বন করে; এখানেই শেষ। এসব উপকরণের উপরেই তার দৃষ্টি পুরোপুরি নিবদ্ধ থাকে এবং এর উপরই পূর্ণ ভরসা থাকে। এটা হলো কাফেরের কাজ।

মুসলমানের কাজ হলো, উপকরণ সেও অবলম্বন করে, দরখাস্ত দেয়, সুপারিশের প্রয়োজন হলে জায়েয পন্থায় সুপারিশ করায়, কিন্তু তার দৃষ্টি এসব উপকরণের উপর থাকে না। সে জানে এ দরখাস্ত কিছু করতে পারে না। এ সুপারিশ কিছু করতে পারে না। কোনো মাখলুকের ক্ষমতা ও এখতিয়ারে কিছু নেই। এসব উপকরণের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী হলেন মহান আল্লাহ। একজন মুসলমান সমস্ত উপকরণ অবলম্বন করার পর সেই সত্তার কাছেই প্রার্থনা করে- হে আল্লাহ! আপনি এ সমস্ত উপকরণ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি অবলম্বন করলাম। কিন্তু এগুলোর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী হলেন আপনি। আমি আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি- আপনি আমার আশা পুরা করুন।

অসুস্থ ব্যক্তির চেষ্টা

এক ব্যক্তি অসুস্থ হলো। এখন এর বাহ্যিক উপকরণ হলো, সে ডাক্তারের কাছে যাবে। ডাক্তার যেসব ঔষধ নির্বাচন করবে তা ব্যবহার করবে। যেসব ব্যবস্থার কথা বলবে সেগুলো অবলম্বন করবে। এগুলো হলো বাহ্যিক উপকরণ। একজন কাফের- আল্লাহ তা'আলার উপর যার ঈমান নেই- সে এসব ঔষধ ও ব্যবস্থার উপর ভরসা করবে। ভরসা করবে ডাক্তারের উপর। কিন্তু একজন মুমিনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তুমি ঔষধ ও ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমার ভরসা এসব ঔষধ ও ব্যবস্থার উপর হওয়া উচিত নয়। তোমার ভরসা হওয়া উচিত আল্লাহর উপর। আল্লাহ তা'আলা আরোগ্য দানকারী। তিনি যদি ঔষধ ও ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি না করেন- তাহলে এগুলোর মধ্যে কোনোই ক্ষমতা নেই। একই ঔষধ একই রোগে একজনের উপকার করছে, কিন্তু ঐ ঔষধই ঐ রোগে আরেকজনের

ক্ষতি করছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ঔষধের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা চাইলে মাটির পুরিয়ার মধ্যেও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন। আর যদি তিনি প্রভাব সৃষ্টি না করেন, তাহলে বড় থেকে বড় এবং দামী থেকে দামী ঔষধের মধ্যেও প্রভাব হবে না।

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা হলো, উপকরণ অবশ্যই গ্রহণ করবে, কিন্তু উপকরণের উপর ভরসা থাকবে না। ভরসা থাকতে হবে মহান আল্লাহর উপর। উপকরণ অবলম্বন করার পর দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমার সাধ্যের মধ্যে যতোটুকু ছিলো, যেসব বাহ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার ক্ষমতাভুক্ত ছিলো আমি তা করেছি। কিন্তু হে আল্লাহ! এসব ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী আপনি। এসব ব্যবস্থাকে সফলতা দানকারী আপনি। আপনিই এর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করুন। আপনিই এগুলোকে সফলতা দান করুন।

চেষ্টার সাথে দু'আ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'আর একটি বিস্ময়কর ও অপূর্ব বাক্য বর্ণিত আছে। যখনই তিনি কোনো কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন- সে ব্যবস্থা দু'আই হোক না কেন- তারপর বলতেন-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ

'হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতায় যা ছিলো, তা আমি অবলম্বন করেছি, কিন্তু ভরসা আপনার উপর। আপনিই দয়া করে আমার উদ্দেশ্য পুরা করুন।'[১]

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন

এ কথাটিকেই আমাদের শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী রহ. এভাবে বলতেন যে, দ্বীন মূলত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম। দৃষ্টিভঙ্গি একটু পরিবর্তন করো। তাহলেই দ্বীন হয়ে গেল। যদি তা না করো তাহলেই দুনিয়া। যেমন- প্রত্যেক ধর্মই বলে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করো। ইসলামের শিক্ষা এই যে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করো। তবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, চিকিৎসা অবশ্যই করবে, কিন্তু তার উপর ভরসা করবে না। ভরসা করবে আল্লাহ তাআলার উপর।

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৪১

ব্যবস্থাপত্রের উপর 'হুয়াশ শাফী' লেখা

এ কারণেই আগের যুগের মুসলমান চিকিৎসকগণের নিয়ম ছিলো, যখন তারা কোনো রোগীর ব্যবস্থাপত্র লিখতেন, তখন সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপত্রের উপর هُوَ الشَّافِيْ (হুয়াশ শাফী) লিখতেন। অর্থাৎ রোগ আরোগ্যকারী হলেন আল্লাহ। 'হুয়াশ শাফী' লেখা ছিলো ইসলামী রীতি। সে যুগে মানুষের চলাফেরায় ও কাজকর্মে ইসলামী মানসিকতা, ইসলামী বিশ্বাস ও ইসলামী শিক্ষার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠতো। একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করছেন- কিন্তু ব্যবস্থাপত্র লেখার পূর্বে তিনি 'হুয়াশ শাফী' লিখছেন। এটা লিখে তিনি এ কথা ঘোষণা করছেন যে, আমি রোগীর ব্যবস্থাপত্র তো লিখছি, কিন্তু এ ব্যবস্থাপত্র ততোক্ষণ পর্যন্ত কাজে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আরোগ্যকারী আল্লাহ্ আরোগ্য দান না করবেন। একজন ঈমানদার চিকিৎসক প্রথম ধাপেই এ কথা স্বীকার করতেন। 'হুয়াশ শাফী' স্বীকার করে যখন তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখতেন, তখন সেই ব্যবস্থাপত্র লেখাও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বন্দেগী বলে পরিগণিত হতো।

পশ্চিমা সভ্যতার অভিশাপ

কিন্তু যখন থেকে আমাদের উপরে পশ্চিমা সভ্যতার লানত সওয়ার হলো, তখন থেকে তা আমাদের ইসলামী নিদর্শনসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়লো। বর্তমানের ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র লেখার সময় না 'বিসমিল্লাহ' লেখার প্রয়োজন পড়ে, না 'হুয়াশ শাফী' লেখার। রোগী দেখেই তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখতে আরম্ভ করেন। আল্লাহমুখী হওয়ার কোনো প্রয়োজন তার হয় না। এর কারণ কী? কারণ হলো, এ চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের নিকট এমন কাফেরদের মাধ্যমে পৌছেছে, যাদের মস্তিষ্কে আল্লাহ তা'আলা আরোগ্যকারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। তাদের যাবতীয় ভরসা ও আস্থা কেবল উপকরণ ও চেষ্টার মধ্যেই নিবদ্ধ। এ কারণে তারা ব্যবস্থাই গ্রহণ করে থাকে।

ইসলামী নিদর্শনাবলীর সংরক্ষণ

আল্লাহ্ তা'আলা বিজ্ঞান শিখতে নিষেধ করেননি। বিজ্ঞান কোনো জাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো জাতি বা ধর্মের উত্তরাধিকার নয়। মুসলমানও অবশ্যই বিজ্ঞান শিখবে। কিন্তু ইসলামের

নিদর্শনাবলী তো তাদের সংরক্ষণ করতে হবে। নিজেদের দ্বীন-ঈমান তো হেফাজত করতে হবে। নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের আলোকে তো বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। এমন তো নয় যে, একজন ডাক্তার হয়ে গেলে তার জন্যে 'হুয়াশ শাফী' লেখা হারাম হয়ে যাবে। এখন তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আরোগ্যকারী হওয়ার বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়া নাজায়েয হয়ে যাবে। এখন সে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে যে, আমি যদি ব্যবস্থাপত্রের উপর 'হুয়াশ শাফী' লিখি তাহলে মানুষ মনে করবে, সে পশ্চাদপদ, সেকেলে। এরূপ লেখা চিকিৎসার মূলনীতির পরিপন্থী। আরে ভাই! তুমি যদি ডাক্তার হয়ে থাকো তবে তুমি একজন মুসলমান ডাক্তার। আল্লাহর প্রতি তোমার ঈমান রয়েছে। তাই তুমি আগে এ কথার ঘোষণা দাও যে, আমরা যা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, আল্লাহ তা'আলা প্রভাব সৃষ্টি না করলে এসব বেকার। এর দ্বারা কোনো উপকার হবে না।

ব্যবস্থার পরিপন্থী কাজের নাম 'ঘটনাচক্র'

বড় বড় ডাক্তার, চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপত্রদানকারী ব্যক্তিগণ প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ফয়সালা প্রত্যক্ষ করেন। তখন বলেন, আমরা তো এক ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলাম, কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেল যে, আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাহ্যিক সব নীতিই ব্যর্থ হয়ে গেল। তারা অকপটে এ কথা স্বীকার করেন। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাহ্যিক ব্যবস্থার বিপরীত আকস্মিক এ অবস্থাকে তারা 'ঘটনাচক্র' নাম দিয়েছেন। বলেন যে, 'ঘটনাচক্রে' এমন হয়ে গেছে।

কোনো কিছুই 'ঘটনাচক্রে' হয় না

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন- বর্তমান বিশ্বের মানুষ যাকে 'ঘটনাচক্র' নাম দিয়েছে এবং বলে থাকে যে, 'ঘটনাচক্রে' এমনটি হয়েছে, এসব ভুল। কারণ, এ বিশ্বজগতে কোনো কিছুই ঘটনাচক্রে হয় না। বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা, ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনার অধীনে হয়ে থাকে। যখন কোনো কাজের কারণ ও রহস্য আমাদের বুঝে না আসে, তখন আমরা বলি, 'ঘটনাচক্রে' এমন হয়েছে। আরে! যিনি এই বিশ্বজগতের মালিক ও স্রষ্টা তিনিই এ পুরো ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

পরিপূর্ণ ও সুসংহত ব্যবস্থাপনার অধীনেই সবকিছু হচ্ছে। একটি অণুও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না। এ কারণে সোজা কথা হলো, এ ঔষধের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো প্রভাব নেই। যখন আল্লাহ তা'আলা ঔষধের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেন, তখন উপকার হয়। আর যখন প্রভাব সৃষ্টি করেন না, তখন কোনো উপকার হয়না। এটাই হলো সহজ-সরল কথা। 'ঘটনাচক্র' বলে কিছু নেই।

সবসময় উপকরণের স্রষ্টার উপর দৃষ্টি রাখতে হবে

মানুষকে এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। চেষ্টা ও উপকরণের উপর যেন ভরসা না থাকে। ভরসা থাকবে উপকরণের যিনি স্রষ্টা তাঁর উপর। সবকিছু তিনিই করেন। আল্লাহ তা'আলা শুধু ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতিই দেননি, বরং তার নির্দেশ দিয়েছেন যে, উপকরণ অবলম্বন করো। কারণ, আমিই এসব উপকরণ তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা করা হবে যে, তোমাদের দৃষ্টি এই উপকরণের মধ্যেই আটকে থাকে, না কি এগুলোর স্রষ্টার উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এ বিশ্বাস এমনভাবে বদ্ধমূল করেছিলেন যে, তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা উপকরণের স্রষ্টার উপর নিবদ্ধ থাকতো। তাঁরা শুধু এ কারণে উপকরণ অবলম্বন করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশ দিয়েছেন। যখন আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি হয়, তখন তিনি বান্দাকে কুদরতের বিরল-বিস্ময়কর কারিশমা দেখিয়ে থাকেন।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর বিষ পানের ঘটনা

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. একবার সিরিয়ার একটি দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের অবরুদ্ধ লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে সন্ধি-চুক্তির ইচ্ছা পোষণ করে। তারা দুর্গ-প্রধানকে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর নিকট সন্ধির কথাবার্তা বলার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। তাদের সর্দার হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর কাছে আসে। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. দেখলেন তার হাতে ছোট একটি শিশি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- এই শিশিতে কী আছে? এটা কেন এনেছো? সে উত্তর দিলো- শিশির মধ্যে বিষ রয়েছে। আমি চিন্তা করে এসেছি, সন্ধি হলে তো ভালো, আর

যদি ব্যর্থ হই, তাহলে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে নিজের জাতির কাছে ফিরে যাবো না। বিষপান করে আত্মহত্যা করবো।

সমস্ত সাহাবীর আসল কাজ তো ছিলো মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া। তাই হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. চিন্তা করলেন- তাকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার এখন সুবর্ণ সুযোগ। তিনি সরদারকে বললেন- তোমার কি এ বিষের ব্যাপারে আস্থা রয়েছে যে, এটা পান করতেই তোমার মৃত্যু ঘটবে? সর্দার উত্তর দিলো- হ্যাঁ আমার সে আস্থা রয়েছে। কারণ, এটা এমন মারাত্মক বিষ যে, এর সম্পর্কে চিকিৎসকদের মন্তব্য হলো, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ এ বিষের স্বাদ কী তা বলতে পারেনি। কারণ, এ বিষ খাওয়ামাত্রই মৃত্যু ঘটে। সে এর স্বাদ বর্ণনার সুযোগই পায় না। তাই আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, এটা পান করার সাথে সাথে আমি মারা যাবো।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. সর্দারকে বললেন- বিষের শিশিটি- যার উপর তোমার এত আস্থা- আমাকে একটু দাও। সে শিশিটি তাঁকে দিলো। তিনি শিশি হাতে নিলেন। তারপর বললেন- পৃথিবীর কোনো কিছুর মধ্যেই কোনো প্রভাব নেই। যদি না আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেন। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে এই দু'আ পড়ছি-

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'সেই আল্লাহর নামে, যাঁর নাম যুক্ত হলে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

আমি বিষ পান করছি। আপনি দেখুন আমার মৃত্যু হয় কি না। সর্দার বললো- জনাব, আপনি নিজের উপর অবিচার করছেন। এ বিষ এত মারাত্মক যে, সামান্য একটু বিষও কেউ মুখে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ আপনি পুরো শিশিই পান করতে চাচ্ছেন। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. বললেন- 'ইনশাআল্লাহ আমার কিছু হবে না।' তিনি দু'আ পড়ে পুরো শিশি পান করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের কারিশমা দেখালেন। সর্দার স্বচক্ষে দেখলো- হযরত খালিদ

ইবনে ওলীদ রাযি. পুরো শিশি পান করলেন, কিন্তু মৃত্যুর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। এ কারিশমা দেখে সর্দার মুসলমান হয়ে গেল।

সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর রয়েছে

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিলো যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে, তা সব আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটি অণুও নড়তে পারে না। এ বিশ্বাস তাঁদের অন্তরে এভাবে গেঁথে গিয়েছিলো যে, সমস্ত উপকরণ তাদের দৃষ্টিতে নিষ্প্রাণ ছিলো। যখন মানুষ এমন ঈমান ও ইয়াকীন নিয়ে কাজ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা কুদরতের কারিশমাও দেখিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো- তোমরা উপকরণের উপর যতো বেশি ভরসা করবে, তিনি তোমাদেরকে ততো বেশি উপকরণের সাথে বেঁধে দেবেন। আর তাঁর মহান সত্তার উপর যতো বেশি ভরসা করবে, ততো বেশি তিনি তোমাদেরকে উপকরণ থেকে অমুখাপেক্ষী করে নিজের কুদরতের কারিশমা দেখাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে পদে পদে এটা চোখে পড়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের একটি ঘটনা

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। পথে এক জায়গায় তিনি অবস্থান করেন। সেখানে বিশ্রাম করার উদ্দেশ্যে একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়েন। তাঁর নিকট কোনো দেহরক্ষী বা পাহারাদার ছিলো না। একজন কাফের তাঁকে একাকী দেখতে পেয়ে তরবারী কোষমুক্ত করে একেবারে মাথার উপর এসে দাঁড়ায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ খুলে দেখলেন, ঐ কাফেরের হাতে তরবারী রয়েছে, আর তিনি নিঃসঙ্গ ও নিরস্ত্র। কাফের লোকটি বলছে- হে মুহাম্মাদ! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? লোকটি মনে করেছিলো, তিনি যখন দেখবেন, তার হাতে তরবারী, আর তিনি নিরস্ত্র, অতর্কিতভাবে লোকটি মাথার উপর এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তিনি ঘাবড়ে যাবেন। পেরেশান হবেন। কিন্তু তাঁর পবিত্র চেহারায় অস্থিরতার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি

শান্তভাবে উত্তর দিলেন- আল্লাহ তা'আলা আমাকে রক্ষা করবেন। লোকটি যখন দেখলো যে, তাঁর চেহারায় ভয় ও অস্থিরতার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, তার ফলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন ভীতির সঞ্চার করলেন যে, তার হাত কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং তরবারী হাত থেকে পড়ে গেল। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে তরবারী নিজ হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন- এবার বলো, তোমাকে কে রক্ষা করবে?[১]

এ ঘটনা দ্বারা লোকটিকে দাওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য ছিলো যে, মূলত তুমি এ তরবারীর উপর ভরসা করছিলে, আর আমি ভরসা করছিলাম তরবারীর স্রষ্টার উপর। আমি সেই সত্তার উপর ভরসা করছিলাম, যিনি তরবারীর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ আদর্শ পেশ করেছিলেন। যার ফলে প্রত্যেক সাহাবী উপকরণও অবলম্বন করতেন, একই সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্তার উপরও ভরসা রাখতেন।

প্রথমে উপকরণ, তারপর ভরসা

একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ময়দানে উট নিয়ে যাই। সেখানে নামাযের সময় হয়। যখন নামাযের সময় হয়, তখন ময়দানের মধ্যে নামাযের নিয়ত করার সময় উটের পা কোনো গাছের সাথে বেঁধে নামায পড়বো, নাকি উট ছেড়ে রাখবো এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবো? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

اِعْقِلْ سَاقَهَا وَتَوَكَّلْ

'উটের পা রশি দিয়ে বাঁধো, তারপর আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করো। রশির উপর নয়।'[২]

কারণ, রশি ছিঁড়েও যেতে পারে এবং ধোঁকাও দিতে পারে।

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৪, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯১, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৩৮১৬

২. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৪১

এ হাদীসেরই বিষয়বস্তুকে মাওলানা রূমী রহ. একটি পংক্তির মধ্যে বর্ণনা করেছেন-

به توکل پایۂ اشتر بہند

'তাওয়াক্কুল করে উটের পা বাঁধো।'

কারণ, তাওয়াক্কুল করা ও উপকরণ অবলম্বন করা এ উভয় বিষয় একজন মুমিনের জীবনে সমান্তরালে চলে। প্রথমে উপকরণ অবলম্বন করবে, তারপর আল্লাহ তা'আলাকে বলবে-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ

'হে আল্লাহ! যে চেষ্টা-তদ্‌বীর আমার এখতিয়ারে ছিলো, তা আমি গ্রহণ করেছি। এখন আপনার উপরই আমার ভরসা।'[২]

উপকরণ নিশ্চিত হলেও আল্লাহর উপর ভরসা করুন

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একটি সূক্ষ্ম কথা স্মরণ হলো। তিনি বলেন- মানুষ মনে করে যে, কেবল ঐ অবস্থায় তাওয়াক্কুল করতে হয়, যখন বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা কাজ হওয়া বা না হওয়ার উভয়মুখী সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনো কাজ হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়া এবং তাঁর উপর ভরসা করার বেশি প্রয়োজন নেই। সেটা তাওয়াক্কুল করার ক্ষেত্র নয় এবং দু'আ করারও জায়গা নয়।

যেমন, আমি দস্তরখানে খানা খেতে বসেছি। সামনে খানা সাজানো রয়েছে। ক্ষুধাও রয়েছে। এখন নিশ্চিত যে, আমি খানা উঠিয়ে খেয়ে নেবো। এমন সময় কেউই তাওয়াক্কুল করে না এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করে না যে, হে আল্লাহ! আমাকে এ খানা খাইয়ে দিন। এমন সময় কেউ তাওয়াক্কুল ও দু'আ করার প্রয়োজনও অনুভব করে না।

তাওয়াক্কুলের আসল ক্ষেত্রই এটা

হযরত থানভী রহ. বলেন- তাওয়াক্কুলের আসল ক্ষেত্রই তো এটা। আল্লাহর কাছে চাওয়ার উপযুক্ত সময়ই তো এটা। কারণ, এ সময় যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে চায় তাহলে তার অর্থ হবে, আমার সম্মুখস্থ

২. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৪১

এ সমস্ত বাহ্যিক উপকরণের উপর ভরসা নেই। আমার ভরসা হলো আপনার রিযিক দেয়ার উপর এবং আপনার সৃষ্টি কর্মের উপর। আপনার কুদরত ও রহমতের উপর। তাই যখন দস্তরখানে খানা চলে আসবে, তখনও আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করো যে, হে আল্লাহ! নিরাপদে এ খানা খাইয়ে দিন। কারণ, যদিও প্রবল ধারণা এই যে, খানা তো সামনেই আছে, শুধু হাত বাড়িয়ে খাওয়ার দেরি মাত্র। কিন্তু এ কথা ভুলো না যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এ খানাও খাওয়া হবে না। কতো ঘটনা এমন দেখা গেছে- দস্তরখানায় খাবার সাজানো রয়েছে, শুধু হাত বাড়ানো বাকী, কিন্তু এমন কোনো পেরেশানী দেখা দিয়েছে, কিংবা এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে যে, মানুষ সে খানা আর খেতে পারেনি। তা এমনিই রয়ে গেছে। তাই খানা সামনে থাকলে তখনও আল্লাহ তা'আলার কাছে চাও- হে আল্লাহ! এ খানা আমাকে খাইয়ে দিন।

সারকথা এই যে, যে জায়গায় তোমার নিশ্চিত জানা আছে যে, এ কাজ হবে, সেখানেও আল্লাহ তা'আলার কাছেই চাও যে- হে আল্লাহ! আমি তো বাহ্যিকভাবে দেখছি এ কাজ হবে। কিন্তু আমি জানি না প্রকৃতপক্ষেই তা হবে কি না। কারণ, আসলে তো তা আপনার কুদরতের হাতে নিয়ন্ত্রিত। হে আল্লাহ! এ কাজকে আপনি ঠিকভাবে পরিপূর্ণতা দান করুন।

উভয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইবে

যে হাদীস আমি শুরুতে বর্ণনা করেছি, তাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি শব্দ ইরশাদ করেছেন। তা হলো, তোমার প্রয়োজন হয় আল্লাহর কাছে দেখা দিবে, না হয় মানুষের কাছে দেখা দিবে। এ দু'টি শব্দ এ জন্যে ইরশাদ করেছেন যে, কতক কাজ এমন হয়ে থাকে, যার মধ্যে মানুষের সাহায্য ও ভূমিকার কোনো পথই থাকে না। বরং তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দান হয়ে থাকে। যেমন, কারো সন্তান লাভের বাসনা রয়েছে। এখন বাহ্যিক উপকরণ হিসেবেও কোনো মানুষের নিকট সন্তান চাওয়া যেতে পারে না। বরং আল্লাহ তা'আলার কাছেই তা চাওয়া যেতে পারে। মোটকথা, সে চাহিদা এবং প্রয়োজন এমন হোক, যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন, কিংবা এমন

হোক, যা মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। যেমন চাকুরি, জীবিকা ইত্যাদি। উভয় অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটেই তোমার চাওয়া উচিত।

ধীরস্থিরভাবে ওযু করবে

মোটকথা, তোমার কাছে যদি সময়-সুযোগ থাকে এবং সে কাজ অতি তাড়াতাড়ি ও তাৎক্ষণিক না হয়, তাহলে তার জন্যে প্রথমে 'সালাতুল হাজাত' পড়ো। 'সালাতুল হাজাত' পড়ার পদ্ধতি এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে- সর্ব প্রথম ওযু করো এবং উত্তমভাবে ওযু করো। অর্থাৎ শুধু ফরয আদায়ের জন্যে কোনোমতে ওযু কোরো না। বরং এ কথা মনে করে ওযু করো যে, ওযু মূলত একটি মহিমান্বিত ইবাদতের পূর্ব প্রস্তুতি। এ ওযুর কিছু আদব ও সুন্নাত রয়েছে, যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলোর প্রতি যত্ন নিয়ে ওযু করো। আমরা দিন-রাত উদাসীনভাবে তাড়াতাড়ি ওযু করে থাকি। নিঃসন্দেহে এভাবে ওযু করার দ্বারাও ওযু হয়ে যায়, কিন্তু সে ওযুর নূর ও বরকত লাভ হয় না।

ওযু দ্বারা গোনাহ ধুয়ে যায়

একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- মানুষ যখন ওযু করে এবং চেহারা ধোয়, তখন চেহারার সমস্ত গোনাহ ঐ পানির সাথে ধুয়ে যায়। যখন ডান হাত ধোয়, তখন ডান হাতের যাবতীয় গোনাহ ধুয়ে যায়। অনুরূপ যখন বাম হাত ধোয়, তখন বাম হাতের যাবতীয় গোনাহ ধুয়ে যায়। এভাবে যে সমস্ত অঙ্গ ধোয়, সেগুলোর সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়।[১]

আমার শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব বলতেন- যখন ওযু করো, তখন একটু চিন্তা করো যে, আমি চেহারা ধুচ্ছি, তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুসংবাদ মোতাবেক আমার চেহারার গোনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। এখন হাত ধুচ্ছি, তো হাতের গোনাহ ধুয়ে

---

১. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬০, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং৭৬৭৭, মুওয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ৫৬

যাচ্ছে। একই চিন্তার সাথে মাথা মাসাহ করো এবং পা ধোও। এ চিন্তাসহ যে ওযু করা হবে এবং এ চিন্তা ছাড়া যে ওযু করা হবে, এতোদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য দেখা দিবে। এ ওযুর অপার্থিব এক স্বাদ অনুভূত হবে।

ওযুর মাঝের দু'আসমূহ

মোটকথা, একটু মনোযোগ দিয়ে ওযু করবে। ওযুর যে সমস্ত আদব ও সুন্নাত রয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। যেমন, কেবলামুখী হয়ে বসবে। প্রত্যেকটি অঙ্গ ধীরস্থিরভাবে তিন-তিনবার করে ধোবে। ওযুর মাসনূন দু'আগুলো পাঠ করবে। যেমন এ দু'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ[১]

কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে-

أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ[২]

ওযুর পরে এই দু'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ[৩]

ভালোভাবে ওযু করার অর্থ এটাই।

সালাতুল হাজতের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই

তারপর সালাতুল হাজতের নিয়তে দুই রাকআত নামায পড়বে। সালাতুল হাজতের ভিন্ন কোনো পদ্ধতি নেই। অন্যান্য নামায যেভাবে পড়া হয়, এ দু'রাকআতও সেভাবেই পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সালাতুল হাজাত পড়ার বিশেষ পদ্ধতি আছে। মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে এর বিশেষ বিশেষ নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ এর জন্যে বিশেষ বিশেষ সূরাও নির্ধারণ করেছে। প্রথম রাকআতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাকআতে অমুক সূরা পড়বে ইত্যাদি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২২, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৬০০৪
২. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৫০, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৪৮, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪৬৩
৩. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৫০

ওয়াসাল্লাম সালাতুল হাজাত পড়ার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে ভিন্ন কোনো পদ্ধতি বর্ণনা করেননি। কোনো সূরাও নির্ধারণ করেননি।

তবে কতক বুযুর্গের অভিজ্ঞতা হলো, সালাতুল হাজতের মধ্যে অমুক অমুক সূরা পড়া হলে অনেক সময় বেশি ফল লাভ হয়। তাই এটাকে সুন্নাত মনে করে অবলম্বন করবে না। কারণ, সুন্নাত মনে করে অবলম্বন করলে বিদ'আত হয়ে যাবে। আমার শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব বলতেন- 'যখন সালাতুল হাজাত পড়বে, তখন প্রথম রাকআতে সূরা 'আলাম নাশরাহ' এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'নাস্‌র' পড়বে। কিন্তু এ কথার অর্থ হলো, এ সব সূরা পড়ার দ্বারা অধিক ফল লাভ হয়। তাই কেউ যদি সুন্নাত মনে না করে এ সূরাগুলো পড়ে তাহলেও ঠিক আছে। আর যদি অন্য কোনো সূরা পড়ে তাহলেও সুন্নাতের পরিপন্থী হবে না। মোটকথা, সালাতুল হাজাত পড়ার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই। অন্যান্য নামায যেভাবে পড়া হয়, একইভাবে সালাতুল হাজতের দুই রাকআত নামায পড়বে। নামায শুরু করার আগে মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, আমি সালাতুল হাজাত স্বরূপ এই দুই রাকআত নামায পড়ছি।

নামাযের জন্যে নিয়ত কীভাবে করবে

এখানে এ কথাও বলে দেই যে, আজকাল মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক নামাযের নিয়তের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রয়েছে। এসব শব্দ না বলা পর্যন্ত নামায হয় না। এ কারণে মানুষ বারবার জিজ্ঞাসাও করে থাকে যে, অমুক অমুক নামাযের নিয়ত কীভাবে করতে হয়। মানুষ নিয়তের শব্দাবলীকে নামাযের অংশ বানিয়ে নিয়েছে। যেমন- এ ভাবে নিয়ত করে- 'আমি দু'রাকাত নামাযের নিয়ত করছি, এই ইমামের পিছনে আল্লাহর জন্যে, কেবলামুখী হয়ে' ইত্যাদি ইত্যাদি। খুব ভালো করে বুঝুন! নিয়ত এ সব শব্দের নাম নয়। বরং নিয়ত তো অন্তরের ইচ্ছার নাম। আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যখন মনে মনে ইচ্ছা করলেন যে, আমি যোহরের নামায পড়তে যাচ্ছি, তাতেই নিয়ত হয়ে গেছে। আমি জানাযার নামায পড়তে যাচ্ছি, তাতেই নিয়ত হয়ে গেছে। আমি ঈদের নামায পড়তে যাচ্ছি, তাতেই নিয়ত হয়ে গেছে। আমি সালাতুল হাজাত পড়তে যাচ্ছি, তাতেই নিয়ত হয়ে গেছে। এ সব শব্দ

মুখে বলা ওয়াজিবও নয়, জরুরীও নয়, সুন্নাতও নয়, মুস্তাহাবও নয়। বেশির চেয়ে বেশি জায়েয। এর অতিরিক্ত কিছু নয়। তাই সালাতুল হাজাত পড়ার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই এবং তার নিয়তেরও নির্ধারিত কোনো শব্দমালা নেই। অন্যান্য নামাযের মতো দু'রাকআত নামায পড়বে।

দু'আর পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করবে

দুই রাকআত নামায পড়ে এবার দু'আ করবে। দু'আ কীভাবে করবে, তার আদবও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। এরূপ নয় যে, সালাম ফিরিয়েই দু'আ করতে আরম্ভ করে দিবে, বরং সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে। এভাবে বলবে, হে আল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা আপনার, শোকর আপনার, দয়া আপনার।

প্রশংসার প্রয়োজন কী?

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হবে কেন? এর প্রয়োজন কী? এর একটি কারণ তো উলামায়ে কেরাম এই বলেছেন যে, মানুষ যখন দুনিয়ার কোনো শাসকের কাছে নিজের প্রয়োজন নিয়ে যায়, তখন প্রথমে তার সম্মান ও শ্রদ্ধামূলক কিছু কথা বলে। যাতে তিনি খুশি হয়ে আমার বাসনা পূরণ করেন। তাই দুনিয়ার সাধারণ একজন শাসকের সামনে দাঁড়াতে যখন তার স্তুতিমূলক কথা বলো, তাহলে যখন তুমি আহকামুল হাকিমীনের দরবারে যাচ্ছো, তখন তাঁর জন্যেও স্তুতিমূলক কথা বলো যে, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার। শোকর ও এহসান আপনার। আপনি আমার এ প্রয়োজন পুরা করে দিন।

দু'আর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার আরেকটি কারণও আছে, যা আমার কাছে অধিকতর রুচিসম্মত মনে হয়। তা এই যে, মানুষ হলো নিজের প্রয়োজনের গোলাম, স্বার্থের দাস। যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ঐ প্রয়োজনই তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই সে যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে- হে আল্লাহ! আমার অমুক প্রয়োজন পুরো করে দিন। তখন দু'আর মধ্যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে যে, আল্লাহ আমার প্রয়োজন পুরো করছেন না। আমার ঠেকা উদ্ধার করছেন না। অথচ মানুষের উপর বৃষ্টির মতো আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত নেয়ামত বর্ষণ হয়, দু'আর সময় সেগুলোর

দিকে মানুষের মনোযোগ যায় না। সে কেবল নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থের কথা চিন্তা করে।

মোটকথা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিচ্ছেন, যখন তুমি আল্লাহর দরবারে কোনো প্রয়োজন ও সমস্যার কথা তুলে ধরবে, তখন আল্লাহর কাছে সে প্রয়োজনের জন্যে দু'আ তো অবশ্যই করবে, তবে তার আগে এ কথা চিন্তা করে নাও যে, এ প্রয়োজন ও ঠেকা যদিও এখনো পুরো হয়নি, তবে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অগণিত নেয়ামত আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে। আগে তার শোকর আদায় করো যে, হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে আমাকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন, এ জন্যে আমি আপনার শোকর আদায় করছি, আপনার প্রশংসা করছি এবং আপনার গুণকীর্তন করছি। তবে আরেকটি প্রয়োজন রয়েছে, হে আল্লাহ! অনুগ্রহ করে আপনি সেটাও পুরো করে দিন।

যাতে মানুষের দু'আর মধ্যে অকৃতজ্ঞতার আভাস না পাওয়া যায়।

দুঃখ-কষ্টও নেয়ামত

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এক বৈঠকে এ বিষয়বস্তুর উপর বয়ান করছিলেন যে, মানুষের জীবনে যে সব দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা আসে, মানুষ যদি ভালো করে চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে, এ সব দুঃখ-কষ্টও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। রোগ-ব্যাধিও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। অভাব-উপবাসও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। মানুষের প্রকৃত দৃষ্টি লাভ হলে বুঝতে পারবে যে, এ সব জিনিসও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত।

এখন প্রশ্ন হলো, এসব জিনিস নেয়ামত হলো কী করে? তার উত্তর এই যে, আখেরাতে যখন আল্লাহ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে অফুরন্ত পুরস্কার দান করবেন, তখন দুনিয়ায় যে সব লোকের উপর দিয়ে বেশি কষ্ট ও বিপদ যায়নি, তারা আশা করবে- হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটা হতো আর আমরা ধৈর্য ধারণ করতাম![1]

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ৩০৩, হাদীস নং ৬৬৬০, আমু'জামুল কাবীর লিত তবরানী, খণ্ডঃ ৮, পৃ. ৬৬, হাদীস নং ৮৬৮৯, আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৪২৭

সে ধৈর্যের ফলে আমরাও তেমন সওয়াব পেতাম যেমন আজ এ সব ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তিরা পাচ্ছে। মোটকথা, এ সব কষ্টও প্রকৃতপক্ষে নেয়ামত। কিন্তু যেহেতু আমরা দুর্বল, এ কারণে এগুলো নেয়ামত হওয়ার কথা আমাদের স্মরণ থাকে না।

হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর বিস্ময়কর দু'আ

হযরত হাজী ছাহেব রহ. যখন এ বিষয়বস্তুর উপর বয়ান করছিলেন, ঠিক তখনই সে মজলিসে রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত এক মাজুর ব্যক্তি আসে। সে হযরত হাজী ছাহেবের কাছে বলতে লাগলো, হযরত আমার জন্যে দু'আ করুন , আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এ সব কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। হযরত থানভী রহ. বলেন- আমরা যারা মজলিসে হাজির ছিলাম, আমরা তো অবাক যে, হযরত এখন কীভাবে দু'আ করবেন! কারণ, হযরত বয়ান করছিলেন যে, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ নেয়ামত, আর এ ব্যক্তি কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে দু'আ চাচ্ছে। এখন যদি হাজী ছাহেব কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে দু'আ করেন, তার অর্থ হবে তিনি নেয়ামত দূর হওয়ার জন্যে দু'আ করছেন। হযরত হাজী ছাহেব তখনই হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন- হে আল্লাহ! প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কষ্ট ও মুসিবত নেয়ামত। কিন্তু হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল। আপনি আমাদের দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে এ কষ্টের নেয়ামতকে সুস্থতার নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

কষ্টের সময় অন্যান্য নেয়ামতের কথা স্মরণ করা

ঠিক কষ্টের সময় মানুষের উপর যেই অসংখ্য নেয়ামত বিরাজমান থাকে, মানুষ সেগুলো ভুলে যায়। যেমন কারো পেটব্যথা হচ্ছে, তখন সে ঐ পেটব্যথা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে দেখে না যে, চোখের মতো যে বিরাট নেয়ামত সে লাভ করেছে, তাতে তো কোনো কষ্ট নেই। জিহ্বায় কোনো কষ্ট নেই। দাঁতে কোনো কষ্ট নেই। পুরো দেহের অন্য কোথাও কষ্ট নেই। শুধুমাত্র পেটের মধ্যে সামান্য কষ্ট হচ্ছে। তখন এ দু'আ তো অবশ্যই করবে যে, পেটের কষ্ট দূর করে দিন। কিন্তু দু'আ করার পূর্বে এসব নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ তা'আলার শোকরও আদায়

করবে যে, হে আল্লাহ! আপনি যে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, সে জন্যে আমি আপনার শোকর আদায় করছি। কিন্তু এখন এই কষ্ট দেখা দিয়েছে, তাই আমি আবেদন করছি, এ কষ্ট আপনি দূর করে দিন।

হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর নেয়ামতের শোকর

হযরত মিয়াঁ আসগর হুসাইন ছাহেব রহ. আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর উস্তায ছিলেন। তিনি জন্মগত আল্লাহর ওলী ছিলেন। অসাধারণ বুযুর্গ ছিলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাঁর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি জানতে পারলাম, হযরত মিয়াঁ ছাহেব অসুস্থ। তাঁর জ্বর হয়েছে। আমি তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্যে গেলাম। আমি দেখলাম, তীব্র জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছে। কষ্ট ও অশান্তিতে অস্থির হয়ে আছেন। আমি গিয়ে সালাম দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম- হযরত, কেমন আছেন? কেমন লাগছে? উত্তরে তিনি বললেন- 'আলহামদুলিল্লাহ! আমার চোখ ঠিকমতো কাজ করছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমার কান ঠিক মতো কাজ করছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমার জিহ্বা ঠিকমতো কাজ করছে। যেগুলোতে কোনো কষ্ট ছিলো না সেগুলোর কথা একটা একটা করে উল্লেখ করে বললেন- এগুলোতে কোনো রোগ নেই। তবে জ্বর হয়েছে। দু'আ করো আল্লাহ তা'আলা যেন তা ভালো করে দেন।

এ হলো একজন শোকরগুজার বান্দার আমল। যিনি ঠিক কষ্টের মধ্যেও যেসব নেয়ামত ও শান্তি বহাল আছে সেগুলোর কথা স্মরণ করেন। ফলে কষ্টের তীব্রতা লাঘব হয়।

অর্জিত নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা

যাইহোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, দু'আ করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করার তালীম দিয়েছেন, তার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে যে প্রয়োজনের কথা পেশ করতে যাচ্ছো, সেটা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরো যে সমস্ত নেয়ামত এখন ভোগ করছো, প্রথমেই সেগুলোর কথা স্মরণ করে শোকর আদায় করো। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করো।

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর দুরূদ শরীফ কেন?

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার পর কী করবে? সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহর প্রশংসা করার পর এবং নিজের প্রয়োজন তুলে ধরার পূর্বে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করো।

এখন প্রশ্ন হলো, এ সময় দুরূদ পাঠানো কেন? আসল কথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়ালু। তিনি চান যে, আমার উম্মত যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করবে তা যেন ফিরিয়ে দেয়া না হয়। বিশ্বজগতে দুরূদ শরীফ ছাড়া অন্য কোনো দু'আর ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই যে, তা অবশ্যই কবুল হবে। আমরা যখন দুরূদ পাঠ করি- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ -তার অর্থ কী হয়ে থাকে? তার অর্থ হয়- হে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল করুন। এটি এমন একটি দু'আ, যা ফিরিয়ে দেয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তা কবুল করার ওয়াদা রয়েছে। এ দু'আ কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তো পূর্ব থেকেই রহমত নাযিল হচ্ছে এবং আরো হবে। তিনি আমাদের দু'আ পাঠানোর মুখাপেক্ষী নন।

দুরূদ শরীফও কবুল, দু'আও কবুল

কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চান যে, আমার উম্মত তার প্রয়োজনীয় ও উদ্দিষ্ট বস্তু চাওয়ার পূর্বে আমার উপর দুরূদ পাঠ করুক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ঐ দুরূদ অবশ্যই কবুল করবেন। দুরূদ যখন কবুল করবেন, তখন তার দু'আও কবুল করবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার রহমত সম্পর্কে এটা ধারণা করা যায় না যে, এক দু'আ কবুল করবেন, আর অন্য দু'আ ফিরিয়ে দেবেন। এ কারণে দুরূদ শরীফের পর যে দু'আ করা হবে তা কবুল হওয়ার অধিক আশা রয়েছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হাদিয়ার প্রতিদান

আমার শায়খ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) আরেকটি কারণ এই বর্ণনা করতেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের অভ্যাস ছিলো, কোনো মানুষ তাঁর খেদমতে কোনো হাদিয়া নিয়ে আসলে তিনি তার পরিবর্তে কিছু না কিছু অবশ্যই দিতেন। দুরূদ শরীফও একটি হাদিয়া। কারণ, হাদীস শরীফে পরিষ্কার আছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- কোনো ব্যক্তি দূর থেকে দুরূদ পাঠালে তা আমার নিকট পৌছানো হয়। আর যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে সালাম করে এবং দুরূদ পাঠ করে তা আমি নিজে শুনি।[১]

দুরূদ শরীফ একজন উম্মতের পক্ষ থেকে হাদিয়া, যা তাঁর কাছে পৌছানো হয়। দুনিয়ার জীবনে কেউ তাঁকে হাদিয়া দিলে তিনি তার বদলা দিতেন এবং হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া দিতেন, তাই আশা করা যায়, কবরের জীবনে একজন উম্মতের পক্ষ থেকে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ হাদিয়া পৌছবে, তখন তিনি তার প্রতিদান দিবেন। সেই প্রতিদান এই যে, তিনি ঐ উম্মতের জন্যে দু'আ করবেন- হে আল্লাহ! এ উম্মত আমার জন্যে হাদিয়া পাঠিয়েছে এবং আমার জন্যে দু'আ করেছে। হে আল্লাহ! আমি তার জন্যে দু'আ করছি, আপনি তার বাসনা পূরণ করুন। এ কারণে যে উম্মত দুরূদ পাঠানোর পর দু'আ করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে সেখান থেকে দু'আ করবেন। এ জন্যে যখন দু'আ করতে বসবে, প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবে।

'দু'আয়ে হাজতে'র শব্দাবলী

তারপর এ শব্দমালা দ্বারা দু'আ করো-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ

আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার মধ্যে কী কী নূর ও কী কী বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, আর হয়তো তাঁর রাসূল ভালো জানেন। আমরা তার গভীরে পৌছতে সক্ষম নই। আসমায়ে হুসনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মৌলিকভাবে অনেক বৈশিষ্ট্য

---

১. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১৭৪৫, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১২৬৫, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৩৪৮৪

রেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যখন আসমায়ে হুসনার যিকির করার শিক্ষা দিয়েছেন, তাই অবশ্যই তার পিছনে কোনো রহস্য রয়েছে। বিধায় বিশেষভাবে ঐ শব্দমালাই বলা উচিত, যাতে করে উদ্দেশ্য সাধন হয়। তিনি বলেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ঐ আল্লাহ, যিনি 'হালীম' ও 'কারীম'।'

'হিল্ম'-ও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম গুণ এবং 'করম'-ও তাঁর গুণসমূহের অন্যতম। বাহ্যত এ সমস্ত গুণ বিশেষভাবে এজন্যে উল্লেখ করেছেন যে, বান্দা প্রথম ধাপেই স্বীকার করুক যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার দু'আ কবুল করবেন, আমি তার যোগ্য নই। আমি সত্তাগতভাবে আপনার দরবারে আবেদন করার উপযুক্ত নই। কারণ, আমার গোনাহ অসংখ্য, আমার অপরাধ অফুরন্ত। আমার বদ আমল এত বেশি যে, আপনার দরবারে দরখাস্ত পেশ করার যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। কিন্তু যেহেতু আপনি 'হালীম', সহনশীলতা আপনার গুণ। এ কারণে বান্দা যতো গোনহগারই হোক, আপনি তার গোনাহে উত্তেজিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেন না। বরং আপনি আপনার সহনশীলতার গুণের ভিত্তিতে ফয়সালা করে থাকেন। এ কারণে আমি আপনার 'হিল্ম' গুণের উসিলা দিয়ে দু'আ করছি। আপনার 'হিলম' ও সহনশীলতা গুণের দাবি এই যে, আপনি আমার গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। উপরন্তু 'করম' গুণের আচরণ করবেন। অর্থাৎ শুধু গোনাহ মাফ করবেন তাই নয়, অতিরিক্ত অনুগ্রহও করবেন। অনুদানও দিবেন। 'করম' ও 'হিল্ম' গুণের উসিলা দিয়ে দু'আ করো।

তারপর বলেন-

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, যিনি আরশে আযীমের মালিক।'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।'

প্রথমে প্রশস্তিমূলক এ কথাগুলো বলবে। তারপর এ ভাষায় দু'আ করবে-

اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐ সব জিনিসের প্রার্থনা করি, যেগুলো আপনার রহমতকে অবধারিত করে।'

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ

'এবং আপনার পোক্ত মাগফেরাত কামনা করি।'

وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ

'আমাকে সব নেক কাজের অংশ দান করুন।'

وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ

'আমাকে সব গোনাহ থেকে হেফাজত করুন।'

لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَه

'আমাদের এমন কোনো গোনাহ ছাড়বেন না, যা আপনি মাফ করেননি। অর্থাৎ সব গোনাহ মাফ করে দিন।'

وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَه

'এমন কোনো কষ্ট ছাড়বেন না, যা আপনি দূর করেননি।'

وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

'এবং এমন কোনো প্রয়োজন- যার মধ্যে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে- ছাড়বেন না, যা আপনি পূরণ করেননি।'

এই হলো দু'আর শব্দমালা ও তার অর্থ। মাসনূন দু'আর কিতাবসমূহেও এ দু'আ রয়েছে। দু'আটি প্রত্যেক মুসলমানের মুখস্থ করা উচিত। তারপর নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় নিজ ভাষায় আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে। আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে দু'আ কবুল করবেন।

সব প্রয়োজনের জন্যে সালাতুল হাজাত পড়বে

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

'যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পেরেশানী দেখা দিতো, তিনি সবার আগে নামাযের দিকে ধাবিত হতেন।'[১]

এ নিয়মে সালাতুল হাজাত পড়তেন এবং দু'আ করতেন যে, 'হে আল্লাহ! এই জটিলতা দেখা দিয়েছে। আপনি দূর করুন। এ কারণে মুসলমানের কাজ হলো, সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অধিকহারে সালাতুল হাজাত পড়বে।

সময় সংকীর্ণ হলে শুধু দু'আ করবে

এ বিস্তারিত নিয়ম তো সে অবস্থায়, যখন মানুষের নিকট সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো সময় থাকে এবং দু'রাকআত নামায পড়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু যদি তাড়াহুড়ার সময় হয়, দু'রাকআত নামায পড়ে দু'আ করার অবকাশ না থাকে, তাহলে সে অবস্থায় নামায পড়া ছাড়াই দু'আর এ শব্দমালা পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে। নিজের সমস্ত প্রয়োজনের কথা আল্লাহর দরবারে অবশ্যই তুলে ধরবে। সে প্রয়োজন ছোট হোক বা বড়। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমার জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায়, তাও আল্লাহ তা'আলার কাছে চাও।

যখন ছোট জিনিসও আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়ার হুকুম দেয়া হচ্ছে, তখন বড় জিনিস তো আরো বেশি চাইতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই ছোট ও বড় আমাদের হিসেবে। আমাদের কাছে জুতার ফিতা ঠিক হওয়া ছোট বিষয়, আর রাজত্ব লাভ হওয়া বড় বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে ছোট-বড়র কোনো ব্যবধান নেই। তাঁর কাছে সবকিছুই ছোট। আমাদের বড় থেকে বড় প্রয়োজন এবং বড় থেকে বড় উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ছোট।

---

১. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১১২৪, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২২২১০

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

'আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান।'[1]

সবকিছুর উপর আল্লাহ তা'আলার সমান ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর জন্যে কোনো কিছুই কঠিন নয়। তাঁর জন্যে কোনো কিছুই বড় নয়। তাই বড় প্রয়োজন হোক বা ছোট, কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছেই চাও!

বিস্তর পেরেশানী ও আমাদের অবস্থা

বর্তমানে আমাদের শহরের সবাই পেরেশান। আমাদের শহরের কী দুর্গতি চলছে! আল্লাহর পানাহ্! কোনো পরিবার এমন নেই, যারা এসব অবস্থার কারণে অশান্তি ও অস্থিরতার শিকার নয়। কেউ প্রত্যক্ষভাবে এগুলোর শিকার, কেউ পরোক্ষভাবে। কেউ বিভিন্ন বিপদের আশঙ্কায় আছে, আর কারো জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু অরক্ষিত। সবার অবস্থা খারাপ। অপরদিকে আমাদের অবস্থা এই যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এগুলোর উপর খুব মন্তব্য চলছে। চারজন একসঙ্গে বসলেই এগুলোর পর্যালোচনা হচ্ছে। অমুক জায়গায় এই হয়েছে, অমুক জায়গায় এই হয়েছে। অমুক এই ভুল করেছে, অমুক এই ভুল করেছে। সরকার এই ভুল করেছে ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতোজন লোক এমন রয়েছে, যাদের অস্থির হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার এবং দু'আ করার তাওফীক হয়েছে যে, হে আল্লাহ! এসব মুসিবত আমাদের উপর আপতিত হয়েছে। আমাদের গোনাহের আপদ আমাদের উপর চেপে বসেছে। আমাদের আমলের মন্দ পরিণতি আমাদের উপর সওয়ার হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনার রহমত দ্বারা এগুলো দূর করে দিন। বলুন! আমাদের কতোজনের এ তাওফীক হয়েছে?

সমালোচনা করার মধ্যে কোনো লাভ নেই

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হওয়ার ঘটনা ঘটলো। মুসলমানদের পুরো ইতিহাসে লাঞ্ছনার এমন ঘটনা কখনো দেখা দেয়নি, যা এ ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। নব্বই হাজার মুসলমান সৈনিক হিন্দুদের সামনে

১. সূরা বাকারা, আয়াত ২০

অস্ত্রসমর্পণ করে লাঞ্ছিত হয়েছিলো। সমস্ত মুসলমানের উপর বেদনাদায়ক এ ঘটনার প্রভাব পড়েছিলো। সবাই পেরেশান ছিলো। এ সময় আমি হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ.-এর নিকট যাই। আমার সাথে আমার বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেবও ছিলেন। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি, তখন সেখানে কিছু বিশিষ্টজনও উপস্থিত ছিলেন। সেখানেও পর্যালোচনা আরম্ভ হলো। এর পিছনে কী কী কারণ ছিলো? কে এর হোতা? কে ভুল করেছে? কেউ বললো, অমুক দলের ভুল। কেউ বললো, না, অমুক দলের ভুল। কেউ বললো, সেনাবাহিনীর ভুল। হযরত কিছুক্ষণ সবার কথা শুনতে থাকলেন। তারপর বললেন- আচ্ছা ভাই! আপনারা কি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন? কে অপরাধী, আর কে নিরাপরাধ? এ পর্যালোচনার ফলাফল কী বের হলো? যে অপরাধী, তাকে কি আপনারা শাস্তি দিবেন? আর যে নিরাপরাধ তার নির্দোষিতা প্রকাশ করবেন? আপনারা বলুন! এতোক্ষণ পর্যন্ত যে আপনারা মন্তব্য করতে থাকলেন, এর কী ফল বের হলো? দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো উপকার আপনাদের লাভ হয়েছে কি?

মন্তব্যের পরিবর্তে দু'আ করুন

এতোক্ষণ যদি আপনারা দু'আর জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে হাত উঠাতেন এবং বলতেন- হে আল্লাহ! আমাদের বদআমলের ফলে আমাদের উপর এ মুসিবত এসেছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করুন। আমাদের থেকে এ বিপদ দূর করুন। আমাদের বদ আমলের মন্দ প্রভাব তুলে নিন। এ লাঞ্ছনাকে সম্মান দ্বারা পরিবর্তিত করে দিন। এ দু'আ যদি করতেন, তাহলে অসম্ভব ছিলো না যে, আল্লাহ তা কবুল করতেন। আর ধরে নিন যদি কবুল না-ই হতো, তবুও দু'আ করার সওয়াব তো লাভ হতো। আখেরাতের নেয়ামত লাভ হতো। এখন আপনারা বসে বসে এই যে অহেতুক মন্তব্য করলেন, এর দ্বারা না দুনিয়ার কোনো ফায়দা হলো, না আখেরাতের।

তখন আমাদের চোখ খুললো যে, বাস্তবিকই আমরা দিনরাত এ রোগে আক্রান্ত যে, রাতদিন শুধু এসব বিষয় নিয়ে মন্তব্যই হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হয়ে দু'আ করার ধারা খতম

হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে কতোজন লোক এমন আছে, যারা এসব অবস্থার কারণে অস্থির হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কেঁদে-কেটে দু'আ করেছে? সালাতুল হাজাত পড়ে দু'আ করেছে- হে আল্লাহ! সালাতুল হাজাত পড়েছি। আপনি আপনার রহমত দ্বারা আমাদের থেকে এ আযাব দূর করে দিন। আল্লাহর খুব কম বান্দাই এমনটি করেছে। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মন্তব্য চলছে। মন্তব্য ও বিশ্লেষণে সময় ব্যয় হচ্ছে। এসব মন্তব্যে না জানি কতো গীবত হচ্ছে! কতো জনকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। উল্টো এসব কারণে নিজের মাথায় গোনাহের বোঝা চাপাচ্ছে।

আল্লাহর দিকে ধাবিত হোন!

সকলের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন এ সব অবস্থায় দু'আর দিকে মনযোগী হন। কারো সামর্থ্যে কোনো ব্যবস্থা থাকলে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি কোনো ব্যবস্থা সামর্থ্যের মধ্যে না থাকে, আল্লাহর কাছে দু'আ করা তো সকলেরই সামর্থ্যে আছে। আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করার ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার স্মরণ আছে, যখন পাকিস্তান হচ্ছিলো, তখন দেশে ফেৎনা-ফাসাদ চলছিলো। সে সময় দেওবন্দ ও অন্যান্য শহরের ঘরে ঘরে আয়াতে কারীমা (দু'আয়ে ইউনুস)-এর খতম চলছিলো। কারো পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়নি, বরং মুসলমানগণ নিজ উদ্যোগে, নিজ আগ্রহে এবং প্রয়োজন অনুভব করে ঘরে ঘরে ও মহল্লায় মহল্লায় আয়াতে কারীমা খতম করছিলো। মহিলারা নিজেদের ঘরে বসে খতম করছিলো এবং দু'আ হচ্ছিলো যে, হে আল্লাহ! মুসলমানদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। যার ফলে সে মুসিবত থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে পরিত্রাণ দেন।

তারপরও আমাদের চোখ খোলে না

আজ আমাদের শহরে বিপদের ঘনঘটা। চোখের সামনে মৃত্যু-যন্ত্রণায় মানুষ ছটফট করছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়ার তাওফীক হচ্ছে না। আপনারা কোথাও শুনেছেন কি- কোনো ঘরে আয়াতে কারীমার খতম করা হচ্ছে বা দু'আর ইহতিমাম করা হচ্ছে? বরং হচ্ছে

এই যে, চোখের সামনে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। চোখের সামনে মৃত্যু নৃত্য করছে, আর মানুষ ঘরের মধ্যে বসে ভি.সি.আর দেখছে। এবার বলুন! এমতাবস্থায় আল্লাহর আযাব নাযিল হবে না তো কী হবে? চোখের সামনে সুস্থ-সবল মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরও আপনাদের চোখ খোলে না, তারপরও আপনারা গোনাহ ছাড়েন না। তারপরও আল্লাহর নাফরমানীর উপর অটল রয়েছেন।

নিজের উপর দয়া করে এ কাজটি করুন !

আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের জানের উপর দয়া করে আল্লাহর দিকে ধাবিত হোন। কোন্ মুসলমান এমন আছে, যে এ উদ্দেশ্যে দুই রাকআত সালাতুল হাজাত পড়ে দু'আ করতে পারবে না? দু'রাকআত নামায পড়তে কতোটুকু সময় লাগে? দু'রাকআত নামায পড়তে গড়ে দু'মিনিট সময় লাগে। নামাযের পর দু'আ করতে অতিরিক্ত তিন মিনিট লাগবে। নিজের জাতির জন্যে আল্লাহর দরবারে পাঁচ মিনিট সময় দু'আ করার তাওফীকও যদি না হয়, তাহলে কোন্ মুখে বলেন যে, জাতির বিপর্যয়ে আমার মনে দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা রয়েছে? তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এ ফেৎনা-ফাসাদ চালু আছে, প্রতিদিন দু'রাকআত সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের জানের উপরদয়া করে নিজেদের ঘর থেকে নাফরমানীর উপকরণ বের করে দিন। গোনাহের ধারা বন্ধ করুন এবং আল্লাহর দরবারে কেঁদে-কেটে দু'আ করুন। لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ[১] আয়াতের খতম করুন। يَاسَلَامُ-এর অযীফা পাঠ করুন। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। অহেতুক মন্তব্যে সময় ব্যয় না করে এ কাজগুলো করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭

রোযা

তাৎপর্য, ফযীলত, আদব

এ মাসে কিছু আমল তো এমন রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমান জানে এবং তার উপর আমলও করে। যেমন এ মাসে রোযা ফরয। আলহামদুলিল্লাহ! রোযা রাখার তাওফীকও মুসলমানদের হয়ে থাকে। তারাবীহের নামায সুন্নাত হওয়ার বিষয়টিও তারা জানে। এতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যও তাদের হয়ে থাকে। কিন্তু এখন আমি অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, রমাযান মাসে দিনে রোযা রাখা এবং রাতে তারাবীহের নামায পড়াই হলো পবিত্র রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য। এখানেই শেষ। আর কোনো বৈশিষ্ট্য এতে নেই। এ দু'টি ইবাদত যে এ মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেই কথা শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে রমাযান মাস আমাদের নিকট আরও কিছু দাবি করে।

রোযার দাবি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

'রমযান মাস—যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে—যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে।'[১]

বরকতের মাস

ইনশাআল্লাহ কয়েকদিন পর পবিত্র রমাযান মাস শুরু হবে। এমন কোন্ মুসলমান আছে, যে এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নয়? আল্লাহ তা'আলা এ মাসকে বানিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে। আল্লাহ তা'আলা না জানি কতো অফুরন্ত রহমত এ মাসে তাঁর বান্দাদের প্রতি অবতীর্ণ করেন! আমি-আপনি আল্লাহপ্রদত্ত এসব রহমতের কথা কল্পনাও করতে পারবো না।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১, পৃ. ১১৫-১৩৬

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫

এ মাসে কিছু আমল তো এমন রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমান জানে এবং তার উপর আমলও করে। যেমন এ মাসে রোযা ফরয। আলহামদুলিল্লাহ! রোযা রাখার তাওফীকও মুসলমানদের হয়ে থাকে। তারাবীহের নামায সুন্নাত হওয়ার বিষয়টিও তারা জানে। এতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যও তাদের হয়ে থাকে। কিন্তু এখন আমি অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, রমাযান মাসে দিনে রোযা রাখা এবং রাতে তারাবীহের নামায পড়াই হলো পবিত্র রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য। এখানেই শেষ। আর কোনো বৈশিষ্ট্য এতে নেই। এ দু'টি ইবাদত যে এ মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেই কথা শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে রমাযান মাস আমাদের নিকট আরও কিছু দাবি করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۝

'আমি জিন ও মানুষকে একটি কাজের জন্যেই শুধু সৃষ্টি করেছি, আর তা হচ্ছে, তারা আমার ইবাদত করবে।'[১]

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এই বলেছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে।

ইবাদতের জন্যে ফেরেশতা কি যথেষ্ট ছিলো না?

এখানে এসে কতক লোকের বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, মানব সৃষ্টির লক্ষ্য যদি ইবাদতই হয়ে থাকে তাহলে এ জন্যে মানব সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিলো? এ কাজ তো ফেরেশতারা পূর্ব থেকেই উত্তমরূপে করে আসছিলো। তারা তো আল্লাহর তাসবীহ-তাকদীসে ব্যাপৃত ছিলো। এ কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি এধরনের মানব সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা নির্দ্বিধায় বলেছিলো যে, আপনি এমন এক মানব সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন,

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

যারা জমিনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। ইবাদত, তাসবীহ ও তাকদীস তো আমরা করছি। একইভাবে আজও প্রশ্নকারীরা প্রশ্ন করে থাকে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি শুধু ইবাদত করাই হতো, তাহলে এর জন্যে মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিলো না। এ কাজ তো পূর্ব থেকেই ফেরেশতারা সম্পাদন করে আসছিলেন।

এটি ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব নয়

নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে রত ছিলেন। কিন্তু তাদের ইবাদত ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের। আর মানুষের দায়িত্বে যে ইবাদত দেয়া হয়েছে তার আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, ফেরেশতারা যে ইবাদত করছিলো তার বিপরীত করার শক্তি তাদের প্রকৃতির মধ্যেই নেই। তারা যদি ইবাদত করতে না চায়, তাহলে সে যোগ্যতাও তাদের মধ্যে নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে গোনাহ করার যোগ্যতা দেননি। না তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, না যৌন চাহিদা আছে। গোনাহের চাহিদা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাদের অন্তরে গোনাহ করার প্রবণতাও জাগে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে পুরস্কার এবং সওয়াবও ধার্য করেননি। ফেরেশতারা যদি গোনাহের কাজ না করে তবে এটা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নয়। যেহেতু তা তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তাই জান্নাতরূপী প্রতিদান ও পুরস্কারও তাদের জন্যে নয়।

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া অন্ধের কৃতিত্ব নয়

উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই। এ কারণে সারাজীবনে সে কখনও সিনেমা দেখেনি, টেলিভিশন দেখেনি এবং পর-নারীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করেনি। বলুন তো! এসব গোনাহ না করায় তার কী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? এগুলো করার ক্ষমতাই তো তার মধ্যে নেই। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি, যার দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরিই ঠিক আছে। যে বস্তু ইচ্ছা দেখতে পারে। দেখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্তরে পর-নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করার বাসনা জাগলে তৎক্ষণাৎ সে আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি নত করে নেয়। দৃশ্যত উভয়েই গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ব্যক্তিও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করছে,

দ্বিতীয় ব্যক্তিও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করছে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তির গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয়। হ্যাঁ, দ্বিতীয় ব্যক্তির গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ইবাদত ফেরেশতাদের সাধ্যভুক্ত নয়

তাই ফেরেশতারা যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার না করে, তবে তা কোনো ফযীলতের বিষয় নয়। কারণ, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাই লাগে না। তাই পানাহার না করার কারণে তাদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু মানুষ এসব প্রয়োজন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাই কোনো মানুষ যতো উচ্চ মার্গেই পৌছুক না কেন, এমনকি সর্বোচ্চ ধাম নবুওয়াত পর্যন্ত পৌছলেও পানাহার থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না। তাই কাফেররা নবীগণের উপর আপত্তি করেছে যে-

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

'এবং তারা বলে- এ কেমন রাসূল যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে?'[১]

তাই পানাহারের চাহিদা নবীগণেরও ছিলো। কোনো মানুষের ক্ষুধা লেগেছে, কিন্তু আল্লাহর হুকুমের কারণে সে আহার করছে না, এটা তার শ্রেষ্ঠত্ব। তাই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলেন যে, আমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করতে চাচ্ছি, যার মধ্যে ক্ষুধা থাকবে, তৃষ্ণা থাকবে, যৌন চাহিদা থাকবে, গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপাদানও থাকবে, কিন্তু যখন গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে, তখন সে আমাকে স্মরণ করবে এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে। তার এ ইবাদত এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা আমার কাছে মূল্যবান। যার পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ার জন্যে আমি এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছি, যার প্রস্থ হবে আসমান ও জমীনের সমান-

عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

কারণ, তার অন্তরে গোনাহের চাহিদা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি হয়, উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমার ভয়ে ও আমার

১. সূরা ফুরকান, আয়াত ৭

শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করে এই মানুষ গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে। নিজের চোখকে গোনাহ্ থেকে হেফাজত করে। নিজের কানকে গোনাহ্ থেকে হেফাজত করে। নিজের জিহ্বাকে গোনাহ থেকে হেফাজত করে। গোনাহের প্রতি ধাবমান পদযুগলকে আটকে রাখে। যেন আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। এ ইবাদত ফেরেশতাদের সাধ্যভুক্ত নয়। এর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে।

হযরত ইউসুফ আ.-এর ফযীলত

যোলায়খা কর্তৃক হযরত ইউসুফ আ.-এর সামনে যেই অগ্নিপরীক্ষা এসেছিলো তা কোন্ মুসলমান না জানে? কুরআনে কারীম বলে, যোলায়খা হযরত ইউসুফ আ.-কে গোনাহের আহ্বান করেছিলো। তখন যোলায়খার অন্তরেও গোনাহের চিন্তা জেগেছিলো এবং হযরত ইফসুফ আ.-এর অন্তরেও গোনাহের চিন্তা এসেছিলো। যে কারণে সাধারণ মানুষ হযরত ইউসুফ আ.-এর উপরে আপত্তি করে এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অথচ কুরআনে কারীম বলতে চায়, গোনাহের চিন্তা জাগা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করে তিনি গোনাহের চাহিদার উপর আমল করেননি। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে তিনি মাথা নত করেছিলেন। কিন্তু গোনাহের চিন্তাই যদি অন্তরে না জাগতো, গোনাহের যোগ্যতাই যদি ভিতরে না থাকতো এবং গোনাহের চাহিদাই যদি সৃষ্টি না হতো তাহলে যোলায়খা যদি হাজারবারও গোনাহের আহ্বান করতো তাতে তো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু ছিলো না। ফযীলত তো এখানেই যে, গোনাহের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে, জায়গাও নিরাপদ, পরিবেশও অনুকূল, অন্তরে ইচ্ছাও জাগছে, কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে নতি স্বীকার করে তিনি বললেন-

مَعَاذَ اللّٰهِ

'আমি আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।'[১]

এই সেই ইবাদত, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

---

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৩

আমাদের জান বিক্রি হয়ে গেছে

মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যই যখন ইবাদত, তখন তার দাবি ছিলো, মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদত ছাড়া আর কিছু করবে না। অন্য কোনো কাজ করার অনুমতি তার থাকবে না। সুতরাং কুরআনে কারীমের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের থেকে তাদের জান এবং মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তার বিনিময়ে আখেরাতে তারা জান্নাত লাভ করবে।'[১]

আমাদের জান যখন বিক্রি হয়ে গেছে, তখন যে জান নিয়ে আমরা আছি, তা আমাদের নয়। তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জান যেহেতু আমাদের নয়, তাই তার দাবি ছিলো এ দেহ-প্রাণ আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কাজে লাগানো যাবে না। তাই আল্লাহ যদি আমাদেরকে এই নির্দেশ দিতেন যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাদের অন্য কোনো কাজের অনুমতি নেই। তোমরা শুধু সিজদায় পড়ে থাকবে এবং আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে। উপার্জন করারও অনুমতি নেই, পানাহারেরও অনুমতি নেই। তাহলে তো অবিচার হতো না। কারণ, সৃষ্টিই করা হয়েছে ইবাদতের জন্যে।

এমন ক্রেতার জন্যে জান কোরবান করুন!

এমন ক্রেতার জন্যে জান কোরবান করুন! আল্লাহ তা'আলা আমাদের জান-মাল ক্রয় করে নিলেন। তার পরিপূর্ণ দাম হিসেবে জান্নাতও দিলেন। তারপর সেই জান-মাল আমাদেরকে ফিরিয়েও দিলেন। এবং আমাদেরকে এ অনুমতিও দিলেন যে, পানাহার করো, উপার্জন করো, দুনিয়ার কাজকর্মও করো। তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, অমুক অমুক কাজ করা থেকে বিরত থাকো, আর অবশিষ্ট সময় যা ইচ্ছা তাই করো। এটা আল্লাহ তা'আলার বিরাট দয়া ও মেহেরবানী।

---

১. সূরা তাওবা, আয়াত ১১১

এ মাসে আসল লক্ষ্যের দিকে ফিরে আসো

কিন্তু অন্যান্য কাজ জায়েয করার ফল কী হয়ে থাকে? আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, মানুষ যখন দুনিয়ার কাজ-কারবার ও ধান্দায় মগ্ন হবে, তখন ক্রমান্বয়ে তার অন্তরে গাফলতের পর্দা পড়তে থাকবে। জাগতিক কাজ-কারবার ও ব্যতিব্যস্ততায় হারিয়ে যাবে। তাই এ উদাসীনতা দূর করার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে বিশেষ কিছু সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র রমাযান মাস সেগুলোর অন্যতম। কারণ, বছরের এগারো মাস আপনি ব্যবসায়, কৃষিতে, মজদুরিতে, জাগতিক কাজ-কর্মে, পানাহারে, হাসি-তামাশায়, অন্যান্য ব্যস্ততায় মগ্ন ছিলেন। যার ফলে অন্তরে গাফলতির পর্দা পড়তে আরম্ভ করেছে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা একটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এ মাসে তোমরা তোমাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ইবাদতের দিকে ফিরে আসো। যে উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে এবং যে লক্ষ্যে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই কাজ করো। এ মাসে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকো। এগারো মাস ধরে তোমাদের দ্বারা যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো মাফ করিয়ে নাও। তোমাদের অন্তরের যোগ্যতায় যে ক্লেদ যুক্ত হয়েছে তা পরিষ্কার করাও। অন্তরে গাফলতের যে পর্দা পড়েছে, তা দূর করাও। এ কাজের জন্যে আমি এ মাস নির্ধারণ করেছি।

'রমাযান' শব্দের অর্থ

'রম্‌যান' মীমে সাকিনযোগে আমরা ভুল উচ্চারণ করি। সঠিক উচ্চারণ হবে 'রমাযান'। মীমে যবরযোগে। রমাযান শব্দের অনেকে অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আরবী ভাষায় রমাযান শব্দের মূল অর্থ দাহ্যকারী। এ মাসের রমাযান নাম এ জন্যে রাখা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যখন এ মাসের রোযা রাখা হয়, সে বছর এ মাসটি উত্তপ্ত গ্রীষ্মের মধ্যে এসেছিলো। এ কারণে মানুষ এর নাম দিয়েছে 'রমাযান'।

নিজের গোনাহ মাফ করাও

কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এ মাসকে রমাযান এ জন্যে বলা হয় যে, এ মাসে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুকম্পায় বান্দার গোনাহসমূহ জ্বালিয়ে দেন। ভষ্মিভূত করে দেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ

তা'আলা এ মাস নির্ধারণ করেছেন। এগারো মাস জাগতিক কাজ-কারবার ও পার্থিব ব্যস্ততায় মগ্ন থাকার ফলে অন্তরে গাফলত ছেয়ে গেছে। এ এগারো মাসে যে সমস্ত গোনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাযির হয়ে সেগুলো ক্ষমা করিয়ে নাও। গাফলতের পর্দা অন্তর থেকে সরিয়ে ফেলো। যেন এর মাধ্যমে জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়ে যায়। এ কারণে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।'[১]

তোমাদের উপর রোযা এ জন্যে ফরয করা হয়েছে, যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। বিধায় রমাযান মাসের আসল উদ্দেশ্য হলো, সারা বছরের গোনাহ মাফ করানো, দিল থেকে গাফলতের পর্দা সরানো এবং অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা। যেমন কোনো মেশিন কিছুদিন ব্যবহার করার পর তা সার্ভিসিং করাতে হয়। পরিষ্কার করাতে হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সার্ভিসিং এবং ওভারহোলিং করানোর জন্যে পবিত্র রমাযান মাসের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে এ মাসে তোমরা নিজেদেরকে পরিষ্কার করো এবং নিজেদের জীবনকে এক নতুন রূপ দাও।

এ মাসকে ফারেগ করুন

তাই শুধু রোযা রাখা আর তারাবীহ পড়ার দ্বারাই কাজ শেষ হয়ে যায় না। বরং এ মাসের দাবি হলো, মানুষ এ মাসে অন্যান্য কাজ থেকে নিজেকে অবসর করবে। এগারো মাস পর্যন্ত সে অন্যান্য ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলো। কিন্তু এ মাস মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। তাই এ মাসের পুরো সময়, তা না হলে কমপক্ষে অধিকাংশ সময় বা যতো বেশি সময় সম্ভব আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩

কাটাবে। এ জন্যে মানুষের পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে পূর্ব-পরিকল্পনার।

রমাযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পদ্ধতি

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে একটি নতুন বিষয়ের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। যার সূচনা হয় আরব দেশগুলোতে। বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়াতে। পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেও তার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশেও তার আগমন ঘটেছে। তা হলো রমাযান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কিছু সভা-সম্মেলন করা হয়, যার নাম দেয়া হয় রমাযানকে স্বাগত জানানোর মাহফিল। রমাযানের এক-দু'দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত সে মাহফিলে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত ও ওয়াজ উপদেশের ব্যবস্থা করা হয়। যার উদ্দেশ্য হয় মানুষকে এ কথা জানানো যে, আমরা রমাযান মাসকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করছি। রমাযান মাসকে স্বাগত জানানোর এ আবেগ অনেক ভালো। কিন্তু এ ভালো আবেগই আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কিছুদিন পর বিদআতের রূপ ধারণ করে। এই স্বাগত মাহফিলও কতক জায়গায় বিদআতের রূপ ধারণ করেছে। রমাযানুল মুবারককে স্বাগত জানানোর আসল পদ্ধতি এই যে, রমাযান মাস আসার পূর্বে নিজের সময়সূচী পরিবর্তন করে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করবে, যেন অধিক থেকে অধিক সময় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে ব্যয় হয়। রমাযান মাস আসার পূর্বে চিন্তা করে দেখবে যে, এ মাসে আমি নিজের ব্যস্ততাকে কী করে কমাতে পারি। কোনো ব্যক্তি যদি ইবাদতের জন্যে নিজেকে পুরোপুরি ফারেগ করতে পারে তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি কেউ নিজেকে পুরোপুরি অবসর করতে না পারে তাহলে চিন্তা করে দেখবে যে, কোন্ কোন্ কাজ এ মাসে বাদ দিতে পারি, সেগুলো বাদ দিবে। কোন্ কোন্ ব্যস্ততাকে কমাতে পারি, সেগুলো কমাবে। আর যে সমস্ত কাজকে রমাযানের পর পর্যন্ত পিছানো সম্ভব সেগুলোকে পিছাবে। রমাযানের অধিক থেকে অধিক সময়কে ইবাদতের মধ্যে কাটানোর চেষ্টা করবে। আমার মতে রমাযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পদ্ধতি এটিই। এ কাজ করলে ইনশাআল্লাহ্ রমাযানুল মুবারকের আসল রূহ এবং তার নূর ও বরকত লাভ হবে। অন্যথায় রমাযান আসবে

এবং চলে যাবে, কিন্তু সঠিক উপায়ে আমরা তার উপকার লাভ করতে পারবো না।

রোযা ও তারাবীহ থেকে একধাপ এগিয়ে

রমাযানুল মুবারককে যখন অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করলেন, এখন এ অবসর সময় কি কাজে ব্যয় করবেন? সবাই জানে, রোযা রাখা ফরয। একইভাবে তারাবীহ সম্পর্কেও সবাই জানে যে, তা সুন্নাত। কিন্তু রমাযানের বিশেষ একটি দিকের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা এই যে-

আলহামদুলিল্লাহ! যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও রয়েছে, তার অন্তরে রমাযানুল মুবারকের ব্যাপারে এক প্রকারের শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার অনুভূতি রয়েছে। যে কারণে সে চেষ্টা করে, পবিত্র এ মাসে বেশি পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত করার এবং অধিক পরিমাণে নফল পড়ার। যে সব লোক অন্যান্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আসতে গড়িমসি করে, তারাও তারাবীহের মতো দীর্ঘ নামাযে প্রতিদিন অংশগ্রহণ করে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সবই এ মাসের বরকত। মানুষ এ মাসে ইবাদত, নামায, যিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে থাকে।

একটি মাস এভাবে অতিবাহিত করুন

কিন্তু এ সমস্ত নফল ইবাদত, নফল নামায, নফল যিকির ও নফল তিলাওয়াত থেকে অধিক অগ্রগণ্য আরেকটি জিনিস রয়েছে, যার দিকে মনোযোগ দেয়া হয় না। তা হলো, এ মাসকে গোনাহ থেকে পবিত্র করে অতিবাহিত করতে হবে। এ মাসে যেন আমাদের থেকে কোনো প্রকার গোনাহ না হয়। এ মুবারক মাসে যেন কু-দৃষ্টি না হয়। চোখ অপাত্রে না পড়ে। কান অন্যায় কথা না শোনে। মুখ থেকে কোনো খারাপ কথা বের না হয়। আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। এ মুবারক মাস যদি এভাবে অতিবাহিত হয়, তারপর এক রাকাত নফল নামাযও না পড়েন, অধিক তিলাওয়াতও না করেন, যিকির-আযকারও না করেন, তবে গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহর নাফরমানী না করে এ মাস অতিবাহিত করেন, তাহলে আপনি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ মাস আপনার জন্যে বরকতময়। এগারো মাস পর্যন্ত সব

ধরনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। এখন আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ এক মাস আসছে। কমপক্ষে এ মাসকে তো গোনাহ থেকে মুক্ত রাখুন। কমপক্ষে এ মাসে আল্লাহর নাফরমানী করবেন না। মিথ্যা বলবেন না। গীবত করবেন না। কু-দৃষ্টিতে লিপ্ত হবেন না। এ মাসে অপাত্রে কান ব্যবহার করবেন না। ঘুষ খাবেন না। সুদ খাবেন না। কমপক্ষে একটি মাস এভাবে অতবাহিত করুন।

এটি কেমন রোযা হলো?

আপনি তো মাশাআল্লাহ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে রোযা রাখছেন। কিন্তু রোযার অর্থ কি? রোযার অর্থ হলো, আহার করা থেকে বিরত থাকা, পান করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা থেকে বিরত থাকা। রোযার মধ্যে এ তিন জিনিস থেকেই বিরত থাকা জরুরী। এখন লক্ষণীয় হলো, এ তিনটি জিনিসই মৌলিকভাবে হালাল। খাওয়া হালাল, পান করা হালাল এবং বৈধভাবে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পুরা করাও হালাল। রোযা অবস্থায় আপনি এ হালাল জিনিস থেকো তো বিরত থাকছেন। কিন্তু যেসব জিনিস পূর্ব থেকেই হারাম ছিলো, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, কু-দৃষ্টি দেয়া, যেগুলো সর্বাবস্থায় হারাম। রোযা অবস্থায় এ সব কিছুই করা হচ্ছে। এখন রোযাও রেখেছেন, মিথ্যাও বলছেন। রোযাও রেখেছেন, গীবতও করছেন। রোযাও রেখেছেন, সময় কাটানোর জন্যে নোংরা সিনেমাও দেখছেন। এটা কী ধরনের রোযা হলো যে, হালাল জিনিস তো ছাড়লেন কিন্তু হারাম ছাড়লেন না। এ কারণে হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যা ছাড়লো না, তার ক্ষুৎ-পিপাসার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।[১]

তাই যখন মিথ্যা বলা ছাড়লো না- যা পূর্ব থেকে হারাম ছিলো- তাহলে আহার ছেড়ে সে এমন কী আমল করলো?

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৭৭০, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬৪১, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ২০১৫, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদসি নং ১৬৭৯, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৯৪৬৩

রোযার সওয়াব নষ্ট হয়ে গেলো

যদিও মাসআলার দিক থেকে রোযা হয়ে গেছে। কোনো মুফতী ছাহেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে যে, আমি রোযাও রেখেছি, মিথ্যাও বলেছি এর হুকুম কী? তখন মুফতী ছাহেব এ উত্তরই দিবেন যে, রোযা হয়ে গেছে, এর কাযা করা জরুরী নয়। কিন্তু কাযা ওয়াজিব না হলেও ঐ রোযার সওয়াব ও বরকত বিলীন হয়ে গেছে। কারণ, আপনি ঐ রোযার প্রাণ অর্জন করেননি।

রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়ার প্রদীপ জ্বালানো

আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। রোযা কেন ফরয করা হয়েছে, যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।'[১]

অর্থাৎ, মূলত তোমাদের উপর রোযার বিধান এ জন্যে দেয়া হয়েছে, যেন তার দ্বারা তোমাদের অন্তরে তাকওয়ার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। রোযার দ্বারা তাকওয়া কীভাবে লাভ হয়?

রোযা তাকওয়ার সিঁড়ি

কতিপয় আলেম বলেছেন যে, রোযার দ্বারা তাকওয়া এভাবে সৃষ্টি হয় যে, রোযা মানুষের জৈবিক ও পাশবিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষ ক্ষুধার্ত থাকার ফলে তার জৈবিক দাবি ও পাশবিক চাহিদা নিষ্পেষিত হয়। যার ফলে গোনাহের চাহিদা ও উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

কিন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.- (আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) বলেন যে, শুধু পাশবিক শক্তি ধ্বংস হওয়ার বিষয় নয়, বরং মূলকথা হলো, মানুষ যখন সঠিক পদ্ধতিতে

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩

রোযা রাখে, তখন তার রোযাই তাকওয়ার এক বিরাট সিঁড়ি হয়ে থাকে। কারণ, তাকওয়ার অর্থই হলো, আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি নিয়ে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে দেখছেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে জওয়াব দিতে হবে। এ কথা চিন্তা করে যখন মানুষ গোনাহ ছেড়ে দেয়, সেটাই মূলত তাকওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

'আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'[১]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভয় করে, আমাকে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে, তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং এর ফলে নিজেকে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পুরা করা হতে বিরত রাখে, এর নামই 'তাকওয়া'।

আমার মালিক আমাকে দেখছেন

তাই রোযা হলো তাকওয়া অর্জনের উৎকৃষ্টতম প্রশিক্ষণ, উন্নততর তারবিয়াত। যখন একজন মানুষ রোযা রাখে- সে যতো গোনাহগার, পাপী, দোষী ও অপরাধী হোক না কেন- রোযা রাখার পর প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে তীব্র পিপাসার্ত অবস্থায় নির্জন কক্ষে, রুদ্ধ দ্বার, কক্ষে ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানিও রয়েছে, এমতাবস্থায় মানুষের মন ঠাণ্ডা পানি পান করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, তখন কি সে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে পান করবে? মোটেও করবে না। অথচ সে পানি পান করলে কোনো মানুষ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। কেউ তাকে তিরস্কার করবে না। মানুষের কাছে সে রোযাদার বলেই গণ্য হবে। সন্ধ্যার সময় মানুষের সাথে বসে আরামছে ইফতার করলে কেউ বুঝতেও পারবে না যে, সে রোযা ভেঙ্গেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে পানি পান করে না। কেন পান করে না? পানি পান না করার পিছনে এটাই একমাত্র কারণ যে, সে চিন্তা করে, যদিও কেউ আমাকে দেখছে না, কিন্তু আমার সেই মনিব, যাঁর জন্যে আমি রোযা রেখেছি, তিনি তো আমাকে দেখছেন।

---

১. সূরা নাযি'আত, আয়াত ৪০-৪১

আমিই তার প্রতিদান দেবো

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে-

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا أَجْزِيْ بِهٖ

'রোযা আমার জন্যে, আমিই এর প্রতিদান দেবো।'[১]

অন্যান্য আমল সম্পর্কে বলেছেন যে, কোনো আমলের দশগুণ কোনো আমলের সত্তরগুণ এবং কোনো আমলের একশ' গুণ প্রতিদান রয়েছে। এমনকি দান করার প্রতিদান সাতশ' গুণ। কিন্তু রোযা সম্পর্কে বলেছেন যে, রোযার প্রতিদান আমিই দেবো। কারণ, সে রোযা রেখেছে শুধুই আমার জন্যে। প্রচণ্ড গরমের কারণে কণ্ঠনালি যখন আটকে যাচ্ছিলো, পিপাসায় জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিলো, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা ছিলো, নির্জন জায়গা ছিলো, দেখার কেউ ছিলো না, এতদসত্ত্বেও আমার বান্দা শুধু এ জন্যেই পানি পান করেনি যে, আমার সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে এবং জওয়াব দিতে হবে। এ ভয় ও অনুভূতি তার অন্তরে জাগ্রত ছিলো। এ অনুভূতির নামই তাকওয়া। এ অনুভূতি যার জেগেছে, তার তাকওয়াও লাভ হয়েছে। তাই রোযা তাকওয়ার একটি রূপ এবং তা অর্জনের একটি ধাপ। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন- আমি রোযা এজন্যে ফরয করেছি যেন তাকওয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ হয়।

অন্যথায় এ প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণতা লাভ করবে না

তুমি যখন রোযার মাধ্যমে এ বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করছো, তখন তাকে আরও উন্নত করো। তাই যেভাবে রোযার মধ্যে প্রচণ্ড পিপাসায় পানি পান করা থেকে বিরত ছিলে এবং আল্লাহর ভয়ে খানা খাওয়া থেকে বিরত ছিলে, তেমনিভাবে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, আর সেখানে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর চাহিদা সৃষ্টি হবে, তখন সেখানেও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ঐ গোনাহ থেকে বিরত থাকো। এ জন্যে আমি তোমাদেরকে এক মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স করাচ্ছি। এই প্রশিক্ষণ কোর্স তখন পূর্ণতা লাভ করবে, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর উপর আমল

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬৯৩৮, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪৬, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৫, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ২১৮১, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৪০৩৬

করবে। অন্যথায় প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণতা লাভ করবে না। আল্লাহর ভয়ে পানি পান করা থেকে তো বিরত থাকলে, কিন্তু জীবনের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে অপাত্রে দৃষ্টি পড়ছে, কান নিষিদ্ধ কথা শুনছে, জিহ্বা মিথ্যা কথা বলছে, এভাবে তো এ কোর্স পূর্ণতা লাভ করবে না।

রোযার এয়ারকন্ডিশনার তো লাগালে কিন্তু...

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যবহার যেমন জরুরী, কুপথ্য থেকে বেঁচে থাকাও তেমন জরুরী। আল্লাহ তা'আলা রোযা রাখতে বলেছেন যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাকওয়া তখন সৃষ্টি হবে, যখন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী এবং গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ কামরাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে এয়ারকন্ডিশনার লাগালেন। এয়ারকন্ডিশনারের ফল হলো তার দ্বারা পুরো কামরা শীতল হবে। এখন এয়ারকন্ডিশনার চালু করলেন, কিন্তু সাথে সাথে ঐ কামরার দরজা ও জানালাগুলো খুলে দিলেন। এদিক থেকে শীতলতা আসছে, আর ওদিক থেকে তা বের হয়ে যাচ্ছে। তাই কামরা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে চিন্তা করুন- একদিকে রোযার এয়ারকন্ডিশনার তো লাগালেন, অপরদিকে আল্লাহর নাফরমানীর জানালাও খুলে দিলেন। এবার বলুন- এমন রোযার দ্বারা কোনো উপকার হবে কি?

আসল উদ্দেশ্য হুকুম মেনে চলা

এমনিভাবে রোযার দ্বারা যে পাশবিক শক্তি চূর্ণ হয়, এটা এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকারিতা। রোযার আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুম পালন করা। পুরো দ্বীনের ভিত্তিই হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের অনুসরণ করা। তিনি যখন বলবেন খাও, তখন খাওয়াই দ্বীন। আর যখন বলবেন খেয়ো না, তখন না খাওয়াই দ্বীন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করা ও হুকুম মেনে চলার এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা দিয়েছেন। সারাদিন দিয়েছেন রোযা রাখার হুকুম, আর তাতে রেখেছেন অনেক প্রতিদান ও পুরস্কার। কিন্তু যেই সূর্যাস্ত হলো, সেই হুকুম হলো দ্রুত ইফতার করো। দ্রুত ইফতার করাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিনা কারণে ইফতার করতে বিলম্ব করা মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। কেন অপছন্দনীয়? এ জন্যে যে, সূর্যাস্ত হলে আমার হুকুম হলো, এখন খাও।

এখনও যদি না খাও এবং অভুক্ত থাকো, এ অভুক্ত থাকা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। কারণ, আসল কাজ হলো আমার হুকুম মেনে চলা। নিজের ইচ্ছা পুরা করা নয়।

সাধারণ অবস্থায় দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি লোভ-লালসা খুবই নিন্দনীয়। কিন্তু তিনি যদি লালসা করার নির্দেশ দেন, তখন তার মধ্যেই রয়েছে স্বাদ ও মজা। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন যে-

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں
خاک بہ فرق قناعت بعد ازیں

'দ্বীন-সম্রাট যখন আমার কাছে লালসা চান,
তখন অল্পে তুষ্টির মাথায় মাটি পড়ুক।'

আল্লাহ তা'আলা যখন লালসা চাচ্ছেন, তখন অল্পে তুষ্টির মধ্যে মজা নেই। তখন তো লালসার মধ্যেই মজা। এ কারণেই দ্রুত ইফতার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সূর্যাস্তের পূর্বে হুকুম ছিলো, একটি দানাও যদি মুখের মধ্যে চলে যায় তাহলে গোনাহও অবধারিত এবং কাফফারাও আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ ৭টার সময় সূর্যাস্ত হয়, এখন যদি কেউ ৬:৫৯ মিনিটে একটি বুটের দানা খেয়ে ফেলে, তাহলে তার কতোটুকু রোযা কম হয়েছে? শুধু একমিনিট কম হয়েছে। একমিনিটের রোযা ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এই একমিনিটের কাফফারা স্বরূপ ৬০দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। কারণ শুধু একটি বুটের দানা এবং ১মিনিটের বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো, সে আল্লাহর হুকুম ভেঙ্গেছে। আল্লাহর হুকুম ছিলো, সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু সে হুকুম লঙ্ঘন করেছে। তাই এখন একমিনিটের পরিবর্তে ৬০দিন রোযা রাখতে হবে।

দ্রুত ইফতার করো

কিন্তু যেই সূর্যাস্ত হলো, সেই হুকুম হলো- এখন দ্রুত খাও। যদি বিনা কারণে বিলম্ব করে তাহলে গোনাহ হবে। কেন? কারণ, আমি হুকুম দিয়েছি খাও, এখন খাওয়া জরুরী।

সাহরীতে বিলম্ব করা উত্তম

সাহরীর ক্ষেত্রে বিধান হলো, বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম। তাড়াতাড়ি খাওয়া সুন্নাতের খেলাফ। কতক লোক রাত ১২টায় সাহরী খেয়ে ঘুমিয়ে

পড়ে। এটি সুন্নাতের খেলাফ। সাহাবায়ে কেরামও শেষ সময় পর্যন্ত সাহরী খেতেন। এ কারণে যে, এটি এমন সময়, যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে খাওয়ার অনুমতিই শুধু নয়, বরং নির্দেশ রয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সময় রয়েছে খেতে থাকবো। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও আনুগত্য। এখন কেউ যদি আগেই সাহরী খেয়ে নেয়, তাহলে সে নিজের পক্ষে থেকে রোযার সময় বৃদ্ধি করলো। এ জন্যে আগে আগে সাহরী খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুরো দ্বীনের মূল কথা হলো, আল্লাহর হুকুম মেনে চলা। যখন আমি খেতে বলেছি, তখন খাওয়ার মধ্যে সওয়াব। আর যখন খেতে নিষেধ করেছি তখন না খাওয়ার মধ্যে সওয়াব। এ কারণে হযরত হকীমুল উম্মত রহ. বলতেন- যখন আল্লাহ বলছেন- খাও! আর বান্দা বলছে যে, আমি তো খাবো না বা কম খাবো, এটা বন্দেগী ও আনুগত্য হলো না। আরে ভাই! খাওয়ার মধ্যেও কিছু নেই এবং না খাওয়ার মধ্যেও কিছু নেই, সবকিছু রয়েছে তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। তাই যখন তিনি বলছেন- খাও, তখন খাও। নিজের পক্ষ থেকে কোনো নিয়ম বানানোর প্রয়োজন নেই।

একটি মাস গোনাহ ছাড়া অতিবাহিত করুন!

তবে গুরুত্ব দেয়ার বিষয় হলো, রোযা যখন রেখেছেন, তখন নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচান। চোখ বাঁচান, কান বাঁচান, জিহ্বা বাঁচান। এক রমাযানে আমাদের শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই রহ. এ কথাও বলেন যে, আমি এমন একটি কথা বলছি, যা অন্য কেউ বলবে না। তা হলো, নিজের নফস্কে এভাবে ফুসলাও। তার সাথে চুক্তি করো, গোনাহ ছাড়া একটি মাস অতিবাহিত করো। এই একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তোমার যা মন চাইবে করবে। হযরত বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে আশা আছে যে, এই এক মাস গোনাহ ছাড়া অতিবাহিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তার অন্তরে গোনাহ ছাড়ার চাহিদা সৃষ্টি করে দিবেন। কিন্তু আগে এই অঙ্গীকার করো যে, আল্লাহ্ পাকের খাস মাস আসছে। এটি ইবাদতের মাস। তাকওয়া সৃষ্টির মাস। এ মাসে আমি গোনাহ করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করে দেখবে, সে কোন্ কোন্ গোনাহে লিপ্ত আছে। তারপর সমস্ত গোনাহের ব্যাপারে

অঙ্গীকার করবে- আমি এসব গোনাহে লিপ্ত হবো না। উদাহরণস্বরূপ অঙ্গীকার করবে যে, পবিত্র রমাযান মাসে নিষিদ্ধ জায়গায় দৃষ্টি দেবো না। নিষিদ্ধ কথা শুনবো না। মুখ দিয়ে নিষিদ্ধ কথা বলবো না। এটা তো কোনো কথা হলো না যে, রোযাও রাখবো আবার চোখ দিয়ে অশ্লীল দৃশ্যও দেখবো এবং তা উপভোগও করবো।

রমাযান মাসে হালাল রিযিক

আমাদের হযরত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতেন- কমপক্ষে এ মাসে তো হালাল রিযিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করো। যে লোকমাই আসবে তা যেন হালাল হয়। এমন যেন না হয় যে, রোযা তো রাখলে আল্লাহর জন্যে, আর ইফতার করলে হারাম জিনিস দ্বারা। সুদের টাকা দিয়ে ইফতার হচ্ছে, ঘুষের টাকা দিয়ে ইফতার হচ্ছে, হারাম আমদানি দিয়ে ইফতার হচ্ছে। এ কেমনতর রোযা হলো যে, সাহরীও হারাম, ইফতারও হারাম, আর মাঝখানে রোযা। এ জন্যে বিশেষভাবে এ মাসে হারাম রুজি থেকে বেঁচে থাকবেন। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমি হালাল রিযিক খেতে চাই, হারাম রিযিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

হারাম আয় থেকে বাঁচুন!

অনেকে এমন আছে, যাদের মৌলিক উপার্জন আলহামদুলিল্লাহ হারাম নয়, হালাল। তবে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে কিছু হারাম আয়ও মিশ্রিত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তিদের জন্যে হারাম থেকে বাঁচা কোনো কঠিন কাজ নয়। তারা কমপক্ষে এ মাসে কিছুটা যত্নবান হবেন এবং হারাম আয় থেকে বেঁচে থাকবেন।

অবাক কাণ্ড! এ মাসকে আল্লাহ তা'আলা সবরের মাস বলেছেন। সহমর্মিতা ও সমবেদনার মাস বলেছেন। কিন্তু এ মাসে মানুষ সহমর্মিতার পরিবর্তে উল্টা ছাল তুলে নেয়ার চিন্তা করে। রমাযানের পবিত্র মাস আসতেই মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করতে আরম্ভ করে। তাই কমপক্ষে এ মাসে নিজেকে অবশ্যই হারাম কাজ হতে রক্ষা করুন।

আমদানি পুরোটা হারাম হলে কী করবে

কতক মানুষ এমন আছে, যাদের আয়ের মাধ্যম পুরোটাই হারাম। যেমন, সুদভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে। তারা এ মাসে কী করবে? আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ.- আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন- সবার জন্যে পথ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, যার পুরো আমদানি হারাম তাকে আমি পরামর্শ দেই যে, সম্ভব হলে রমাযান মাসে ছুটি নিয়ে নাও। কমপক্ষে এ মাসের খরচের জন্যে জায়েয ও হালাল আয়ের ব্যবস্থা করো। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে এ মাসের খরচের জন্যে কারও থেকে ধার নাও। এ মাসে হালাল আয় থেকে খাবো, নিজের সন্তানদেরকে হালাল খাওয়াবো- এ চিন্তা করো। কমপক্ষে এতোটুকু কাজ করো।

গোনাহ্ থেকে বাঁচা সহজ

মোটকথা, আমি বলতে চাচ্ছি যে, মানুষ এ মাসে নফল প্রভৃতির ব্যাপারে তো খুব গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি সে পরিমাণ গুরুত্বারোপ করে না। অথচ এ মাসে শয়তানকে বেড়ি পরানো হয়। তাকে বন্দি করা হয়। এ কারণে শয়তানের পক্ষ থেকে গোনাহের কুমন্ত্রণা দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করার বিষয় থাকে না। এ জন্যে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়।

রোযা অবস্থায় ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন

রোযার সাথে সম্পর্কিত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ক্রোধ থেকে বিরত থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- এটি সহমর্মিতার মাস, পরস্পরে সমবেদনার মাস, এ জন্যে ক্রোধ ও তা থেকে সংঘটিত গোনাহসমূহ- যেমনঃ ঝগড়া, মারপিট, তুই-তোকারি- এসব থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্বারোপ করুন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ

'কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে এবং ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। তাহলে তুমি বলে দাও আমি রোযাদার।'[১]

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৬৮১, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭৫০৪

আমি ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই। মুখেও না, হাতেও না। এসব থেকে বিরত থাকবেন। এগুলো হলো মৌলিক কাজ।

রমাযান মাসে অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করুন !

মাশাআল্লাহ! সকল মুসলমানই জানে যে, এ মাসে রোযা রাখা এবং তারাবীহ পড়া জরুরী। এ মাসের সঙ্গে কুরআনে কারীমের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রমাযান মাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল আ. এর সঙ্গে পুরো কুরআন শরীফ 'দাওর' করতেন। এ জন্যে যতো অধিক পরিমাণে সম্ভব এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। তা ছাড়া চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে আল্লাহর যিকির করুন। অধিকহারে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ এবং দুরুদ শরীফ ও ইস্তিগফার পাঠ করুন। যতো বেশি সম্ভব নফল নামায আদায় করুন। অন্য সময় রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু রমাযান মাসে মানুষ যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্যে উঠে, তাই একটু আগে উঠে সাহরীর পূর্বে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ুন। এ মাসে 'খুশু'-র সাথে নামায আদায়ের এবং পুরুষরা জামাতের সাথে নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করুন।

এ সব কাজ তো এ মাসে করতেই হবে। এগুলো রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এ সবের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ সব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং পবিত্র রমাযান মাসের নূর ও বরকত দ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হজ্জ

তাৎপর্য, ফযীলত, আদব

এ ইবাদত আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, প্রেম ও ভালোবাসার যথার্থ হকদার একমাত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এবং বিশ্বজগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। উপাসনা করতে হলে, কেবল তাঁরই উপাসনা করো। কামনা করতে হলে, কেবল তাঁকেই কামনা করো। আহ্বান করতে হলে, তাঁকেই আহ্বান করো। প্রার্থনা করতে হলে, কেবল তাঁর নিকটেই প্রার্থনা করো। কারও গলিতে প্রদক্ষিণ করতে মন চাইলে, তাঁরই ঘরের তাওয়াফ করো। কারও স্মরণে পাগলপারা হয়ে ছুটতে চাইলে, তাঁর স্মরণেই পাগলপারা হও।

হজ্জের গুরুত্ব*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আজ আরাফার দিন। এ দিনটি একজন মুসলমানের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরাফার দিন হাজার হাজার মুসলমান এমন একটি ইবাদত সম্পন্ন করেন, যা মৌলিকভাবে একটি উচ্চাঙ্গের ইবাদতই শুধু নয়, বরং অনেকগুলো ইবাদতের সমষ্টি এবং অনেকগুলো পবিত্র গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উৎস। আজকের দিনে লক্ষ লক্ষ তাওহীদপন্থী শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্যে এমন একটি ময়দানে সমবেত হন, যার উপর আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই। আদিগন্ত বিস্তৃত উষর মরু প্রান্তরে সাদা-কালো, আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র ও রাজা-প্রজার মধ্যে সব ধরনের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখানে একজন দুর্দান্ত প্রতাপশালী বাদশাও নিজ প্রভুর সামনে অক্ষম অসহায় মজদুরে পরিণত হয়।

এখানে শত শত দেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষকে একই পোষাকে আবৃত দেখা যায়। সকলে একই খোদাকে ডাকেন। সবার মুখে একই সঞ্জীবনী শ্লোগান ঘোষিত হয়-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

পবিত্র হিজায ভূমিতে সম্পন্ন হজ্জের এ হৃদয়-কাড়া ইবাদত সমস্ত ইবাদতের মধ্যে এক অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী মর্যাদার অধিকারী। এ ইবাদত মানব স্বভাবে গচ্ছিত প্রেম-প্রেরণাকে এক সঠিক দিক

---

* নশরী তাকরীরেঁ, পৃ. ৫১-৫৮, ফরদ কী ইসলাহ, পৃ. ৭১

নির্দেশনা দান করে। যার কারণে সে কখনো কখনো বিবেকের শাসনকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়।

এ ইবাদত আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, প্রেম ও ভালোবাসার যথার্থ হকদার একমাত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এবং বিশ্বজগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। উপাসনা করতে হলে, কেবল তাঁরই উপাসনা করো। কামনা করতে হলে, কেবল তাঁকেই কামনা করো। আহ্বান করতে হলে, তাঁকেই আহ্বান করো। প্রার্থনা করতে হলে, কেবল তাঁর নিকটেই প্রার্থনা করো। কারও গলিতে প্রদক্ষিণ করতে মন চাইলে, তাঁরই ঘরের তাওয়াফ করো। কারও স্মরণে পাগলপারা হয়ে ছুটতে চাইলে, তাঁর স্মরণেই পাগলপারা হও।

কুরআনে কারীম অনেক জায়গায় হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

'আর মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার, যে ব্যক্তি তাঁর ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ্য রাখে সে যেন হজ্জ করতে আসে।'[১]

ইসলাম এ ইবাদতের প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন-

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

'যে ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট কোনো প্রয়োজন, কোনো জালেম বাদশাহ বা কোনো রোগ-ব্যাধি হজ্জে যেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, এতদসত্ত্বেও সে হজ্জ না করে মারা গেলো, তাহলে তার ইচ্ছা সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খ্রিস্টান হয়ে।'[২]

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭

২. সুনানুদ দারেমি, হাদীস নং ১৭১৯

অপরদিকে এ ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

'যে হজ্জ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।'[১]

সহীহ মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আয়েশা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন-

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

'আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন যেই পরিমাণ বান্দাকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দান করেন, ঐ পরিমাণ অন্য কোনো দিন করেন না।'[২]

প্রশ্ন হলো, এ প্রেমপূর্ণ ইবাদতকে ইসলামে এত অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কেন? কুরআনে কারীম ছোট্ট একটি বাক্যে হজ্জের সমস্ত হিকমত তুলে ধরেছে। ইরশাদ হয়েছে-

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

'(হজ্জের হিকমত এই যে,) মানুষ এখানে এসে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে যে, এ হজ্জের মধ্যে তাদের জন্যে কী কী উপকার রাখা হয়েছে।'[৩]

বাস্তবেও হজ্জের ফায়দা ও হিকমত সেই সৌভাগ্যবানই যৎসামান্য উপলব্ধি করতে পারে, যাকে আল্লাহ তা'আলা এ বিরাট সৌভাগ্য দান করেন। সেখানে গিয়ে নিঃসন্দেহে সে সুস্পষ্টভাবে ঐ সমস্ত উপকারিতা প্রত্যক্ষ করে, কল্পনার চোখে যেগুলো প্রত্যক্ষ করা আদৌ সম্ভব নয়।

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৬৫০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৩, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৮৫৫, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ২৫৮২, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ২৮৭৯

২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০২, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ২৯৫৩, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৩০০৫

৩. সূরা হজ্জ, আয়াত ২৮

তারপরও আসুন! এ ইবাদতের কর্মকাণ্ডের উপর একটি ভাসা ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে এমন কতক হিকমত কিছুটা অনুমান করার চেষ্টা করি, যেগুলো আমাদের কল্পনার গণ্ডিতে আসতে পারে।

হজ্জের ইবাদতের মধ্যে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা এই যে, এর দ্বারা মানুষ অসংখ্য সুকুমারবৃত্তি দ্বারা সজ্জিত হওয়া এবং নিজের সুপ্ত যোগ্যতাসমূহকে উজ্জীবিত করার অফুরন্ত সুযোগ লাভ করে। একটু চিন্তা করে দেখুন! যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জের সংকল্প নিয়ে নিজের ঘর থেকে বের হয় তাকে কিসে এই সফরের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে? তার মাথায় কোন্ উন্মাদনা রয়েছে, যা তাকে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে বিদায় করে, স্বদেশের আরাম-আয়েশকে কোরবানী করে এবং শত শত মাইলের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সেই উষর মরুতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটতে বাধ্য করে, যার মধ্যে বাহ্যিক কোনো আকর্ষণ নেই।

আপনি চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন একজন হজ্জ গমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে এ সফরের জন্যে উদ্বুদ্ধকারী আল্লাহর প্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য কথা হলো, এ সফরের জন্যে কোনো ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত উদ্বুদ্ধই হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম, রাসূলের ভালোবাসা, আখেরাতের ফিকির এবং ফরযকে ফরয বোঝার যোগ্যতা না জন্মায়।

এ ব্যক্তি যখন হজ্জ করার নেক নিয়ত নিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বের হয়, তখন তার হৃদয় জগতে আমূল বিপ্লব সাধিত হয়। এখন সে খোদার পথের পথিক। প্রতি পদে তার সজাগ দৃষ্টি- তার কোনো আচরণ যেন সেই মালিকের মর্জির খেলাফ না হয়, যার মেহমান হয়ে সে গমন করছে। এ কল্পনা তার অন্তরে নেক আমলের উত্তাল তরঙ্গ, সৎ কর্মের প্রতি নিমগ্নতা এবং গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে। তার চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে তার মালিকের এই নির্দেশ ভাসতে থাকে যে-

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

'সে হজ্জের সময়ে কোনও অশ্লীল কথা বলবে না, কোনও গুনাহ করবে না এবং ঝগড়াও নয়।'[১]

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৭

পথে সে নিজের মতো অনেক সফরসঙ্গী লাভ করে। যখন সে কল্পনা করে যে, আমার অন্তরে যেই আবেগ-উদ্দীপনা তরঙ্গায়িত হচ্ছে, এরাও সেই একই লক্ষ্য নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সে তাদের মাঝে আপনত্ব উপলব্ধি করে। সে তাদেরকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে। তাদের পক্ষ থেকে কষ্টকর কিছু দেখা দিলে যথাসম্ভব ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এই অনুভূতি তার অন্তরে অন্যদের জন্যে আত্মত্যাগ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও ক্ষমাসুন্দর আচরণের মূল্যবান প্রবৃত্তি জাগ্রত করে।

তারপর সফরের মাঝে এমন একটি জায়গা আসে, যেখান থেকে এহরাম ছাড়া অতিক্রম করা জায়েয নেই। সেখানে পৌছে হজ্জ গমনেচ্ছুক ব্যক্তি তার বাহ্যিক সাজসজ্জা ও পোষাকের যাবতীয় সৌন্দর্য কোরবানী করে। তার সুগন্ধি লাগানোর অনুমতি নেই। সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারে না। মাথা এবং চেহারা ঢাকাও নাজায়েয। সে কোনো পশু শিকার করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ক অবলম্বন করতে পারে না। দু'টিমাত্র সাদা চাদরে আবৃত থাকে। যা এ কথা ঘোষণা করে যে, এত দিন পর্যন্ত সে যাই ছিলো না কেন, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এখন সে একমাত্র আল্লাহর দুয়ারের ভিখারী। যার মুখে একই আওয়াজ কেবল উচ্চারিত হয়-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

'আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা তোমার, সমস্ত নেয়ামত তোমার পক্ষ থেকেই, রাজত্ব তোমারই, তোমার কোনো শরীক নেই।'

এ আওয়াজ মূলত সেই ডাকের উত্তর, যা আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আ. দিয়েছিলেন। আল্লাহর সেই ঘোষক তখন ডেকে বলেছিলেন, আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর ঘরের দিকে আসো। পৃথিবীর সব কোণ থেকে আসো। সেই ডাকের উত্তরে পরম প্রিয়ের ঘর অভিমুখী প্রত্যেক মুসাফির উচ্চ কণ্ঠে 'লাব্বাইক' বলে। অর্থাৎ

আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি কেবল তোমার ডাকেই সাড়া দিয়েছি। সমস্ত প্রশংসা তোমার, সমস্ত নেয়ামত তোমার, সমস্ত রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই।

ইহরামের এই ফকিরী বেশ সেই মুসাফিরের অন্তরে দীনতা, হীনতা, বিনয় ও আত্মবিলোপ সৃষ্টি করে। অহংকার, অহমিকা, গরীমা ও প্রদর্শন-প্রবৃত্তির সমস্ত ঘৃণার্হ আবেগ-অনুভূতিকে পিষ্ট করে। এমন কি আল্লাহর এই গোলাম যখন তাঁর পবিত্র ঘরে পৌছে, তখন বন্দেগী ছাড়া অন্য কোনো চেতনা তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। এখানে সে তার মস্তিষ্কের যাবতীয় অহমিকা ধূলোয় মিশিয়ে ঐ ঘরের চর্তুদিকে পাগলপারা হয়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তার পাথরে চুম্বন করে। তার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে কাঁদে এবং অশ্রু বিসর্জন করে।

এ পবিত্র ভূমির প্রতিটি কণা নবী ও সাহবীগণের পবিত্র জামাতের সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়ে দেয়। সেই মুসাফিরের হৃদয়ে ঐ জামাতের গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার এক আগ্রহ জন্ম নেয়। তাওয়াফ শেষ করে সে যখন মাকামে ইবরাহীমে যায়, তখন কাবাগৃহের পবিত্র নির্মাতাদের কল্পনা তার হৃদয়ে ভক্তি ও ভালোবাসার আবেগ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তারপর যখন সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সা'য়ী' করে, তখন তার অন্তরে একদিকে হযরত হাজেরা আলাইহাস সালামের সেই পরীক্ষার কথা স্মরণ হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তিনি যা সহ্য করেছিলেন, অপরদিকে তার অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে শ্রম, সাধনা ও কষ্ট স্বীকারের উদ্দীপনা প্রবৃদ্ধি লাভ করে।

এমনকি সে একদিন মসজিদে হারামকেও বিদায় জানিয়ে সেই মরুপ্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করে, যার প্রতিটি কণার সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা জড়িত। আল্লাহর হুকুমে সে কখনো মীনায় অবস্থান করে। কখনো আরাফায় তাঁবু ফেলে। কখনো মুযদালিফায় রাত কাটায়। অবশেষে মীনার তিন 'জামারা'য় বারবার কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানের কু-মন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে লড়াই করার বাস্তব প্রদর্শনী তুলে ধরে। এখানেই পশু কোরবানী করে সে হযরত ইবরাহীম আ.-এর অসাধারণ কোরবানীর স্মৃতি স্মরণ করে। এ সমস্ত

ইবাদতের শেষে সে যেন স্বীকারোক্তি করে যে, সময় এলে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে নিজের জান কোরবানী করতেও কুণ্ঠিত হবে না।

আপনারা লক্ষ্য করলেন! হজ্জের কর্মকাণ্ডের প্রত্যেকটি নড়াচড়া তার মাঝে উৎকৃষ্টতম গুণাবলী ও সুকুমারবৃত্তি সৃষ্টি করতে কী পরিমাণ সহযোগিতা করে? হজ্জের এ সমস্ত উপকারিতা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। যেগুলো কেবল হাজী ছাহেবগণ লাভ করে থাকেন। কিন্তু হজ্জের উপকারিতার তালিকা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। এবার ঐ সমস্ত উপকারিতার উপরেও একবার নযর বুলিয়ে দেখুন, হজ্জের কারণে মুসলিম সমাজ যেগুলো লাভ করে থাকে।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকেন, হজ্জের মৌসুমে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র হজ্জের সফরের তৎপরতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। রমাযান থেকে রবিউল আওয়াল পর্যন্ত ছয়টা মাস হাজী ছাহেবানদের গমনাগমন চলতে থাকে। এ সময় যারা হজ্জে যেতে পারে না, তারাও হাজী ছাহেবদেরকে সফরের প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করে, তাদেরকে বিদায় জানিয়ে, ফেরার পথে অভ্যর্থনা জানিয়ে এবং তাদের মুখে প্রেমাস্পদের গৃহের আবেগময় আলোচনা শুনে ন্যূনতমপক্ষে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর একটি অংশ লাভ করে থাকে, হজ্জের সফর মানুষের মধ্যে যেগুলো সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে সারা পৃথিবীতে এক ইসলামী প্রাণচাঞ্চল্য জাগ্রত হয়।

হজ্জের মুসাফিরের এ কাফেলা- যাদের অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা থাকে না- যে জনপদ দিয়ে অতিক্রম করে, তাকে নিজেদের আমল-আখলাক দ্বারা প্রভাবিত করে। তাদের হৃদয়ে আবেগময় এ সফরের প্রেরণা জাগ্রত করে।

তাছাড়া আরাফার ময়দানে কোনো হাজী একা যায় না। সেখানে লক্ষ লক্ষ তাওহীদপন্থীর এক মনোমুগ্ধকর মহা সম্মেলন ঘটে। তাদের ভাষা ভিন্ন, তাদের বর্ণ ভিন্ন, তাদের বংশ ভিন্ন, কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যবধানকে বিলুপ্ত করে এভাবে একাকার হয়ে যায় যে, তাদের আল্লাহ এক, তাদের রাসূল এক, তাদের কিতাব এক, তাদের কাবা এক, তাদের মুখের আওয়াজ এক, তাদের হৃদয়ের প্রেরণা এক, এমনকি তাদের দেহের পোষাক পর্যন্ত এক হয়ে যায়। এভাবে আকাশের দৃষ্টি মানব

ঐক্যের সেই বিশালতম ও মহিমান্বিত প্রদর্শনী দেখতে পায়, যার নজির পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে দেখা সম্ভব নয়।

এখানে প্রত্যেক মুসলমান তার ভাইয়ের অবস্থা শোনা, তার সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ করা এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সফলতা ও সার্থকতা লাভের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ লাভ করে। এখানে মুসলমানগণ ঐক্যের সঙ্গে সংহতির দীক্ষা লাভ করে থাকে। এখানে লক্ষ জনতা এক আমীরুল হজ্জের অনুকরণ করে থাকে। তারই পিছনে নামায আদায় করে। তারই বক্তব্য শুনে সে অনুপাতে আমল করে।

সারকথা হলো, রূহানী তারবিয়াতের এ মহিমান্বিত ইবাদত থেকে অবসর লাভ করে মানুষ চাইলে নিজেকে নিজে মানবতার এমন এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বানাতে পারে, যা তার সমাজের প্রত্যেক সদস্যের জন্যে ঈর্ষার কারণ হবে। এ কারণেই সরকারে দো-আলম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

'যে ব্যক্তি এমনভাবে হজ্জ করে যে, সে কোনো অশ্লীল কাজ করে না, কোনো পাপাচারে লিপ্ত হয় না, সে এমন পাক-পরিষ্কার হয়ে ফিরে আসে, যেন আজই সে মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে।'[১]

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৭৩৯, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৬৮৩৯

হজ্জ একটি প্রেমসিক্ত ইবাদত *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

'মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

পবিত্র রমাযান মাস অতিবাহিত হয়ে শাওয়াল মাস আরম্ভ হয়েছে। শাওয়াল মাস ঐ সমস্ত মাসের অন্যতম, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হজ্জের মাস বলেছেন। শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের দশ দিনকে আল্লাহ তা'আলা হজ্জের মাস সাব্যস্ত করেছেন।

রমাযানুল মুবারক থেকে আরম্ভ করে যিলহজ্জ মাসের এ দিনগুলোকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব ইবাদতের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, যা কেবল এ দিনগুলোতেই সম্পাদন করা সম্ভব। সুতরাং রমাযান মাসকে আল্লাহ তা'আলা রোযা ও তারাবীহর জন্যে নির্ধারণ করেছেন। শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসকে নির্ধারণ করেছেন হজ্জ ও কোরবানীর জন্যে। হজ্জ ও

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ৪৫-৫৮

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭

কোরবানী এমন ইবাদত, যা এ দিনগুলো ছাড়া অন্য দিনে সম্পাদন করা যায় না। যেন ইবাদতের একটা ধারা রমাযান থেকে শুরু হয় এবং যিলহজ্জে এসে শেষ হয়। এ কারণে এ মাসগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান।

শাওয়াল মাসের ফযীলত

রমাযান মাস তো সমস্ত মাসের মধ্যে অধিকতর বরকতময়। আর শাওয়াল মাস সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

'যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব দান করবেন।'[১]

কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নেকীর সওয়াব দান করেন দশগুণ। তাই যখন কোনো ব্যক্তি রমাযান মাসে ত্রিশটি রোযা রাখে, তখন তার দশগুণ হয় তিনশ'। তারপর যখন শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখে, তার দশগুণ হয় ষাট। এভাবে সব রোযার সওয়াব মিলে তিনশ' ষাট দিনের সমান হয়। আর বছরও হয় তিনশ' ষাট দিনে। এ জন্যে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি রমাযানের সাথে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে তাহলে সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো। শাওয়ালের ছয় রোযার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এ সওয়াব দান করেন। ঈদুল ফিতরের পর অবিলম্বে এ ছয় রোযা রাখা উত্তম। কিন্তু যদি সাথে সাথে রাখতে না পারে তাহলে সারা মাসের মধ্যে তা পুরো করবে।

শাওয়াল মাসে পুণ্য কাজ

এ শাওয়াল মাসেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিয়ে হয়েছিলো। এ মাসেই তাঁকে রাসূল

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৮৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯০, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ২০৭৮, সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭০৫, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৩৭৮৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে দেয়া হয়েছিলো। এ কারণে এ মাসে বরকতের অনেক উপকরণেরই সম্মিলন ঘটেছে।

যিলকদ মাসের ফযীলত

এর পরবর্তী যিলকদ মাসও হজ্জের মাসের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে তাইয়েবায় অবস্থানের পুরো সময়ে হজ্জ ছাড়া চারটি ওমরা করেছেন। এ চার ওমরাই তিনি যিলকদ মাসে আদায় করেছেন। এ কারণেও এ মাস মর্যাদামণ্ডিত।

যিলকদ মাস অশুভ নয়

আমাদের সমাজে যিলকদ মাসকে অশুভ মনে করা হয়। একে বরকতশূন্য মাস বলা হয়। এ মাসে বিয়ে-শাদী করা হয় না। কোনো আনন্দানুষ্ঠান করা হয় না। এ সবই অহেতুক ও কু-সংস্কার। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। যাইহোক, এ তিনটি হলো হজ্জের মাস। তাই আজকে হজ্জের বিষয়ে কিছু বয়ান করার ইচ্ছা করছি।

হজ্জ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ

হজ্জ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ঈমানের পর ইসলামের চারটি স্তম্ভ রয়েছে- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ। এ চারটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি।

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্যে ইবাদতের যে বিভিন্ন পন্থা নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে প্রত্যেকটির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, নামাযের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, রোযার আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে, যাকাতের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং হজ্জের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য।

ইবাদত তিন প্রকার

সাধারণত ইবাদতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

এক. দৈহিক ইবাদত, যার সম্পর্ক মানুষের দেহের সঙ্গে। দেহ দ্বারা তা সম্পন্ন করা হয়। যেমন, নামায একটি দৈহিক ইবাদত।

দুই. আর্থিক ইবাদত। যার মধ্যে দেহের কোনো ভূমিকা নেই। তবে তাতে পয়সা খরচ হয়। যেমন, যাকাত ও কোরবানী।

তিন. ঐ সমস্ত ইবাদত, যেগুলো দৈহিকও এবং আর্থিকও। যেগুলো সম্পাদন করতে মানুষের দেহেরও ভূমিকা থাকে এবং অর্থেরও ভূমিকা থাকে। যেমন, হজ্জ। হজ্জ সম্পাদন করতে মানুষের দেহও লাগে এবং সম্পদও ব্যয় হয়। তাই এ ইবাদত দেহ ও অর্থের সমন্বয়ে সম্পাদিত হয়। হজ্জের মধ্যে প্রেমসুলভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা হজ্জের মধ্যে এমন সব কর্মকাণ্ড রেখেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইশ্‌ক ও মহব্বত প্রকাশ পায়।

এহরামের উদ্দেশ্য

যখন হজ্জ আরম্ভ হয়, তখন সর্ব প্রথম এহরাম বাধা হয়। সাধারণত মানুষ মনে করে যে, এ চাদরগুলো পরাই এহরাম। অথচ শুধু এ চাদরের নাম এহরাম নয়। এহরামের অর্থ হলো, অনেকগুলো জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেয়া।

একজন মানুষ যখন হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে 'তালবিয়া' পাঠ করে, তখন তার উপর অনেকগুলো জিনিস হারাম হয়ে যায়। যেমন সেলাই করা কাপড় পরা হারাম। সুগন্ধি লাগানো হারাম। নখ কাটা হারাম। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রবৃত্তির বৈধ বাসনা পুরা করা হারাম। এ কারণেই তার নাম রাখা হয়েছে 'এহরাম'।

হে আল্লাহ! আমি হাযির

যখন মানুষ হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে এ 'তালবিয়া' পাঠ করে-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

যার অর্থ হলো, হে আল্লাহ আমি হাযির। কেন হাযির হয়েছি? এ কারণে যে, যখন হযরত ইবরাহীম আ. বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হুকুম দিয়েছিলেন-

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

'এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগা হয়ে গেছে।'[১]

হযরত ইবরাহীম আ. একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করে এ ঘোষণা করেন- লোক সকল! এটি আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ইবাদতের জন্যে এখানে আসো। এ আওয়াজ তিনি পাঁচ হাজার বছর আগে দিয়েছিলেন। আজ যখন কোনো ব্যক্তি ওমরা বা হজ্জের নিয়ত করে, তখন প্রকৃতপক্ষে সে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঘোষণার জওয়াব দিয়ে বলে-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

হে আল্লাহ! আমি হাযির এবং বারবার হাযির।

যে সময় বান্দা বলে- আমি হাযির, তখন থেকে এহরামের নিষেধাজ্ঞা আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং এখন সে সেলাই করা কাপড় পরতে পারবে না, সুগন্ধি লাগাতে পারবে না, চুল কাটতে পারবে না, নখ কাটতে পারবে না, নিজের প্রবৃত্তির বৈধ বাসনাও পুরা করতে পারবে না।

এহরাম কাফনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

আল্লাহ তা'আলার ডাকে একজন প্রেমিক বান্দা যেন নিজের প্রভুর প্রেমে দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সবকিছু ত্যাগ করেছে। এতোদিন সে সেলাই করা কাপড় পরা ছিলো, এখন তা সব খুলে ফেলেছে। এখন সে দু'টি চাদর পরিধান করেছে। যা তাকে তার কাফনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এমন এক সময় আসছে, যখন তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় হবে। তখন এটাই হবে তোমার পোশাক। বাদশা হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, সবাই আজ দু'টি চাদর পরে আছে। মানবীয় সমতার এক দৃশ্য তুলে ধরছে। যার দিকেই তাকাবেন, তাকেই আজ দু'টি চাদর পরিহিত দেখতে পাবেন।

তাওয়াফ একটি সু-স্বাদু ইবাদত

তারপর বাইতুল্লাহর নিকট পৌঁছে তার তাওয়াফ করছে। এই তাওয়াফের মধ্যে রয়েছে এক প্রেমসিক্ত বৈশিষ্ট্য। প্রেমিক যেমন নিজের

১. সূরা হজ্জ, আয়াত ২৭

প্রেমাস্পদের ঘরের চর্তুদিকে ঘুরতে থাকে, তেমনি আল্লাহর এ বান্দা আল্লাহর ঘরের চর্তুদিকে ঘুরছে। এভাবে ঘোরা আল্লাহর এতোই প্রিয় যে, তাওয়াফের প্রত্যেক ধাপে একটি করে গোনাহ মাফ হচ্ছে। একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাওয়াফ করার সুযোগ দান করেছেন, তারা আমার এ কথার সত্যায়ন করবেন যে, পৃথিবীতে তাওয়াফের চেয়ে অধিক সু-স্বাদু ইবাদত হয়তো আর কোনোটি নেই।

ভালোবাসা প্রকাশের বিভিন্ন আঙ্গিক

মালিকের সঙ্গে যে প্রেম ও ভালোবাসা রয়েছে মানবস্বভাব তা প্রকাশ করতে চায়। তার গৃহের চর্তুদিকে ঘুরতে, তার দরজা চুম্বন করতে এবং তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। আল্লাহ তা'আলা মানবপ্রকৃতির এ চাহিদাকে পুরা করার যাবতীয় উপকরণ এ বাইতুল্লাহর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন।

কাউকে ভালোবাসলে তাকে আলিঙ্গন করতে মন চায়। তার পাশে থাকতে ইচ্ছে হয়। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মহব্বত তো রয়েছে, কিন্তু তাঁকে তো আলিঙ্গন করা সম্ভব নয়, সরাসরি পদচুম্বন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন- হে আমার বান্দাগণ! এ সব তো তোমরা সরাসরি করতে পারবে না, তাই তোমরা এক কাজ করো, এটা আমার ঘর এই ঘরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করো। এ ঘরের মধ্যে একটি হাজরে আসওয়াদ রেখেছি, তোমরা তাকে চুম্বন করো। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার মাধ্যমে ইশ্‌ক ও মহব্বত প্রকাশ পাবে। যদি আমাকে জড়িয়ে ধরতে মন চায় তাহলে আমার এই ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে যে দেয়াল রয়েছে- যাকে 'মুলতাযাম' বলা হয়- তাকে জড়িয়ে ধরো। একে জড়িয়ে ধরে তোমরা যা কিছু আমার নিকট চাইবে, আমি ওয়াদা করছি- তোমাদেরকে তা দেবো। এ প্রেমসিক্ত বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা হজ্জের মধ্যে রেখেছেন। মানুষের নিজের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সুযোগ আর কোথাও লাভ হবে না, যা এখানে লাভ হয়।

ইসলাম ধর্মের মধ্যে মানবপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে

আমাদের ইসলাম ধর্মের শান বিস্ময়কর। একদিকে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একে শিরক ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি মূর্তি পূজা করবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, এ মূর্তি হলো প্রাণহীন পাথর। তার মধ্যে না উপকার করার ক্ষমতা রয়েছে, না ক্ষতি করার। অপরদিকে মানবপ্রকৃতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমের প্রকাশ ঘটাতে চায়। প্রেমের বহিঃপ্রকাশের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহকে একটি চিহ্ন বানিয়েছেন। সাথে এ কথা বলে দিয়েছেন যে, বাইতুল্লাহর সত্তার মধ্যে কিছু নেই। কিন্তু যেহেতু আমি আমার দিকে সম্বোধন করে বলেছি যে, এটি আমার ঘর। আমিই এর মধ্যে পাথর রেখেছি, যাতে তোমাদের আবেগ প্রশমিত হয়। এই সম্বন্ধের পর এ ঘরের প্রদক্ষিণ করা এবং এর পাথর চুম্বন করা ইবাদত হয়ে গেছে।

হাজরে আসওয়াদের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর বক্তব্য

এ কারণেই হযরত ওমর ফারূক রাযি. যখন হজ্জ করতে গেলেন এবং হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তাকে চুম্বন করতে চাইলেন, তখন হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে বললেন- হে হাজরে আসওয়াদ! আমি জানি তুই একটি পাথর, না ক্ষতি করতে পারিস, না উপকার। আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোকে চুম্বন করতাম না।[১]

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ সুন্নাত চালু করেছেন, এ কারণে একে চুম্বন করা ইবাদত হয়েছে।

সবুজ বাতির মাঝে দৌড়ানো

তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সা'য়ী' করা হচ্ছে। সবুজ বাতির নিকট পৌঁছতেই দৌড়াতে আরম্ভ করছে। যাকে দেখছো

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৫, পৃ. ১৫৩, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৪৭৭

দৌড়াচ্ছে। গুরুগম্ভীর মানুষ, শিক্ষিত মানুষ- যাদের কখনো দৌড়ানোর অভ্যাস নেই- সবাই দৌড়াচ্ছে। বৃদ্ধ হোক, যুবক হোক, শিশু হোক সকলেই দৌড়াচ্ছে। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। হযরত হাজেরা আ. এখানে দৌড়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর এ আঙ্গিক এত পছন্দ হয়েছিলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মুসলমানের জন্যে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, যে-ই হজ্জ করতে আসবে, সে-ই সাফা-মারওয়ার মাঝে 'সা'য়ী' করবে এবং দৌড়াবে।

এখন মাসজিদুল হারাম ত্যাগ করো!

যিলহজ্জের আট তারিখ যখন এলো, এবার হুকুম হলো, মসজিদে হারাম ত্যাগ করো! মীনায় যাও! সেখানে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো। মক্কায় প্রশান্তির সাথে অবস্থান করছিলো। মসজিদুল হারামে নামায আদায় করছিলো। যেখানে এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান লাভ হচ্ছিলো। কিন্তু এখন হুকুম হলো, মক্কা থেকে বের হয়ে যাও। মীনায় গিয়ে অবস্থান করো। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো। কেন? এ হুকুম দ্বারা এ শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, মৌলিকভাবে মসজিদে হারামে কিছু নেই এবং মৌলিকভাবে বাইতুল্লাহর মাঝেও কিছু নেই। যা কিছু আছে তা আমার হুকুমের মাঝে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে মক্কা মোকাররমায় থাকার হুকুম ছিলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে হারামে এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান লাভ হচ্ছিলো। এখন যখন আমার হুকুম হয়েছে- এখান থেকে চলে যাও, এখন আর এখানে অবস্থান করা জায়েয নেই।

এখন আরাফায় চলে যাও!

মীনায় অবস্থান করার পর এখন তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত রয়েছে বিস্তৃত ময়দান। যেখানে কোনো ভবন নেই, নেই কোনো ছায়া। তুমি এখানে একদিন অতিবাহিত করবে। এ দিনটি এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, যোহর ও আছরের নামায এক সঙ্গে আদায় করবে। এরপর মাগরিব পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকবে। আমার যিকির করতে থাকবে। আমার নিকট দু'আ করতে

থাকবে। এবং তিলাওয়াত করতে থাকবে। মাগরিব পর্যন্ত এখানে অবস্থান করবে।

এখন মুযদালিফায় চলে যাও!

আরাফায় তো তোমাদের তাবু টানানোর অনুমতি ছিলো। এখন আমি তোমাদেরকে এমন এক ময়দানে নিয়ে যাবো, যেখানে তোমরা তাবুও টানাতে পারবে না, সেটা হলো মুযদালিফা। সূর্যাস্তের পর সেখানে অবস্থান করো এবং রাত কাটাও।

মাগরিবকে ইশার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ো

অন্যান্য দিনে হুকুম হলো, সূর্যাস্ত হতেই অবিলম্বে মাগরিব নামায আদায় করো। কিন্তু আজকে হুকুম হলো, মুযদালিফায় যাও। সেখানে গিয়ে মাগরিব ও ইশার নামায একসঙ্গে আদায় করো। এসব হুকুমের মাধ্যমে এ কথা বলা হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে বলেছিলাম, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি পড়া তোমাদের জন্যে ওয়াজিব ছিলো। এখন যখন আমি বললাম, বিলম্বে পড়ো, এখন তোমাদের জন্যে বিলম্বে পড়া জরুরী। তাই আমার নির্দেশ না হলে কোনো সময়ের মধ্যেই কিছু নেই।

কংকর নিক্ষেপ করা যুক্তিবিরোধী

পদে পদে আল্লাহর সাধারণ আইন ভেঙ্গে বান্দাকে এ কথা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তোমার কাজ তো হলো আমার ইবাদাত করা, আমার হুকুম পালন করা। আমার হুকুম না হলে কোনো কিছুই মৌলিকভাবে কোনো কিছুই ধারণ করে না। এবার মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে যাও। সেখানে তিন দিন অতিবাহিত করো। এখানে তিন দিন কেন অতিবাহিত করবে? এখানে কাজ কী? এখানে তোমার কাজ হলো, মীনায় তিনটি স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলোকে 'জামারাত' বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তিন দিন পর্যন্ত প্রতিদিন এগুলোতে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করবে। এ কাজটিকে যুক্তি-বুদ্ধির পাল্লায় একটু মেপে দেখুন, অহেতুক ও অর্থহীন দেখতে পাবেন। গত বছর ২৫ লাখ মুসলমান হজ্জ করেছে। এই ২৫ লাখ মানুষ তিন দিন পর্যন্ত মীনায় পড়েছিলো। যাদের পেছনে কোটি

কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাদের সবার এই একই চিন্তা যে, 'জামারা'সমূহে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করবে। সকলে শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ, কিন্তু যার দিকে তাকাবেন সেই কংকর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর সেগুলো 'জামারা'য় নিক্ষেপ করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমি আমলটি সম্পন্ন করতে পারলাম।

আল্লাহর হুকুম সবকিছুর উপর অগ্রগণ্য

এই কংকর নিক্ষেপ করার কাজটি কি এমন, যার জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা যায়? আসল কথা হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এ শিক্ষা দিতে চান যে, কোনো কাজের মধ্যেই যুক্তি-বুদ্ধির প্রশ্ন নেই। আমার হুকুম যখন আসে, তখন যে কাজকে তোমরা পাগলামী মনে করছিলে, সেটাই বুদ্ধির কাজে পরিণত হয়ে যায়। যখন আমার হুকুম এসেছে, এ পাথরগুলো নিক্ষেপ করো। তখন পাথর নিক্ষেপ করাই তোমাদের কাজ। এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্যে সওয়াব ও পুরস্কার। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করছেন। এ কারণে আমরা আমাদের অন্তরে যুক্তি-বুদ্ধির যে মূর্তি নির্মাণ করেছি, হজ্জের ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পদে পদে সেই মূর্তিকে চূর্ণ করছেন এবং শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এসব মূর্তির কোনো হাকীকত নেই। আরও শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এ বিশ্ব জগতে কোনো কিছু মানার থাকলে তা কেবল আমার হুকুম। আমার হুকুম যখন আসবে, তা তোমার বুদ্ধিতে ধরুক বা না ধরুক, তার সামনে তোমার মাথা নত করতে হবে। সে অনুপাতে আমল করতে হবে। পুরো হজ্জের মধ্যে এ প্রশিক্ষণই দেয়া হচ্ছে।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের অনেক ফযীলত বয়ান করেছেন- 'যে ব্যক্তি হজ্জে মাবরূর করে ফিরে আসে, সে গোনাহ থেকে এমনভাবে পাক-সাফ হয়ে যায়, যেন সে মায়ের পেট থেকে আজ জন্ম নিয়েছে।'[১]

আল্লাহ তা'আলা এ ইবাদতকে এত মর্যাদা দিয়েছেন!

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৭৩৯, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৬৮৩৯

হজ্জ কার উপর ফরয?

হজ্জ কার উপর ফরয? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা দিয়েছেন, যা আমি এইমাত্র আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

'আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করা মানুষের উপর ফরয। এটা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয, যে সেখানে যাওয়ার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে।'[১]

অর্থাৎ, তার নিকট এ পরিমাণ টাকা পয়সা রয়েছে যে, সে বাহনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। ফুকাহায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, যা দিয়ে সে হজ্জে যেতে, হজ্জের সময় নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং সেখান থেকে ফেরা পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনের পানাহারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ ফরয।

কিন্তু আজকাল মানুষ হজ্জ করার জন্যে নিজেদের উপর এমন অনেক শর্ত আরোপ করে নিয়েছে, শরীয়তে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭

হজ্জ করতে বিলম্ব কেন?*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

গত জুমায় এ আয়াতের উপরেই আলোচনা করেছিলাম। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আয়াতের অর্থ হলো-

'আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। যদি সে বাইতুল্লাহ যাওয়ার সামর্থ্য রাখে।'[১]

হজ্জ ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ ফরয করেছেন। হজ্জ ফরয হলে দ্রুত তা আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। বিনা কারণে হজ্জ করতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কারণ, মানুষের বাঁচা মরার কোনো ঠিকানা নেই। হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করার পূর্বে যদি কেউ দুনিয়া থেকে চলে যায়, তাহলে তার দায়িত্বে বিরাট বড় ফরয রয়ে যায়। এ কারণে হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা দ্রুত আদায় করার চিন্তা ও চেষ্টা করা উচিৎ।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ৬০-৭৪,

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭

আমরা বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নিয়েছি

কিন্তু বর্তমানে আমরা হজ্জ করার জন্যে নিজেদের উপর অনেক ধরনের শর্ত আরোপ করে নিয়েছি। এমন অনেক বিধি-নিষেধ নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছি, শরীয়তে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। অনেকে মনে করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জাগতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরা না হবে- যেমন, বাড়ি বানানো না হবে, মেয়েদের বিয়ে না হবে- ততোক্ষণ পর্যন্ত হজ্জ করা উচিৎ নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। বরং যখন কারো কাছে এ পরিমাণ সম্পদ হবে, যা দিয়ে সে হজ্জ করতে পারে বা তার মালিকানায় এ পরিমাণ স্বর্ণ ও অলংকার থাকবে, যা বিক্রি করলে এ পরিমাণ টাকা হবে, যার দ্বারা হজ্জ করা সম্ভব, তাহলেও হজ্জ ফরয হয়ে যায়। তাই হজ্জ ফরয হওয়ার পর তার জন্যে কোনো কিছুর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

হজ্জ সম্পদের বরকতের কারণ

তাই এরূপ চিন্তা করা যে, আমার দায়িত্বে অনেক কাজ রয়েছে। বাড়ি তৈরী করতে হবে, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। এ টাকা হজ্জের পিছনে ব্যয় করলে এসব কাজের জন্যে টাকা কোথায় পাবো? এসব অর্থহীন চিন্তা। আল্লাহ তা'আলা হজ্জের এ বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, তাঁর অপার অনুগ্রহে হজ্জ করার ফলে আজ পর্যন্ত কেউ দরিদ্র হয়নি। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

'আমি হজ্জ ফরয করেছি যাতে তারা স্বচক্ষে ঐসব ফায়দা দেখতে পারে, যেগুলো আমি তাদের জন্যে হজ্জের মধ্যে রেখেছি।'[১]

হজ্জের অসংখ্য ফায়দা রয়েছে। যেগুলো বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তার মধ্যে একটি ফায়দা এই যে, আল্লাহ তা'আলা রিযিকের মধ্যে বরকত দান করেন।

হজ্জ করার কারণে আজ পর্যন্ত কেউ ফকির হয়নি

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বাইতুল্লাহর হজ্জ করে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না, যার সম্পর্কে বলা

---

১. সূরা হজ্জ, আয়াত ২৮

যেতে পারে যে, সে তার টাকা-পয়সা হজ্জের পিছনে ব্যয় করার কারণে ফকীর ও দেউলিয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এমন অসংখ্য লোক আপনারা পাবেন, হজ্জের বরকতে আল্লাহ তা'আলা যাদের রিযিকের মধ্যে বরকত দান করেছেন। প্রশস্ততা ও সচ্ছলতা দান করেছেন। তাই এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণই ভুল যে, দুনিয়ার অমুক অমুক কাজ শেষ না করা পর্যন্ত হজ্জ করবো না।

মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়া হজ্জের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা ওয়াজিব-ফরযও নয়। কোনো ব্যক্তি যদি মক্কা মুকাররমায় গিয়ে হজ্জ করে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় না যায় তাহলে তার হজ্জের মধ্যে কোনো ত্রুটি হবে না। তবে এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হতে পারা মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে এ সৌভাগ্য দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযায় হাজির হয়ে সালাম পেশ করার তাওফীক দান করুন, আমীন। মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়া যেহেতু হজ্জের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ জন্যে ফকীহগণ লিখেছেন- যদি কোনো ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ টাকা থাকে যে, সে মক্কা মুকাররমায় গিয়ে হজ্জ তো আদায় করতে পারে, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার টাকা নেই। তাহলেও তার উপর হজ্জ ফরয। হজ্জ শেষ করে মক্কা মুকাররমা থেকেই তার চলে আসা উচিৎ। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযায় হাজির হতে পারা এত বড় নেয়ামত যে, মানুষ সারা জীবন তার বাসনা পোষণ করে থাকে। এ জন্যে কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত হজ্জকে বিলম্বিত করা ঠিক নয়।

মা-বাবাকে আগে হজ্জ করানো জরুরী নয়

অনেকে মনে করে, মা-বাবাকে হজ্জ করানোর পূর্বে আমাদের হজ্জ করা ঠিক নয়। এ চিন্তা এত ব্যাপক রূপ লাভ করেছে যে, বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি হজ্জে যেতে চাই, কিন্তু আমার মা-বাবা হজ্জ করেননি। তাই মানুষ বলে, মা-বাবাকে হজ্জ করানোর পূর্বে তুমি যদি হজ্জ করো, তোমার হজ্জ কবুল হবে না। এটা কেবলই অজ্ঞতা নির্ভর কথা। যার যার ফরয তার তার উপর। যেমন মা-বাবা নামায না পড়লে ছেলের উপর থেকে নামাযের দায়িত্ব রহিত হয়ে

যায় না। অর্থাৎ মা-বাবা নামায না পড়লে ছেলে নামায পড়তে পারবে না, এমন নয়। ছেলের নিকট তার নামাযের ব্যাপারে পৃথকভাবে প্রশ্ন করা হবে, আর মা-বাবার নিকটও তাদের নামাযের ব্যাপারে পৃথকভাবে প্রশ্ন করা হবে। হজ্জের বিষয়টিও তেমনই। মা-বাবার উপর যদি হজ্জ ফরয না হয়ে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তারা হজ্জে না গিয়ে থাকলে কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আপনার উপর যদি হজ্জ ফরয হয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্যে হজ্জে যাওয়া জরুরী। এটাও জরুরী নয় যে, আগে মা-বাবাকে হজ্জ করাবেন, তারপর নিজে করবেন। এসব ভুল চিন্তা। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমলের জবাবদিহি করতে হবে। তাই প্রত্যেকের নিজের আমলের জন্যে চিন্তা-চেষ্টা করা উচিৎ।

হজ্জ না করার কারণে কঠোর ধমকি

আমাদের মধ্যে এমন অনেক মুসলমান রয়েছেন, যারা ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত কাজে লম্বা লম্বা সফর করে থাকেন। ইউরোপ যান, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপান ভ্রমণ করেন। কিন্তু আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়ার তাওফীক হয় না। এটা চরম বঞ্চনার ব্যাপার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে কঠোর ধমকি দিয়েছেন, যে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করে না। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন- যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তারপরও সে হজ্জ না করে মারা গেলো, সে ইহুদী হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।[১]

তাই হজ্জ করতে বিলম্ব করা আর এরূপ চিন্তা করা যে, সময় সুযোগ মতো হজ্জ করবো, এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়।

মেয়েদের বিয়ের অজুহাতে হজ্জ বিলম্বিত করা

অনেকে এরূপ মনে করে যে, মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে হবে। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার আগে হজ্জ করবো না। এটাও ভিত্তিহীন কথা। এটা ঠিক এমন, যেমন কেউ বললো, মেয়েদের বিয়ে দেয়ার পর নামায

---

১. সুনানুদ দারেমি, হাদীস নং ১৭১৯

পড়বো। ভাই! আল্লাহ যে ফরয আরোপ করেছেন, তা পালন করতে হবে। তা অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়।

হজ্জের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করুন

তবে হজ্জ একটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। তা হলো, যদি কোনো ব্যক্তির ঋণ থাকে, তাহলে ঋণ পরিশোধ করা হজ্জের উপর অগ্রগণ্য। ঋণ পরিশোধ করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে তাগিদ দিয়েছেন। মানুষের উপর ঋণ থাকা উচিৎ নয়। দ্রুত তা পরিশোধ করা উচিৎ। তাছাড়া মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক কিছুকে হজ্জের উপর অগ্রগণ্য করে রেখেছে। যেমন, প্রথমে ঘর বানাবো, বা বাড়ি ক্রয় করবো, বা গাড়ি ক্রয় করবো, তারপরে হজ্জে যাবো। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।

হজ্জের জন্যে বার্ধক্যের অপেক্ষা করা

অনেক মানুষ চিন্তা করে যে, যখন বার্ধক্য আসবে, তখন হজ্জে যাবো। যুবক অবস্থায় হজ্জে যাওয়ার কী প্রয়োজন? হজ্জ করা তো বুড়োদের কাজ। যখন বুড়ো হবো এবং মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন হজ্জে যাবো।

মনে রাখবেন! এটা শয়তানের ধোঁকা। কোনো ব্যক্তি বালেগ হওয়ার পর হজ্জ করার সামর্থ্য থাকলে তার উপর হজ্জ করা ফরয হয়ে যায়। হজ্জ ফরয হয়ে গেলে দ্রুত পালন করা উচিৎ। বিনা কারণে বিলম্ব করা জায়েয নেই। জানা তো নেই, বার্ধক্য পর্যন্ত বেঁচে থাকবো কিনা? বরং বাস্তবে হজ্জ তো যৌবনকালের ইবাদত। যৌবনকালে মানুষের শক্তি মজবুত থাকে। শরীর সুস্থ থাকে। সে সময় মানুষ সহজে হজ্জের কষ্ট সইতে পারে। তাই বার্ধক্যাবস্থায় হজ্জ করবো, এমন চিন্তা করা ঠিক নয়।

ফরয হজ্জ না করলে অসিয়ত করে যাবে

এখানে এ মাসআলাটিও বলে দেই যে, ধরুন কেউ যদি হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও জীবদ্দশায় হজ্জ করতে না পারে, তখন তার উপর এ অসিয়ত করে যাওয়া ফরয যে, আমি যদি জীবদ্দশায় ফরয হজ্জ আদায় করতে না পারি তাহলে আমার মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা কাউকে আমার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পাঠাবে। আপনি যদি

অসিয়ত করে যান, তাহলে আপনার ওয়ারিসদের উপর আপনার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করানো জরুরী হবে, নইলে নয়।

শুধুমাত্র একতৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা হজ্জ করা হবে

আপনার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করা ওয়ারিসদের উপর তখন জরুরী হবে, যখন হজ্জের পুরো ব্যয় আপনার পরিত্যক্ত সম্পদের একতৃতীয়াংশ দ্বারা করা সম্ভব হবে। যেমন মনে করুন, হজ্জের ব্যয় হলো এক লাখ টাকা, আর আপনার পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ হলো, তিন লাখ বা তার চেয়ে বেশি, সে ক্ষেত্রে এ অসিয়ত কার্যকর হবে। আপনার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করানো ওয়ারিসদের উপর জরুরী হবে। কিন্তু যদি হজ্জের ব্যয় হয় এক লাখ টাকা, আর আপনার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হয় তিন লাখের চেয়ে কম, তাহলে আপনার বদলি হজ্জ করানো ওয়ারিসদের উপর জরুরী হবে না। কারণ, শরীয়তের মূলনীতি হলো, আমাদের সম্পদের উপর আমাদের অধিকার ততোক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর অন্তিম রোগ চেপে না বসবে। তখন আমাদের সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবো। কিন্তু অন্তিম রোগ শুরু হওয়া মাত্র সম্পদের উপর থেকে আমাদের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ সম্পদ তখন ওয়ারিসদের হয়ে যায়। তবে একতৃতীয়াংশ সম্পদের উপর তখনও আমাদের অধিকার বলবৎ থাকে।

সমস্ত ইবাদতের 'ফিদ্ইয়া' একতৃতীয়াংশ থেকে আদায় হবে

তাই আমাদের দায়িত্বে যদি নামায বাকী থেকে থাকে, তাহলে সে নামাযের 'ফিদ্ইয়া' ঐ একতৃতীয়াংশ থেকে আদায় করা হবে। যদি রোযা ছুটে গিয়ে থাকে, তাহলে সে রোযার 'ফিদ্ইয়া'ও দেয়া হবে ঐ একতৃতীয়াংশ থেকে। যদি যাকাত বাকী থেকে থাকে, তাহলে তাও আদায় করা হবে ঐ একতৃতীয়াংশ থেকে। যদি হজ্জ বাকী থেকে থাকে, তাহলে তাও ঐ একতৃতীয়াংশ থেকে আদায় করা হবে। একতৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অসিয়ত পুরা করা ওয়ারিসদের জন্যে জরুরী নয়। এ জন্যে জীবদ্দশায় হজ্জ না করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, আমরা যদি অসিয়ত করেও যাই যে, আমাদের মাল দ্বারা যেন হজ্জ করানো হয়। কিন্তু আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি এ পরিমাণ না থাকে, যার

একতৃতীয়াংশের দ্বারা হজ্জ আদায় করা সম্ভব। তখন তাদের উপর ঐ অসিয়ত পুরা করা জরুরী নয়। যদি তারা হজ্জ করায় তবে তা হবে আমাদের উপর তাদের পক্ষ থেকে দয়া। আর যদি হজ্জ না করায় তবে এর জন্যে আখেরাতে তাদেরকে ধরা হবে না।

মৃত ব্যক্তির শহর থেকে বদলি হজ্জ করতে হবে

কেউ কেউ বদলি হজ্জ করানোর সময় এরূপ চিন্তা করে যে, আমি যদি করাচী থেকে হজ্জ করাই তাহলে এক লাখ টাকা ব্যয় হবে। তাই আমি মক্কা শরীফের কাউকে টাকা দিয়ে দেই, সেখান থেকে সে হজ্জ করবে। মনে রাখবেন! এ ব্যাপারে মাসআলা হলো, কঠিন সমস্যা ছাড়া এভাবে বদলি হজ্জ আদায় হয় না। আমি যদি করাচীতে থাকি আর আমার দায়িত্বে হজ্জ ফরয হয়, এমতাবস্থায় যদি আমি কাউকে আমার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পাঠাই তাহলে তাকেও করাচী থেকে যেতে হবে। এমন করা যাবে না যে, মক্কা শরীফ থেকে কাউকে ধরে দু'শ' টাকায় হজ্জ করিয়ে দিলাম। আমি যেহেতু করাচীতে বাস করি, তাই আমার শহর থেকে বদলি হজ্জ করাতে হবে, মক্কা শরীফ থেকে নয়।

যৌক্তিক কারণে মক্কা শরীফ থেকে হজ্জ করানো

এটা ভিন্ন কথা যে, একজন মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেছে। সে কোনো সম্পদ রেখে যায়নি। এখন তার ওয়ারিসরা চিন্তা করলো, আর কিছু করা না গেলেও কমপক্ষে কাউকে মক্কা শরীফ থেকে পাঠিয়েই তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো হোক। তাহলে আইনগতভাবে তো তা বদলি হজ্জ হবে না। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন, সে তার দয়া। একদম না করার চেয়ে এটা ভালো। তবে আইন ও বিধান এটাই যে, যার দায়িত্বে হজ্জ ওয়াজিব, তার শহর থেকেই বদলি হজ্জে যেতে হবে।

আইনগত জটিলতা ওযর

বর্তমান অবস্থা হলো, হজ্জ করা নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত নয়। কারণ, হজ্জ করার উপর অনেকগুলো আইনগত বিধি নিষেধ রয়েছে। যেমন, প্রথমে দরখাস্ত দাও। তারপর লটারীতে নাম উঠতে হবে, ইত্যাদি। এ

কারণে কারও উপর হজ্জ ফরয হলো এবং সে হজ্জে যাওয়ার জন্যে আইনানুগ চেষ্টা করলো, কিন্তু তারপরও হজ্জে যেতে পারলো না, তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে 'মাযুর'। তবে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করবে এবং হজ্জে যাওয়ার আইনানুগ যতো ব্যবস্থা আছে তা অবলম্বন করবে। আর যদি অলস হয়ে বসে থাকে, যাওয়ার জন্যে কোনো চিন্তা-চেষ্টাই না করে, তাহলে সে গোনাহগার হবে।

হজ্জ করলে হজ্জের স্বাদ বুঝতে পারবে

আপনি যখন একবার হজ্জ করে আসবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে, এই ইবাদতের মধ্যে কী আকর্ষণ আর কী স্বাদ রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা এই ইবাদতের মধ্যে এক অসাধারণ ভাব রেখেছেন। হজ্জের মধ্যে সমস্ত কাজ বিবেক বিরোধী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই ইবাদতের মধ্যে ইশ্‌কের যে শান রেখেছেন, তার ফলে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বত, তাঁর আযমত ও তাঁর ইশ্‌ক মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। যখন সে হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন এমন হয়, যেন সে আজ মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে।

নফল হজ্জের জন্যে গোনাহে লিপ্ত হওয়া জায়েয নেই

মানুষ যখন একবার হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন তার পিপাসা আরও বৃদ্ধি পায়। বারবার যেতে মন চায়। আল্লাহ তা'আলা বারবার যেতে নিষেধও করেননি। ফরয তো করেছেন জীবনে একবার, কিন্তু দ্বিতীয়বার যাওয়ার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সুযোগ হলে মানুষ নফল হজ্জে যেতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নফল ইবাদত করতে গিয়ে যেন কোনো গোনাহে লিপ্ত হতে না হয়। কারণ, নফল ইবাদত না করলে গোনাহ হবে না। অপরদিকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। যেমন হজ্জের আবেদন করার সময় লিখতে হয় যে, আমি ইতিপূর্বে হজ্জ করিনি। এখন আপনি নফল হজ্জ করার জন্যে লিখে দিলেন যে, আমি ইতিপূর্বে হজ্জ করিনি। এভাবে আপনি মিথ্যা বলার গোনাহ করলেন। আর মিথ্যা বলা হারাম। মিথ্যা থেকে বাঁচা ফরয। আপনি নফল ইবাদতের জন্যে মিথ্যা বলার গোনাহে লিপ্ত হলেন।

শরীয়তে নফল ইবাদতের জন্যে মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নেই। এভাবে মিথ্যা বলা নাজায়েয এবং হারাম।

হজ্জের জন্যে সুদি কারবার করা জায়েয নেই

এমনিভাবে স্পন্সরশীপের মাধ্যমে হজ্জের দরখাস্ত করতে চাইলে তার জন্যে বিদেশ থেকে ড্রাফট করিয়ে আনতে হয়। কেউ কেউ এখান থেকেও ক্রয় করে। যে কারণে সুদি কারবারে লিপ্ত হতে হয়। সুদি কারবার করে নফল হজ্জে যাওয়ার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই।

নফল হজ্জের পরিবর্তে ঋণ পরিশোধ করুন!

এমনিভাবে একজনের দায়িত্বে ঋণ রয়েছে। ঋণ পরিশোধ করা মানুষের প্রথম কর্তব্য। এখন সে ঋণ পরিশোধ করছে না, কিন্তু প্রতিবছর হজ্জে যাচ্ছে। যেন ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদত করতে যাচ্ছে। এটাও নাজায়েয-হারাম।

নফল হজ্জের পরিবর্তে খোরপোশ দিবে

এমনিভাবে এক ব্যক্তি নফল হজ্জ করছে এবং নফল ওমরাহ করছে অথচ যাদের খোরপোশ তার উপর ওয়াজিব, তাদের খোরপোশের কষ্ট হচ্ছে। এটা নাজায়েয কাজ। এটা বাড়াবাড়ি।

বরং কারও যদি মনে হয় যে, অমুক কাজে টাকা খরচ করা এখন বেশি জরুরী, তখন নফল হজ্জ ও নফল ওমরার তুলনায় ঐ কাজে টাকা ব্যয় করা অধিক সওয়াবের কারণ হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. নফল হজ্জ ছেড়ে দিলেন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. অত্যন্ত উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। প্রতিবছর হজ্জ করতেন। একবার তিনি কাফেলার সঙ্গে হজ্জে যাচ্ছিলেন। পথে একটি জনপদ অতিক্রম করেন। জনপদের নিকট একটি আঁস্তাকুড় (ডাস্টবিন) ছিলো। সে আঁস্তাকুড়ে একটি মরা মুরগি পড়েছিলো। সেই জনপদ থেকে একটি মেয়ে বের হয়ে এসে সেই মরা মুরগিটা উঠিয়ে দ্রুত ঘরে চলে গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ব্যাপারটি দেখে অবাক হলেন। তিনি লোক পাঠিয়ে মেয়েটিকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন- এ মরা মুরগিটা কেন নিয়ে গেলে? মেয়েটি উত্তর দিলো, আসলে ব্যাপার এই যে, আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন ধরে উপোস চলছে। এ মরা মুরগি খাওয়া ছাড়া আমাদের জান বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিলো না। ঘটনাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.-এর অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। তিনি হজ্জের সফর মুলতবি করেন এবং সফরসাথীদের বলেন যে, আমি হজ্জে যাবো না। হজ্জে যে টাকা ব্যয় হতো তা আমি এ জনপদের লোকদের পিছনে ব্যয় করবো। যাতে তাদের খুৎপিপাসার প্রতিকার হয়।

সমস্ত ইবাদতের মধ্যে ভারসাম্য অবলম্বন করুন

তাই এমন করা উচিত নয় যে, আমার হজ্জ ও ওমরাহ করার আগ্রহ হয়েছে। এখন শরীয়তের অন্যান্য চাহিদা বাদ পড়লেও আমাকে এ আগ্রহ পুরা করতে হবে। শরীয়ত তো ভারসাম্যের নাম। শরীয়ত আমাদের কাছে যখন যে জায়গায় যা চায় তা পুরা করবো। আর দেখবো যে, এ সময় সম্পদ ব্যয় করার সঠিকতম ক্ষেত্র এবং অধিকতর প্রয়োজন কোন্‌টা। নফল ইবাদতের মধ্যে এসব বিষয় লক্ষ্য রাখা বেশি জরুরী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে এবং আপনাদেরকে হজ্জের নূর ও বরকত দান করুন। তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক তা কবুল করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হজ্জ প্রসঙ্গে কয়েকটি নিবেদন*

এখন হজ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হজ্জনীতির ঘোষণাও ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তার নিয়ম-কানুন ও শর্তাবলী প্রকাশ করা হয়েছে। সম্ভবত ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত হজ্জের দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কতিপয় সুধী পাঠক পত্রযোগে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে নানারকম ভুল ধারণা আছে। একটি প্রবন্ধ লিখে যদি সেগুলো দূর করা হয় তাহলে অনেক উপকার হবে। তাদের সেই ফরমায়েশ পালনার্থে সুধী পাঠকের খেদমতে কয়েকটি নিবেদন পেশ করছি-

১. হজ্জ সম্পর্কে অনেকে মনে করে থাকেন, এটি বৃদ্ধকালে করার কাজ। বিধায় জীবনের বিরাট একটি অংশ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ফরযটি আদায়ের প্রতি মানুষের মনোযোগই আকৃষ্ট হয় না। অথচ বাস্তবে বিশেষ কোনো বয়সের সঙ্গে হজ্জের কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষ বালেগ হতেই যেমন তার উপর নামায-রোযা ফরয হয়ে যায় এবং 'নেসাব' পরিমাণ মালের মালিক হলে যাকাত ফরয হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে বালেগ হওয়ার পর হজ্জ করার সামর্থ্য হলে তার উপর হজ্জও ফরয হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন বলে যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয, যে বাইতুল্লাহ গমনের সামর্থ্য রাখে। এই সামর্থ্যের অর্থ হলো, মক্কা মুকাররমা যাতায়াত এবং সেখানে থাকা-খাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনসমূহ পূরণ পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া। তাছাড়া পরিবার-পরিজনকে যদি দেশে রেখে যায়, তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ অর্থ তাদেরকে দিয়ে যেতে পারা। কারো নিকট এ পরিমাণ অর্থ থাকলেই তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যাবে। কারো নিকট যদি এ পরিমাণ নগদ অর্থ না থাকে, কিন্তু তার মালিকানায় এ পরিমাণ গহনা কিংবা প্রয়োজনের অধিক নগদ মাল (যেমন ব্যবসার মাল) থাকে যে, তার মূল্য দ্বারা এ ব্যয় পূরণ হতে পারে, তাহলে তার উপরও হজ্জ ফরয হবে।

---

* যিক্‌র ও ফিক্‌র, পৃ. ২১৪-২১৯

২. হজ্জ ফরয হলে মারাত্মক ওজর ছাড়া তা পালন করতে বিলম্ব করা বা টালবাহানা করা জায়েয নেই। বিনা কারণে হজ্জ পালনে বিলম্ব করলে গোনাহ হয়। বলা বাহুল্য যে, কে কতো দিন বেঁচে থাকবে তা কারো জানা নেই। বিধায় হজ্জ ফরয হওয়ার পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ফরয কাজটি আদায় করা দরকার। বর্তমানে যেহেতু হজ্জের জন্যে দরখাস্ত দিয়ে মঞ্জুর করাতে হয়, তাই যার উপরই উপরোক্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে হজ্জ ফরয হবে, তার উপর হজ্জের জন্যে দরখাস্ত পেশ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী। লটারীতে যদি নাম না ওঠে, কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া না যায়, তাহলে এটা একটা অপারগতা। এমতাবস্থায় দরখাস্ত পেশকারী হজ্জে বিলম্ব করার কারণে গোনাহগার হবে না, ইনশাআল্লাহ। সে যদি প্রতিবছর দরখাস্ত দিতে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব পালন হতে থাকবে। তবে অনুমতি লাভ করা এবং হজ্জ পালন করা পর্যন্ত তাকে এ কাজ করতে হবে। কিন্তু এ চিন্তা একান্তই ভুল এবং ভিত্তিহীন যে, যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখন হজ্জের আবেদন করবে।

বরং সত্য কথা তো এই যে, হজ্জের প্রকৃত স্বাদ লাভ হয় যৌবনকালেই। তার প্রথম কারণ এই যে, হজ্জে শারীরিক পরিশ্রম এবং কষ্ট-ক্লেশের প্রয়োজন পড়ে। হজ্জের কর্মকাণ্ড মানুষ তখনই প্রফুল্লচিত্তে এবং আবেগ-অনুরাগ নিয়ে সম্পাদন করতে পারে, যখন তার শক্তি-সামর্থ্য ঠিক থাকে এবং নিশ্চিন্তে এ সমস্ত পরিশ্রম করতে পারে। অন্যথায় বৃদ্ধকালে যদিও মানুষ কোনো রকমে হজ্জ সম্পন্ন করে, কিন্তু অনেক কাজ এমন আছে, যেগুলো উদ্যম, অনুরাগ ও মনোযোগ সহকারে সম্পাদন না করার জন্যে অন্তরে শুধু আক্ষেপই থেকে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইখলাস ও সহীহ নিয়ত সহ সঠিক পদ্ধতিতে হজ্জ পালন করা হলে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সে হজ্জ অবশ্যই মানুষের অন্তরে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। এমন হজ্জের প্রভাবে মানুষের অন্তরে নম্রতা, আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং আখেরাতের ফিকির পয়দা হয়। এ মনোবৃত্তি তাকে পাপ কাজ এবং অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত রাখে। মন-মস্তিষ্কের এ পরিবর্তন অধিক প্রয়োজন হয় মানুষের

যৌবনকালে। কারণ, তা না হলে মানুষ যৌবনের উন্মাদনায় অন্যায় ও অপরাধের কাজে গা ভাসিয়ে দেয়।

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار
در جوانی توبہ کردن شیوۂ پیغمبری

'বৃদ্ধকালে অত্যাচারী হিংস্র চিতাও সাধু হয়ে যায়।
যৌবনকালে তাওবা করা নবীগণের স্বভাব।'

৩. অনেকের মধ্যে এ ভ্রান্ত ধারণাও পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ে না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত হজ্জ করা ঠিক নয়। এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। যা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। আসল কথা হলো, হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে ছেলে-মেয়ের বিয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। উপরোল্লিখিত মাপকাঠিতে যার হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য হবে, তার উপরই হজ্জ ফরয; ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাক বা না থাক।

৪. কোনো কোনো পরিবারে এ রীতিও দেখা গেছে যে, পরিবারের বড় জন হজ্জ না করা পর্যন্ত ছোটরা হজ্জ করা জরুরী মনে করে না। বরং অনেক পরিবারে বড়রা হজ্জ করার পূর্বে ছোটদের হজ্জ করাকে দোষণীয় মনে করা হয়। অথচ নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি অন্যান্য ইবাদতের মতো হজ্জও এমন একটি ফরয ইবাদত, যা প্রত্যেকের উপর পৃথকভাবে ফরয হয়ে থাকে। অন্যে হজ্জ করুক চাই না করুক, পরিবারের ছোট কারও হজ্জ করার সামর্থ্য হয়ে থাকলে তার উপর হজ্জ ফরয। যদি বড়দের সামর্থ্য না থাকে, কিংবা সামর্থ্য থাকার পরও তারা হজ্জ না করে, তাহলে এতে করে ফরয হজ্জ থেকে ছোটরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় না, কিংবা তাদের বিলম্ব করার বৈধতাও সৃষ্টি হয় না।

৫. অনেক পরিবারে এমন দেখা গেছে যে, পিতার সামর্থ্য নেই, কিন্তু পুত্রের সামর্থ্য আছে। এরপরও তারা মনে করে যে, প্রথমে পিতাকে হজ্জ করাবো তারপর আমি হজ্জ করবো। অথবা পিতাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এ পদ্ধতিও ঠিক নয়। পিতাকে হজ্জ করানো যদিও অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু এ সৌভাগ্য লাভের জন্যে নিজের ফরয কাজে বিলম্ব করা ঠিক নয়। এটা ঠিক তেমনি বৈধ

নয়, যেমন বৈধ নয় রমাযান মাসে অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে পিতা রোযা রাখতে না পারলে পুত্রের নিজের রোযা ছেড়ে দেয়া এবং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে, পিতা রোযা রাখতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত আমিও রোযা রাখবো না। এ কাজ যেমন ভুল, তেমনি নিজের হজ্জকে পিতার হজ্জের জন্যে স্থগিত রাখাও ভুল। যথাসময়ে নিজের হজ্জ সম্পন্ন করবে তারপর সামর্থ্য হলে পিতাকে হজ্জ করানোরও চেষ্টা করবে।

সারকথা হলো, হজ্জ একটি ইবাদত। আর তা প্রত্যেকের উপর ঠিক তেমনই পৃথকভাবে ফরয হয়, যেমন পৃথকভাবে ফরয হয় নামায-রোযা। কারো উপর অন্যকে হজ্জ করানোও ফরয নয় এবং নিজের হজ্জ অন্যের হজ্জের উপর নির্ভরশীলও নয়। বিধায় যাদের দায়িত্বে উপরোক্ত মাপকাঠিতে হজ্জ ফরয হয়েছে, তাদের জন্যে হজ্জের দরখাস্ত জমা দেয়া অবশ্যই জরুরী।

৬. যাদের দরখাস্ত গৃহীত হয়েছে, তাদের জন্যে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে হজ্জের পরিপূর্ণ বিধান এবং নিয়ম-কানুন অবশ্যই শিক্ষা করা উচিত। এর জন্যে প্রত্যেক ভাষায় লিখিত কিতাবসমূহও রয়েছে এবং আমাদের দেশে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হজ্জের প্রশিক্ষণ কোর্সও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা উচিত। দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া এবং হজ্জে যাত্রা করার মাঝে সাধারণত দীর্ঘ সময় হাতে থাকে। হজ্জের আদব-আহকাম শেখার জন্যে সে সময়ই যথেষ্ট। অনেকে এদিকে মনোযোগ না দিয়ে হজ্জে চলে যায় এবং বড় অংকের অর্থ ব্যয় করে এবং এত কষ্ট সহ্য করেও সঠিক পন্থায় হজ্জ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। অনেকে এমন আছেন, যারা নিজেদের এ অজ্ঞতাকে নিজেদের মনগড়া মত ও সিদ্ধান্তের অন্তরালে গোপন করার চেষ্টা করে এবং হজ্জ পালনের পন্থাসমূহে নিজেদের ইচ্ছা মতো পরিবর্তন সাধন করে।

পৃথিবীর প্রত্যেক কাজেরই কিছু নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা রয়েছে। এমনকি খেলাধুলারও নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। বর্তমানে তো খেলাধুলার নিয়ম-কানুন স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোনো ব্যক্তি খেলতে চাইলে তাকে এ সমস্ত নিয়ম-কানুন শিখতে হয় এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে এ সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। আর

হজ্জ তো একটি ইবাদত। অত্যন্ত মহিমান্বিত ও পবিত্র ইবাদত। বিধায় তার আদব-কায়দা ও বিধি-বিধান শিক্ষা করা এবং তা মেনে চলা নেহায়েতই জরুরী। শুধুমাত্র নিজের মতো তার নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দায় পরিবর্তন করা নিজের পরিশ্রম ও অর্থ নষ্ট করারই নামান্তর। যদি নিজের মন মতোই করতে হয়, তাহলে হজ্জের এই লৌকিকতারই বা প্রয়োজন কি?

৭. হজ্জ ইবাদতটি বহু মুসলমান সমবেত হয়ে সম্পাদন করে থাকে এবং হজ্জের সময়ে মানবজাতির সর্ববৃহৎ সমাবেশ ঘটে। বিধায় সেখানে পরস্পরের দ্বারা কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে অধিক। এ জন্যেই ইসলাম হজ্জের বিধান দান কালে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আদায় করেছে, যেন কোনো ব্যক্তি অন্যের কষ্টের কারণ না হয়। পদে পদে এমন সব হেদায়েত দান করেছে, যেগুলোর উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এ উদ্দেশ্যে এমন অনেক কাজ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দান করেছে, যেগুলোর মধ্যে অনেক ফযীলত রয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সঠিক জ্ঞান এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে মানুষ এ সমস্ত বিধানকে পশ্চাতে ফেলে অন্যের প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত সৃষ্টি করে থাকে। যে কাজ সামান্য ধৈর্য-সহ্য অবলম্বন করলে শান্তি-শৃংখলার সাথে পালন করা সম্ভব ছিলো, তার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করা হয় এবং বিনা কারণে হজ্জের মতো মহিমান্বিত ইবাদতকে মল্লযুদ্ধে পরিণত করা হয়। অথচ এমন করা ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং একান্তই অবৈধ। যার ফলে ইবাদতের প্রাণ পদদলিত হয়। সেজন্যে হজ্জের প্রশিক্ষণ কোর্স এবং হজ্জ-নির্দেশিকাসমূহে এ দিকটি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে তার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ আরোপ করা প্রয়োজন। হজ্জযাত্রীবাহী বিমানে সারা পথে এমন সব বক্তৃতা প্রচার করা উচিত, যা জনসাধারণকে এ সমস্ত আদব-আহকাম সম্পর্কে শুধু অবগতই করাবে না, বরং এর গুরুত্বও ভালোভাবে তাদের মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করবে।

[১ জুমাদাল উখরা, ১৪১৫ হিজরী:
৬ নভেম্বর ১৯৯৪ ঈসায়ী]

যাকাত

গুরুত্ব, তাৎপর্য, মাসায়েল

আরবী ভাষায় 'যাকাত' শব্দের অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে ময়লা আবর্জনা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা। যাকাতকে 'যাকাত' এ জন্যেই বলা হয় যে, তা মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে। সেজন্য যে মালের যাকাত দেয়া হয় না তা নাপাক ও অপবিত্র থাকে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা সফল মুমিনের গুণাবলী প্রসঙ্গে বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয যাকাত আদায় করা। দ্বিতীয় অর্থ সম্পর্কে কতক মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে যাকাত দ্বারা তার প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো নিজের নীতি-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা।

যাকাতের গুরুত্ব ও তার নেসাব *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤

'নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ- যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায়কারী।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

বিগত কয়েক জুমআ ধরে সফলকাম মু'মিনদের নিয়ে আলোচনা চলছিলো। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রথম গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা নিজেদের নামাযে 'খুশু' অবলম্বন করে। দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা অসার কাজ থেকে বিরত থাকে। এসব গুণ সম্পর্কে

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ৪৫-৫৮,

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৪

বিস্তারিত আলোচনা বিগত জুমাগুলোতে করা হয়েছে। সফলকাম মু'মিনের তৃতীয় গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

'সফলকাম মু'মিন তারা, যারা যাকাত আদায়কারী।'

'যাকাত' শব্দের দু'টি অর্থ

মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয যাকাত আদায় করা। দ্বিতীয় অর্থ সম্পর্কে কতক মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে যাকাত দ্বারা তার প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো নিজের নীতি-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা।

আরবী ভাষায় 'যাকাত' শব্দের অর্থ যে কোনো জিনিসকে ময়লা আবর্জনা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা। যাকাতকে 'যাকাত' এ জন্যেই বলা হয় যে, তা মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে। যে মালের যাকাত দেয়া হয় না তা নাপাক ও অপবিত্র।

মোটকথা, কেউ কেউ বলেছেন এ আয়াতের অর্থ হলো, নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করা। কিন্তু নিজেকে নিজে ভালো চরিত্রে সজ্জিত করা এবং মন্দ চরিত্র থেকে রক্ষা করা একটি শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এ কারণে এ আয়াতে বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

অর্থাৎ, যেসব লোক নিজেকে মন্দ চরিত্র থেকে বাঁচানোর ধাপ অতিক্রম করে এবং নিজেদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে।

এ আয়াতের এ দু'টি তাফসীর রয়েছে।

যাকাতের গুরুত্ব

আজ এ আয়াতের প্রসিদ্ধ অর্থ অনুপাতে তাফসীর পেশ করছি। অর্থাৎ ঐ সব লোক, যারা যাকাত আদায় করে। সব মুসলমানই জানে যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ এবং অন্যতম ফরয।

নামায যেমন ফরয, যাকাতও তেমন ফরয। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক জায়গায় যাকাতকে নামাযের সাথে যুগপৎ উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

'নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।'

এসব আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায আদায় করা যেভাবে ফরয ও জরুরী, যাকাত আদায় করাও একইভাবে ফরয ও জরুরী। নামায যদি শারীরিক ইবাদাত হয়ে থাকে- যা মানুষ শরীর দ্বারা আদায় করে থাকে- তাহলে যাকাতও একটি আর্থিক ইবাদাত, যা মানুষ আদায় করে থাকে অর্থ-সম্পদ দ্বারা।

যাকাত আদায় না করার উপর ধমকি

যাকাত না দেয়ার উপর কুরআন-হাদীসে অসংখ্য ধমকি এসেছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

'যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ করো।'[১]

অর্থাৎ, যেসব লোক স্বর্ণ-চান্দি পুঞ্জিভূত করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেখানে খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে খরচ করে না। যেমন, যাকাত আদায় করা, ফিতরা

---

১. সূরা তাওবাহ, আয়াত ৩৪-৩৫

আদায় করা, কুরবানী করার হুকুম দিয়েছেন, এমনিভাবে গরীব দুঃখীদের সাহায্য করার হুকুম দিয়েছেন, এ সমস্ত হুকুমের উপর আমল করে না। তাহলে এসব লোককে বেদনাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এরপর পরবর্তী আয়াতে সেসব শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যে, যে মাল ও স্বর্ণ-চান্দি তারা পুঞ্জিভূত করতো তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তাদের কপালে ঐ সম্পদ দ্বারা দাগ দেয়া হবে। লোহা যেমন আগুনে গরম করলে অঙ্গারে পরিণত হয়, এমনিভাবে তাদের সম্পদ ও স্বর্ণ-চান্দিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। যখন তা অঙ্গারে পরিণত হবে, তখন তা দ্বারা তাদের কপালে দাগ দেয়া হবে। তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে- এটা সেই সম্পদ, যা তুমি নিজের নিকট পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। আজ তুমি ঐ সম্পদের স্বাদ চাখো, যা তুমি পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। যারা যাকাত দেয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে কতো কঠিন ধমকি দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, যাকাত কতো বড় ফরয!

যাকাত সম্পদের মহব্বত কমানোর কার্যকরী উপায়

আল্লাহ তা'আলা যাকাত যে ফরয করেছেন তার আসল উদ্দেশ্য তো হলো, আল্লাহর হুকুম পালন করা। তবে এর মধ্যে অসংখ্য উপকারিতাও রয়েছে। একটি উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি যাকাত দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে মালের মহব্বত থেকে হেফাজত করেন। যার অন্তরে মালের মহব্বত রয়েছে সে কখনোই যাকাত দিবে না। কারণ, কৃপণতা ও মালের মহব্বত মানুষের জঘণ্যতম চারিত্রিক দুর্বলতা। আল্লাহ তা'আলা যাকাতের মাধ্যমে এর প্রতিকার করেছেন।

যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

যাকাতের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে অসংখ্য গরীব মানুষের উপকার হয়ে থাকে। আমি একবার সমীক্ষা চালাই যে, পাকিস্তানের সব মানুষ যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে এবং সঠিক খাতে তা ব্যয় করে তাহলে নিশ্চিতভাবে পাকিস্তান থেকে দারিদ্র্য

বিমোচন হবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অনেক মানুষ তো যাকাতই দেয় না। আর যারাও যাকাত দেয়, সঠিকভাবে দেয় না। হিসাব-কিতাব ছাড়া অনুমান করে দেয়। উপরন্তু সঠিক খাতে তা ব্যয় করার উপরও গুরুত্বারোপ করে না। যাকাতের খাত হলো সরাসরি গরীব মানুষ। এ কারণে শরীয়ত যাকাতের অর্থ বড় বড় জনহিতকর ও সেবামূলক কাজে ব্যয় করার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু মানুষ এ মাসআলার পরোয়া করে না। বিভিন্ন খাতে তারা যাকাত ব্যয় করে। যার ফলে যাকাত দ্বারা গরীবদের যে উপকার হওয়ার কথা ছিলো তা হয় না। সঠিকভাবে হিসাব করে সঠিক খাতে যদি যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহলে কয়েক বছরেই দেশের চেহারা বদলে যাবে।

যাকাত আদায় না করার কারণসমূহ

যাকাত যতো বড় ফরয এবং এর মধ্যে যত উপকারিতা রয়েছে, আমাদের সমাজে তার ব্যাপারে ততো বেশি গাফলতি করা হয়ে থাকে। অনেক মানুষ এ কারণে যাকাত আদায় করে না যে, তাদের অন্তরে ইসলামের ফরয ওয়াজিব রোকনের কোনো গুরুত্বই নেই। যে পয়সা আসছে আসতে দাও। যতো পয়সা আসে ততোই গণিমত। এলোপাতাড়িভাবে তা ব্যয় করতে থাকো। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এমন হওয়া থেকে হেফাজত করুন। কিছু লোক এমন আছে, যারা চিন্তা করে যে, আমরা বিভিন্ন দ্বীনি কাজে তো পয়সা খরচ করি। কখনো এ কাজে, কখনো সে কাজে। তাই আমাদের যাকাত তো আপনা আপনি পরিশোধ হয়ে যায়। পৃথকভাবে যাকাত দেয়ার কী প্রয়োজন?

মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞতা

কতক লোক এমন আছে, যাদের জানা নেই, যাকাত কখন ফরয হয়। তারা যাকাতের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের এ কথাও জানা নেই, যাকাত কার উপর ফরয হয়। যার ফলে তারা মনে করে, আমাদের উপর যাকাত ফরযই নয়। অথচ তাদের উপর যাকাত ফরয। তারা এ জন্যে এমন মনে করছে যে, তাদের সঠিক মাসআলাই জানা নেই যে, কার

উপর যাকাত ফরয হয়। পরিণামে তারা সারা জীবন যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে।

যাকাতের 'নেসাব'

ভালো করে বুঝুন যে, শরীয়ত যাকাতের একটি 'নেসাব' নির্ধারণ করেছে। যার নিকট সেই নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। সেই নেসাব হলো সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা। সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার বাজারমূল্য জেনে নিতে হবে। বর্তমান বাজারমূল্য অনুপাতে প্রায় ছয় হাজার টাকা হয়।[১] তাই শরীয়তের বিধান হলো, কারও কাছে যদি নগদ ছয় হাজার টাকা থাকে, বা এই পরিমাণ মূল্য সোনা অথবা রূপার আকারে থাকে, কিংবা ব্যবসার পণ্যের আকারে থাকে, তার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে তা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। অর্থাৎ নিত্যদিনের প্রয়োজনসমূহ এবং স্ত্রী-পরিবারের খোরপোশের অতিরিক্ত হতে হবে। তবে যদি কারও উপর ঋণ থাকে তাহলে যাকাতের নেসাব থেকে ঋণের পরিমাণ বিয়োগ হবে। যেমন, দেখবে যে, আমার কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলে কতো টাকা অবশিষ্ট থাকে। যদি ছয় হাজার বা তারচে' বেশি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না। আর যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে।

প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

কতক লোক মনে করে যে, আমার নিকট ছয় হাজার টাকা তো আছে। কিন্তু তা আমি আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে রেখেছি। আর বিয়ে দেয়াও প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে এ অর্থের উপরে যাকাত ফরয হবে না। এ ধারণা ভুল। কারণ, প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য, নিত্যদিনের পানাহারের প্রয়োজন। অর্থাৎ যদি সে এ টাকাগুলো ব্যয় করে, তাহলে

---

১. এটা অনেক আগের কথা। বর্তমানে আমাদের ঢাকার পাইকারী বাজারে রূপার মূল্য প্রতি তোলা (ভরি) প্রায় বারো শ' পঞ্চাশ টাকা। সোনা-রূপার মূল্য প্রায়ই উঠা-নামা করে, কাজেই যখন যাকাত আদায় করবে, সে সময়ের বাজারমূল্য হিসাব করতে হবে। -সম্পাদক

তার পানাহারের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তার পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে যে সব টাকা রেখেছে, যেমন মেয়ে বিয়ে দিবে, বাড়ি বানাবে কিংবা গাড়ি ক্রয় করবে এবং সে জন্যে অর্থ সঞ্চয় করে রেখেছে, তাহলে এ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে এবং তার উপর যাকাত ফরয হবে।

যাকাত দিলে সম্পদ কমে না

কেউ কেউ বলে, আমি তো এ টাকা মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্যে রেখেছি। এর মধ্য থেকে যদি যাকাত দেই তাহলে টাকা শেষ হয়ে যাবে। এ কথা ঠিক নয়। কারণ, যাকাত তো আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ ২.৫ শতাংশ ফরয করেছেন। অর্থাৎ এক হাজার টাকায় পঁচিশ টাকা। তাই কারও কাছে যদি ৬ হাজার টাকা থাকে তাহলে তার উপর মাত্র দেড়শ' টাকা যাকাত ফরয হবে। যা অতি সামান্য পরিমাণ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা এর এমন এক ব্যবস্থাপনা দিয়েছেন যে, তাঁর হুকুম তামিল করে যে বান্দা যাকাত আদায় করে, সে এর কারণে দেউলিয়া হয় না। বরং যাকাত আদায় করার ফলে তার মালে বরকত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও বেশি দান করেন। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চমৎকার বাক্য ইরশাদ করেছেন-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

'কোনো সদ্‌কা এবং কোনো যাকাত সম্পদ হ্রাস করে না।'[১]

অর্থাৎ মানুষ যাকাতের খাতে যতো টাকা ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো ঐ পরিমাণ সম্পদ দান করেন। কমপক্ষে যে সম্পদ রয়েছে, তার মধ্যে বরকত দান করেন। যে কাজ হাজার টাকায় হওয়ার কথা ছিলো, তা শত টাকায় হয়ে যায়।

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৮৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৬৯০৮, মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ১৫৯০

সম্পদ সঞ্চয় ও গণনার গুরুত্ব

বর্তমানে আমাদের জগতটা হলো বস্তুপূজার জগৎ। এই বস্তুপূজার জগতে সব কাজের ফয়সালা করা হয় গণনা দিয়ে। সব সময় মানুষ গুণে থাকে যে, আমার কাছে কতো টাকা আছে। কতো টাকা এলো এবং কতো টাকা গেল। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি কুরআনে কারীমে এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝

'সম্পদ সঞ্চয় করে এবং গুণতে থাকে।'[১]

বর্তমান যুগ হলো গণনার যুগ। সব সময় দেখে যে, সংখ্যা কতো বৃদ্ধি পেলো এবং কতো হ্রাস পেলো। কিন্তু আল্লাহর কোনো বান্দা এটা দেখে না যে, যাকাত আদায় করার ফলে গণনা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা এ অল্প সম্পদ দ্বারা কতো কাজ সমাধা করে দিলেন। আর যাকাত না দেয়ার ফলে সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে কী পরিমাণ বে-বরকতী চলে আসলো। কতো জটিলতা সৃষ্টি হলো। কতো বিপদের মুখোমুখী হলো। এটা আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা যে, যে বান্দা যাকাত আদায় করে, তার সম্পদ হ্রাস পায় না।

ফেরেশতাদের দু'আর হকদার কে?

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, তিনি অবিরাম দু'আ করতে থাকেন-

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং দান খয়রাত করে তাকে তার মালের বরকত দুনিয়াতেই দান করুন। এবং যে ব্যক্তি সম্পদ রুখে রাখে তার সম্পদে বিলুপ্তি দান করুন।[২]

---

১. সূরা হুমাযাহ, আয়াত ২

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৩৫১, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭৭০৯

দানকারী আখেরাতে তো বিরাট সওয়াব পাবেই, উপরন্তু ফেরেশতা দু'আ করে যে, হে আল্লাহ দুনিয়াতেই তাকে প্রতিদান দান করুন। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ ধরে রাখে এবং লুকিয়ে রাখে যাতে খরচ করতে না হয়, তার জন্যে বদ-দু'আ করে যে, 'হে আল্লাহ আপনি তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।' তাই এরূপ চিন্তা করা যে, আমি তো অমুক উদ্দেশ্যে টাকা রেখেছি এবং সে উদ্দেশ্যও জরুরী। মেয়ে বিয়ে দিতে হবে, বাড়ি বানাতে হবে, গাড়ি ক্রয় করতে হবে। আমি যদি যাকাত দিয়ে দেই, তাহলে তো টাকা কমে যাবে। এ ধারণা ঠিক নয়। আপনি যদি যাকাত দেন, আর এর ফলে বাহ্যিকভাবে কিছু কমেও, এ কমার কারণে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আরও বাড়িয়ে দিবেন এবং যে সম্পদ রয়ে গেছে তার মধ্যে বরকত দান করবেন। যাকাত দেয়ার ফলে ইনশাআল্লাহ আপনার কাজ আটকে থাকবে না।

যাকাত দেয়ার কারণে কেউ ফকির হয় না

যাকাত দেয়ার ফলে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের কাজ আটকে থাকেনি, বরং আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি- আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যাকাত দেয়ার কারণে দেউলিয়া হয়নি। কোনো ব্যক্তি যাকাত দেয়ার কারণে দেউলিয়া হয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্তও কেউ দেখাতে পারবে না। মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে, হজ্জের জন্যে সঞ্চয়কৃত টাকার উপর যাকাত ফরয নয়, এ কথা ভুল। যে কোনো টাকা যে কোনো উদ্দেশ্যে রাখা হোক, তা যদি আপনার নিত্যদিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তার উপর যাকাত ফরয।

গহনার উপর যাকাত ফরয

এক ব্যক্তির নিকট নগদ টাকা নেই, তবে তার নিকট গহনা আকারে স্বর্ণ-চান্দি রয়েছে, তাহলে তার উপরও যাকাত ফরয। বেশিরভাগ পরিবারে এ পরিমাণ অলংকার থাকে, যা দ্বারা যাকাতের নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়। এ কারণে যার মালিকানায় ঐ অলংকার রয়েছে- স্বামী হোক, স্ত্রী হোক, (বালেগ) ছেলে হোক বা (বালেগা) মেয়ে হোক- তার উপর যাকাত ফরয। যদি স্বামীর মালিকানায় থাকে, তাহলে স্বামীর উপর যাকাত ফরয, আর যদি স্ত্রীর মালিকানায় থাকে তাহলে স্ত্রীর উপর ফরয। বর্তমানে মালিকানার

ব্যাপারটিও পরিষ্কার নয়। এ কথা জানা থাকে না যে, গহনাগুলো কার মালিকানাধীন। শরীয়ত প্রত্যেক বিষয় পরিষ্কার ও স্পষ্ট রাখার হুকুম দিয়েছে। তাই এ অলংকার কার মালিকানাভুক্ত- স্বামীর নাকি স্ত্রীর- তা স্পষ্ট হওয়া উচিৎ। এতোদিন পরিষ্কার না থেকে থাকলে এখন পরিষ্কার করে নিন। যার মালিকানাভুক্ত হবে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

হয়তো আপনার উপর যাকাত ফরয

যাইহোক, যাকাতের নেসাব সম্পর্কে এটা হলো শরীয়তের বিধান। এ বিধান সামনে রাখলে দেখা যাবে অনেকের উপরই যাকাত ফরয। কিন্তু সে মনে করছে যে, আমার উপর যাকাত ফরয নয়। ফলে সে যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে। যাকাতের নেসাব সম্পর্কে এটা ছিলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা। যদি হায়াতে বেঁচে থাকি তাহলে আগামী জুমায় বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

যাকাত সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

'নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ- যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায়কারী।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

গত কয়েক জুমা ধরে এ আয়াতগুলোর উপর আলোচনা চলছে। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সফলকাম মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে থেকে দু'টি গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান হয়েছে। তৃতীয় গুণের উপর বয়ান চলছিলো যে, সফলকাম মু'মিন তারা, যারা যাকাত আদায় করে। যাকাতের গুরুত্ব, যাকাত না দেয়ার ভয়াবহতা এবং যাকাতের নেসাব সম্পর্কে গত জুমায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃ. ৩০১-৩১২,

১. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৪

আজকে যাকাতের কিছু মাসআলা বর্ণনা করার ইচ্ছা আছে। যেগুলো না জানার কারণে আমরা এ ফরযটা সঠিকভাবে আদায় করছি না।

নেসাবের মালিকের উপর যাকাত ফরয

এখানে এ মাসআলাটিও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের উপর তার মালিকানাধীন জিনিসের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেকের উপর তার মালিকানাধীন সম্পদের হিসাবে বিধান জারি হয়ে থাকে। যেমন বাপ যদি নেসাবের মালিক হয় তবে তার মালিকানাধীন সম্পদের হিসাবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। ছেলেও যদি নেসাবের মালিক হয়, তবে ছেলের উপর তার মালের যাকাত ফরয হবে। স্বামী নেসাবের মালিক হলে স্বামীর উপর তার সম্পদের যাকাত ফরয হবে। স্ত্রী নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে স্ত্রীর উপর তার সম্পদের যাকাত ফরয হবে। প্রত্যেকের মালিকানার ভিন্ন হিসাব।

পিতার যাকাত প্রদান পুত্রের সম্পদের যাকাতের জন্যে যথেষ্ট নয়

অনেকে মনে করে, বাড়ির যিনি বড় ও প্রধান- সে বাপ হোক বা স্বামী হোক- সে যাকাত দিলে সবার পক্ষ হতে যাকাত আদায় হয়ে যায়। এখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যের যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথা ঠিক নয়। বাপ নামায পড়লে যেমন ছেলের নামায আদায় হয় না, বরং ছেলেকেও পৃথকভাবে নিজের নামায পড়তে হয় এবং স্বামী নামায পড়লে স্ত্রীর নামায আদায় হয় না, স্ত্রীকেও নিজের নামায পড়তে হয়, তেমনিভাবে যাকাতের হুকুম হলো, পরিবারের যে ব্যক্তিই নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে, সে বাপ হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, স্বামী হোক, স্ত্রী হোক, সবার উপর নিজ নিজ হিসাব মতে যাকাত আদায় করা ফরয।

সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার মাসআলা

আরেকটি মাসআলা- যে ব্যাপারে মানুষ খুব বেশি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে থাকে- তা হলো, যাকাত ঐ সময় ফরয হয়, যখন মালের

উপর বছর অতিক্রান্ত হয়। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে যাকাত ফরয হয় না। সাধারণত মানুষ এ মাসআলার অর্থ এই বুঝে যে, প্রত্যেক সম্পদের উপর পৃথক পৃথকভাবে বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী। অথচ এ মাসআলার অর্থ এটা নয়। বছর অতিবাহিত হওয়ার অর্থ হলো, সারা বছর নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকা। যেমন, কোনো ব্যক্তির নিকট পহেলা রমাযানে দশ হাজার টাকা এলো। ফলে এ ব্যক্তি নেসাবের মালিক হলো। এখন যদি বছরের বেশিরভাগ সময় তার নিকট ছয় হাজার টাকা বর্তমান থাকে, বা ছয় হাজার টাকা মূল্যমানের গহনা থাকে, বা ব্যবসার পণ্য থাকে, তাহলে সে নেসাবের মালিক। মাঝ বছরে তার নিকট আরো টাকা আসলে তার উপর পৃথকভাবে বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী নয়। বরং পরবর্তী রমাযানের প্রথম তারিখে যে পরিমাণ নগদ বা জমা অর্থ, গহনা বা ব্যবসার পণ্য থাকবে, সেগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে।

দু'দিন পূর্বে আসা সম্পদের যাকাত

উদাহরণ স্বরূপ পহেলা রমাযানের দু'দিন পূর্বে তার নিকট অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা এলো, তাহলে পহেলা রমাযানে ঐ দশ হাজার টাকার উপরেও যাকাত ফরয হবে। তার উপর পৃথকভাবে বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। কারণ, সে ব্যক্তি পুরো বছর নেসাবের মালিক ছিলো। তাই বছরের মাঝে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটলে তার উপর পৃথকভাবে বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়।

কোন্ কোন্ জিনিসের উপর যাকাত ফরয?

একটি মাসআলা হলো, কোন্ কোন্ জিনিসের উপর যাকাত ফরয? নিম্নোক্ত জিনিসসমূহের উপর যাকাত ফরয-

এক. নগদ টাকা। তা ব্যাংকে থাক বা বাড়িতে, তার উপর যাকাত ফরয।

দুই. স্বর্ণ-চান্দি ও গহনার উপরেও যাকাত ফরয। গহনা ব্যবহার করুক বা এমনি রেখে দিক। গহনার মালিক যে, তার উপর যাকাত ফরয হবে।

এ ব্যাপারেও আমাদের সমাজে অত্যধিক অব্যবস্থাপনা বিরাজমান। বাড়িতে মহিলাদের নিকট যে গহনা থাকে, তার সম্পর্কে পরিষ্কার করা হয় না যে, এর মালিক কে? মহিলা এর মালিক, না কি স্বামী? এটা পরিষ্কার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী।

গহনার মালিকানা কার?

যেমন বিয়ের সময় মেয়ের গায়ে যে অলংকার পরিয়ে দেয়া হয়, তার মধ্যে কিছু গহনা দেয়া হয় মেয়ের পক্ষ থেকে, আর কিছু দেয়া হয় ছেলের পক্ষ থেকে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম এই যে, যে গহনা মেয়ের পক্ষ থেকে দেয়া হয়, তা শতভাগ মেয়ের মালিকানাভুক্ত এবং মেয়ের উপরই তার যাকাত ফরয। আর যে গহনা ছেলের পক্ষ থেকে দেয়া হয় তা মেয়ের মালিকানাধীন হয় না, বরং তা এক ধরনের ধার হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে। তার মালিক হয়ে থাকে ছেলে। তাই ঐ গহনার যাকাত ছেলের উপরই ফরয হবে। তবে যদি ছেলে মেয়েকে বলে যে, আমি তোমাকে এ গহনা দিয়ে দিলাম, তুমিই এর মালিক। তাহলে ঐ গহনা মেয়ের মালিকানায় চলে আসবে এবং তার যাকাত মেয়ের উপরই ফরয হবে। তাই এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, বাড়িতে যে গহনা রয়েছে, তার মালিকানা কার। এটা স্পষ্ট না হওয়ার কারণে পরে ঝগড়াও হয়ে থাকে।

সারকথা হলো, গহনার মালিক স্বামী হলে স্বামীর উপর যাকাত ফরয হবে, আর স্ত্রী হলে স্ত্রীর উপর ফরয হবে ।

গহনার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

গহনার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি এই যে, গহনা ওজন করবে। যাকাত যেহেতু স্বর্ণের ওজনের উপর ফরয হয়ে থাকে, তাই গহনার মধ্যে যদি পাথর লাগানো থাকে বা অন্য কোনো ধাতব লাগানো থাকে তবে তা ওজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই দেখতে হবে যে, গহনার মধ্যে খাঁটি স্বর্ণ কতোটুকু আছে। তারপর কোনো জায়গায় লিখে সংরক্ষণ করবে যে, অমুক গহনার ওজন এতো। তারপর যে তারিখে যাকাতের হিসাব করা হবে, যেমন পহেলা রমাযান তার যাকাত আদায়ের তারিখ নির্ধারণ করা আছে, তাহলে পহেলা রমাযান বাজার থেকে স্বর্ণের মূল্য

জেনে নিবে যে, আজকের বাজার মূল্য কতো? মূল্য জানার পর হিসাব বের করবে যে, এতে কতো মূল্যমানের স্বর্ণ রয়েছে। সেই মূল্যমানের ওপর শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত দিবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি ঐ স্বর্ণের মূল্য এক হাজার টাকা হয়, তবে তাতে পঁচিশ টাকা যাকাত ফরয হবে। যদি দুই হাজার হয় তাহলে পঞ্চাশ টাকা ফরয হবে। যদি চার হাজার হয় তাহলে ফরয হবে এক শ' টাকা। এভাবে হিসাব করে আড়াই শতাংশ যাকাত দিবে। স্বর্ণের মূল্য ঐ দিনেরটা ধরবে, যেদিন যাকাত হিসাব করবে। যেদিন স্বর্ণ ক্রয় করেছে সেদিনের ক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে না।

ব্যবসার পণ্যের যাকাত

তৃতীয় জিনিস, যার উপর যাকাত ফরয হয়, তা হলো ব্যবসার পণ্য। যেমন এক ব্যক্তি দোকান করেছে। এখন এই দোকানে যতো মাল রয়েছে, তার মূল্য ধরতে হবে। মূল্য এভাবে ধরবে যে, দোকানের পুরো মাল যদি এক সঙ্গে বিক্রি করা হয় তাহলে তার মূল্য কতো হবে। মোট মূল্যের আড়াই শতাংশ যাকাত আদায় করবে।

কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত

কেউ যদি কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে, সেই শেয়ারও ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তাই শেয়ারের বাজারমূল্যের উপর আড়াই শতাংশ হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আজকাল কোম্পানী নিজেই শেয়ারের যাকাত কেটে নেয়। কিন্তু কোম্পানী যাকাত কেটে নেয় শেয়ারের আসল মূল্যের উপর। বাজারমূল্য অনুপাতে নেয় না। যেমন, একটি কোম্পানীর শেয়ারের আসল মূল্য যদি হয় দশ টাকা, আর বাজারমূল্য হয় পঞ্চাশ টাকা, তাহলে কোম্পানী দশ টাকা হিসেবে যাকাত কেটে নেবে। তাই অবশিষ্ট চল্লিশ টাকার যাকাত শেয়ার হোল্ডারকেই আদায় করতে হবে।

বাড়ি ও প্লটের যাকাত

কোনো ব্যক্তি যদি বিক্রি করার নিয়তে কোনো বাড়ি বা প্লট ক্রয় করে তার উপরেও যাকাত ফরয হবে। অর্থাৎ কেউ যদি এই নিয়তে ক্রয় করে যে, এই প্লট বিক্রি করে আমি লাভ করবো, তাহলে ওই বাড়ি বা

প্লটের মূল্যমানের উপরও যাকাত ফরয হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বাড়ি বা প্লট বিক্রির নিয়তে নয়, বরং বসবাসের নিয়তে ক্রয় করে কিংবা এই নিয়তে ক্রয় করে যে, বাড়ি ক্রয় করে ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করবো, তাহলে ঐ বাড়ির মূল্যমানের উপর যাকাত ফরয হবে না। তবে ঐ বাড়ি থেকে যে ভাড়া পাবে, সেই ভাড়ার টাকার উপর আড়াই শতাংশ হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে।

কাঁচামালের যাকাত

মোটকথা, মৌলিকভাবে তিন জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়- **এক.** নগদ টাকা, **দুই.** অলংকার, **তিন.** ব্যবসার পণ্য।

ব্যবসার পণ্যের মধ্যে কাঁচামালও অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোম্পানীতে কাঁচামাল থাকলে, যেদিন যাকাতের হিসাব করবে, ঐ দিনের বাজার মূল্য হিসেবে ঐ কাঁচা মালের মূল্য নির্ধারণ করে তারও যাকাত দিতে হবে। এবং তৈরি মালের উপরও যাকাত ফরয হবে।

ছেলের পক্ষ থেকে বাবার যাকাত আদায় করা

পরিবারের তিন ব্যক্তির উপরে পৃথক-পৃথকভাবে যাকাত ফরয হয়েছে। তাদের মধ্যে কোনো একজন অনুমতি দিলো যে, আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি, আপনি আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করুন। তখন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করলো। সে যদি নিজের টাকা দিয়ে যাকাত আদায় করে তবুও তা আদায় হয়ে যাবে। যেমন, এক ব্যক্তির তিনজন বালেগ সন্তান রয়েছে এবং তিনজনই নেসাব পরিমাণ মালের মালিক। অর্থাৎ তিনজনেরই সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি মূল্যমানের যাকাতযোগ্য সম্পদ রয়েছে। তাই তিন ছেলের প্রত্যেকের উপর পৃথক-পৃথকভাবে যাকাত ফরয হয়েছে। অপরদিকে বাবাও নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার কারণে তার উপরেও যাকাত ফরয হয়েছে। এখন যদি বাবা নিজের সন্তানদের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, ছেলেদের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকতে হবে। অনুমতির পর যদি বাবা যাকাত প্রদান করে, তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর যাকাত আদায় করা

এমনিভাবে স্বামীও নেসাব পরিমাণ মালের মালিক এবং স্ত্রীও নেসাব পরিমাণ মালের মালিক। কারণ, তার কাছে নেসাব পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ অলংকার রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাকাত দেয়ার মতো টাকা নেই। এখন স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে বাধ্য করতে পারবে না ঠিক, কিন্তু স্বামী যদি বলে, আমি তোমার যাকাত দিয়ে দিচ্ছি, আর স্ত্রী যদি তাকে অনুমতি দেয় এবং স্বামী নিজের টাকা থেকে তার যাকাত আদায় করে, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্বামী যদি স্ত্রীর যাকাত আদায় করতে তৈরী না হয়, তবুও স্ত্রীর উপরে তার মালের যাকাত আদায় করা ফরয হবে। যাকাত আদায় করার জন্যে অলংকার বিক্রি করতে হলেও তা করতে হবে।

অলংকারের যাকাত না দেয়ায় ধমকি

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ এনে হযরত আয়শা রাযি.-এর হাতে রূপার আংটি পরা দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ আংটি কোথায় পেয়েছো? তিনি বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আংটিটি আমার ভালো লেগেছিলো, তাই সংগ্রহ করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কি এর যাকাত দাও? তিনি বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এর যাকাত দেইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি যদি চাও এর বদলে তোমাকে আখেরাতে আগুনের আংটি পরানো হোক, তাহলে এর যাকাত দিও না। আর যদি আগুনের আংটি পরতে না চাও, তাহলে এর যাকাত দিও।[১]

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অলংকারের যাকাত আদায় করার ব্যাপারে এত জোরালো তাকিদ দিয়েছেন। তাই মহিলাদের অলংকারের যাকাত দেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা উচিৎ। তবে শর্ত হলো, অলংকার তাদের মালিকানাধীন হতে হবে।

---

১. সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ১৩৩৮

অলংকার স্ত্রীর মালিকানাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, সেই গহনা হয় সে নিজের পয়সা দিয়ে ক্রয় করেছে, বা কেউ তাকে হাদিয়া দিয়েছে কিংবা সে বিয়ের সময় মায়ের বাড়ি থেকে এনেছে। কিংবা স্বামী ঐ গহনা মোহর স্বরূপ স্ত্রীর মালিকানায় দিয়েছিলো। উদাহরণ স্বরূপ মোহর ছিলো ৫০ হাজার টাকা। বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে যে গহনা দেয়া হয়েছিলো, সে সম্পর্কে স্বামী তখন স্পষ্ট করে বলেনি যে, এটা মোহর হিসেবে আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, তাই ঐ গহনা স্বামীরই মালিকানাধীন ছিলো। এখন যদি স্বামী তাকে বলে যে, আমি বিয়ের সময় যে গহনা দিয়েছিলাম, তা তোমাকে মোহর স্বরূপ দিয়ে দিলাম। তাহলে ঐ গহনার মাধ্যমে মোহর পরিশোধ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী ঐ গহনার মালিক হয়ে যাবে। এখন ঐ গহনার যাকাত স্ত্রীর উপর ফরয হবে। স্বামীর উপর ফরয হবে না। এখন স্ত্রীর ইচ্ছা, চাইলে সে নিজে এ গহনা পরতে পারে, কাউকে দিয়েও দিতে পারে, আবার চাইলে বিক্রিও করতে পারে। স্ত্রীকে এসব কাজে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার স্বামীর থাকবে না। কারণ, ঐ গহনা এখন স্ত্রীর মালিকানায় চলে এসেছে।

মোটকথা, সবকিছুর উপরই এই বিধান যে, যে ব্যক্তি যে জিনিসের মালিক, তার যাকাত পরিশোধ করা তার উপরই ফরয। তবে অন্য কোনো ব্যক্তি যদি তার অনুমতিক্রমে তার যাকাত দিয়ে দেয় তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যেমন, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার অনুমতিক্রমে স্বামী দিয়ে দিলো, অথবা সন্তানের পক্ষ থেকে তার অনুমতিক্রমে বাবা দিয়ে দিলো, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। তাদের অনুমতি ছাড়া যাকাত আদায় হবে না। কারণ, এটা তাদেরই দায়িত্বে ফরয।

বর্তমানে আমাদের সমাজে যাকাত সংক্রান্ত মাসআলার বিষয়ে অজ্ঞতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যার ফলে অনেক লোক যাকাত দেয় ঠিক, কিন্তু অনেক সময় সঠিকভাবে আদায় হয় না। ফলে যাকাত আদায় না করার বোঝা মাথায় থেকেই যায়। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে যাকাতের মৌলিক মাসআলা শিখে নিন। এটা এমন কোনো মুশকিল কাজ নয়। কারণ, মানুষের কাছে যতো সামগ্রী রয়েছে, তার মধ্যে শুধু তিন প্রকার জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়। **এক.** স্বর্ণ-চান্দি, **দুই.**

নগদ টাকা, **তিন.** ব্যবসার মাল। অর্থাৎ ঐ সব জিনিস, যা বিক্রি করার নিয়তে ক্রয় করা হয়েছে, তার উপর যাকাত ফরয। এ ছাড়া ঘরে ব্যবহারের জন্যে যেসব জিনিস থাকে- যেমন ঘরের ফার্ণিচার, গাড়ি, বাসস্থানের ঘর, ব্যবহারের পাত্র ইত্যাদি এগুলোর উপর যাকাত ফরয নয়। তবে ঘরে বা ব্যাংকে যদি নগদ টাকা, গহনা বা স্বর্ণ-চান্দি রাখা থাকে বা কোনো বাড়ি বা প্লট বিক্রি করার নিয়তে ক্রয় করে থাকে, তাহলে এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে। আর যদি বসবাসের উদ্দেশ্যে বাড়ি ক্রয় করে থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। মোটকথা, যাকাত আদায় করা একটি সহজ আমল। এটি কঠিন কিছু নয়। শুধু একটু বোঝার প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের এই স্তম্ভের গুরুত্বকে সঠিকভাবে বোঝার তাওফীক দান করুন এবং যথাযথভাবে যাকাত আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আপনি কীভাবে যাকাত দিবেন? *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

'যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যে দিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ করো।'[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদেরানে আযীয!

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত বিষয়ে আজকের এ মজলিশ। পবিত্র রমাযান মাসের কয়েকদিন পূর্বে এ আয়োজন এ জন্যে করা হয়েছে

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৯, পৃ. ১২৬-১৫৪

১. সূরা তাওবাহ, আয়াত ৩৪-৩৫

যে, সাধারণত মানুষ রমাযানুল মোবারাকে যাকাত দিয়ে থাকে। যাকাতের গুরুত্ব, তার ফযীলত এবং তার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান আমাদের অবগতিতে আনা এ সমাবেশের উদ্দেশ্য, যেন সে মোতাবেক আমরা যথাযথভাবে যাকাত দিতে পারি।

যাকাত না দেয়ার উপর ধমকি

এ উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। পবিত্র এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা ঐসব মানুষকে কঠোর ধমকি দিয়েছেন, যারা সঠিকভাবে যাকাত দেয় না। তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত ভাষায় আযাবের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ করেছেন– যেসব লোক স্বর্ণ-চাঁন্দি পুঞ্জিভূত করে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না, (হে নবী) আপনি তাদেকে একটি বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।' অর্থাৎ যেসব লোক টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-চান্দি সঞ্চয় করে চলছে, আল্লাহর পথে সেগুলো ব্যয় করছে না, এগুলোর উপর আল্লাহ তা'আলা যে ফরয আরোপ করেছেন, তা আদায় করছে না, তাদেরকে এ সংবাদ শুনিয়ে দিন যে, মর্মন্তুদ এক শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে সেই মর্মন্তুদ শাস্তির বিবরণ দিয়েছেন যে, এ শাস্তি ঐ দিন হবে, যেদিন স্বর্ণ-চান্দিকে উত্তপ্ত করা হবে তারপর ঐ ব্যক্তির কপাল, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে–

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ۝

'এটা সেই ভাণ্ডার, যা তুমি নিজের জন্যে সঞ্চয় করেছিলে। আজ তুমি সেই সম্পদের স্বাদ চাখো, যা তুমি নিজের জন্যে সঞ্চয় করতে।'

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এ পরিণতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এখানে ঐ সমস্ত লোকের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে, যারা টাকা পয়সা পুঞ্জীভূত করছে, কিন্তু এর উপর আল্লাহ তা'আলা যেসব দায়িত্ব আরোপ করেছেন সেগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করছে না। শুধু এসব

আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও তাদেরকে ধমকি দেয়া হয়েছে। সূরায়ে 'হুমাযা'য় ইরশাদ হয়েছে–

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ۝ الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۝ يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ۝ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۝ الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـِٕدَةِ ۝

'ঐ ব্যক্তির জন্যে বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে, যে মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তিরস্কার করে। যে সম্পদ সঞ্চয় করে আর গুণে গুণে রাখে। (প্রতিদিন গুণে যে, আজ আমার সম্পদ কতো গুণ বৃদ্ধি পেলো। সে গুণে আর অনন্দিত হয়।) সে মনে করে এ সম্পদ আমাকে চিরজীবী করে রাখবে। কক্ষণই নয়। (মনে রাখবে! যে সম্পদ সে গুণে গুণে রাখছে এবং তার উপর আরোপিত কর্তব্য পালন করছে না তার কারণে) তাকে পেষণকারী আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমার কি জানা আছে 'হুতামাহ' কী জিনিস? ('হুতামাহ' যার মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হবে) এমন আগুন, যা আল্লাহ কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত। (এটা কোনো মানুষের জ্বালানো আগুন নয়, যা পানি দ্বারা নিভে যাবে বা মাটি দ্বারা নিভে যাবে, বা ফায়ার ব্রিগেড নিভিয়ে দেবে। বরং এটা আল্লাহর জ্বালানো আগুন), যা মানুষের হৃদয় ও যকৃত পর্যন্ত উঁকি দিবে। (অর্থাৎ, মানুষের হৃদয় ও যকৃত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।)'[১]

এতো কঠিন ধমক আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এ সম্পদ কোত্থেকে আসছে?

যাকাত না দেয়ার কারণে এমন কঠিন ধমকি কেন দেয়া হয়েছে? তার কারণ এই যে, এ দুনিয়ায় তোমরা যে সম্পদ অর্জন করো, ব্যবসার মাধ্যমে অর্জন করো, চাকুরীর মাধ্যমে অর্জন করো, কৃষির মাধ্যমে অর্জন করো বা অন্য যে কোনো উপায়ে অর্জন করো, একটু চিন্তা করে দেখো এ সম্পদ কোত্থেকে আসছে? নিজের বাহুবলে এ সম্পদ অর্জন

১ হুমাযাহ, আয়াত ১-৭

করার ক্ষমতা কি তোমার ছিলো? এটা তো আল্লাহ তা'আলার বানানো প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। তিনি তাঁর এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তোমার রিযিক পৌছে দিচ্ছেন।

গ্রাহক কে পাঠাচ্ছে?

তোমরা মনে করো যে, আমি সম্পদ সঞ্চয় করেছি। দোকান খুলে বসেছি, মাল বিক্রি করছি, যার ফলে আমি সম্পদ লাভ করছি। এটা দেখলে না যে, দোকান খুলে বসলে তোমার কাছে গ্রাহক কে পাঠায়? তুমি যদি দোকান খুলে বসে থাকতে, আর দোকানে গ্রাহক না আসতো তাহলে কি বিক্রি হতো? কোনো উপার্জন হতো? তিনি কে, যে তোমার কাছে গ্রাহক পাঠাচ্ছেন? আল্লাহ তা'আলা ব্যবস্থাই এমন বানিয়েছেন যে, পরস্পরের অভাব এবং পরস্পরের প্রয়োজন পরস্পরের মাধ্যমে পুরো করা হয়। একজনের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যে, তুমি গিয়ে দোকান খুলে বসো। আর অন্যজনের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যে, ঐ দোকানদারের নিকট থেকে মাল ক্রয় করো।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার একজন বড় ভাই ছিলেন। জনাব মুহাম্মাদ যাকী কাইফী রহ.। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন। 'এদায়ারে ইসলামিয়াত' নামে তাঁর দ্বীনি কিতাবের একটি দোকান ছিলো। এখনো সে দোকান রয়েছে। একবার তিনি বলতে লাগলেন- ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত ও কুদরতের বিস্ময়কর কারিশমা দেখিয়ে থাকেন। একদিন আমি সকালে জাগলাম। পুরো শহরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাজারে কয়েক ইঞ্চি পানি জমে গেছে। আমার অন্তরে চিন্তা আসলো, আজ বৃষ্টির দিন। মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। রাস্তায় পানি জমে গেছে। এমতাবস্থায় কে কিতাব কিনতে আসবে? কিতাবও কোনো জাগতিক বা পাঠ্যক্রমভুক্ত নয়, বরং দ্বীনি কিতাব। যার বিষয়ে আমাদের অবস্থা এই যে, যখন দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজন পুরো হয়ে যায়, তখন চিন্তা হয় যে, একটি দ্বীনি কিতাব ক্রয় করে পাঠ করি। এসব কিতাব দিয়ে ক্ষুধাও মেটে না, পিপাসাও নিবারিত হয় না। এর দ্বারা জাগতিক কোনো প্রয়োজনও পুরো হয় না। এ যুগের

হিসেবে দ্বীনি কিতাব হলো, একটি অর্থহীন বিষয়। মনে করা হয়, অবসর সময় পাওয়া গেলে তখন দ্বীনি কিতাব পড়বো। তাই এমন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কে দ্বীনি কিতাব কিনতে আসবে? তাই আজ দোকানে যাবো না। ছুটি কাটাবো।

কিন্তু যেহেতু তিনি বুযুর্গদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। সোহবত লাভ করেছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর। তিনি বলেন- একই সাথে আমার অন্তরে আরেকটি চিন্তা জাগলো যে, ঠিক আছে, কেউ কিতাব কিনতে আসতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে রিযিকের এই মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। এখন আমার কাজ হলো, আমি যাবো এবং দোকান খুলে বসে থাকবো। গ্রাহক পাঠানো আমার কাজ নয়। তা আরেকজনের কাজ। তাই আমার নিজের কাজে ত্রুটি করা উচিত নয়। বৃষ্টি হোক, চাই ঢল নামুক, আমার দোকান খোলা উচিত। এ কথা চিন্তা করে আমি ছাতা নিয়ে পানির ভিতর দিয়ে চলে গেলাম। বাজারে গিয়ে দোকান খুলে বসলাম। চিন্তা করলাম, আজ তো কোনো গ্রাহক আসবে না। বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করি। আমি মাত্র কুরআন শরীফ খুলে তিলাওয়াত করতে বসেছি। এমন সময় দেখি যে, মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে কিতাব ক্রয় করতে আসছে। আমি অবাক হলাম যে, এই লোকগুলোর এমন কী প্রয়োজন দেখা দিলো যে, এই তুফান ও ঢলের মধ্যে আমার নিকট এসে এমন সব কিতাব ক্রয় করছে, যেগুলোর তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন নেই! কিন্তু মানুষ এলো এবং প্রতিদিন যে পরিমাণ বিক্রি হয় ঐ দিনও সে পরিমাণ বিক্রি হলো। তখন আমার মনে এ কথা জাগ্রত হলো যে, এ সব গ্রাহক নিজের থেকে আসছে না। প্রকৃতপক্ষে অন্য কেউ পাঠাচ্ছেন। আর তিনি এ জন্যে পাঠাচ্ছেন যে, আমার রিযিকের মাধ্যম তিনি এ সব গ্রাহককে বানিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই কাজ ভাগ করে দেয়া হয়েছে

মোটকথা, এটা মূলত আল্লাহ তা'আলার বানানো ব্যবস্থা যে, তিনি তোমার কাছে গ্রাহক প্রেরণ করছেন। তিনি গ্রাহকের অন্তরে ঢালছেন যে, তুমি ঐ দোকানে গিয়ে মাল ক্রয় করো। কোনো ব্যক্তি কি সম্মেলন

আহ্বান করেছিলো? এবং সেই সম্মেলনে কি এ সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, এ পরিমাণ লোক কাপড় বিক্রি করবে, এ পরিমাণ লোক জুতা বিক্রি করবে, এ পরিমাণ লোক চাল বিক্রি করবে, এ পরিমাণ লোক থালা-বাসন বিক্রি করবে, এভাবে মানুষের প্রয়োজন পুরো করা হবে? দুনিয়াতে এ ধরনের কোনো সম্মেলন আজও হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তুমি কাপড় বিক্রি করো। কারো অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তুমি জুতা বিক্রি করো। কারো অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তুমি রুটি বিক্রি করো। কারো অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তুমি গোশত বিক্রি করো। এর ফলে দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই, যা বাজারে পাওয়া যায় না। অপরদিকে ক্রেতাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যে, তোমরা গিয়ে তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে মাল ক্রয় করো এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো। এটা আল্লাহ তা'আলার বানানো ব্যবস্থাপনা। এভাবেই তিনি সমস্ত মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন।

মাটি থেকে উৎপন্ন করেন কে?

ব্যবসা হোক, কৃষি হোক, চাকুরি হোক, দাতা মূলত আল্লাহ তা'আলাই। কৃষির প্রতি লক্ষ্য করুন! কৃষিতে মানুষের কাজ এই যে, জমি চষে তাতে বীজ বপন করে। তাতে পানি দেয়। কিন্তু সেই বীজ থেকে অঙ্কুর গজানো- এমন বীজ যা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, যা গণনার মধ্যে আসে না, যা ওজনহীন, কিন্তু এত শক্ত মাটির পেট ফেঁড়ে অঙ্কুরোদগম হয়। সেই অঙ্কুরও এত নরম ও নাজুক হয়ে থাকে যে, একটি শিশুও তা আঙ্গুল দিয়ে ডলা দিলে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই অঙ্কুরই সব মৌসুমের রুক্ষ আচরণ সহ্য করে, শীত-গরম এবং ঝঞ্ঝাবায়ু সহ্য করে চারায় পরিণত হয়। চারায় ফুল ধরে, ফুল থেকে ফল হয়। এভাবে তা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌছে যায়। কোন্ সে সত্ত্বা, যিনি এ সব কাজ করছেন। মহান আল্লাহ এসব করছেন।

মানুষের মধ্যে সৃজন ক্ষমতা নেই

আমাদের আয়ের যতো উৎস আছে- ব্যবসা, কৃষি বা চাকুরী- প্রকৃতপক্ষে মানুষকে এ সব ক্ষেত্রে একটি সীমিত পরিসরে কাজ করার

জন্যে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। মানুষ সেই সীমিত পরিসরে কাজ করে থাকে। কিন্তু সেই সীমিত পরিসরের কাজের মধ্যে কোনো জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের নেই। মহান আল্লাহই প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করে থাকেন এবং মানুষকে দিয়ে থাকেন। তাই মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা তাঁরই দান।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

'জমিন ও আকাশে যা কিছু রয়েছে, সব তাঁরই মালিকানাধীন।'[১]

প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা

আল্লাহ তা'আলা ঐ জিনিস মানুষকে দিয়ে বলে দিয়েছেন, যাও! তুমিই এর মালিক। সুতরাং সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝

'তারা কি দেখে না? আমি তাদের জন্যে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জন্তু। অতঃপর তারা তার মালিক হয়েছে।'[২]

প্রকৃত মালিক তো ছিলাম আমি। আমি তোমাদেরকে মালিক বানিয়ে দিলাম। তাই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিকট যে সম্পদ আছে, তার মধ্যে বড় হক আমার। হক যখন আমার, তাই আমার হুকুম মোতাবেক তা থেকে ব্যয় করো। যদি আমার হুকুম মোতাবেক ব্যয় করো, তাহলে অবশিষ্ট সকল সম্পদ তোমার জন্যে হালাল এবং পবিত্র। এই সম্পদ হলো, আল্লাহর ফযল এবং আল্লাহর নেয়ামত। এ সম্পদে রয়েছে বরকত। আর যদি তুমি ঐ সম্পদ থেকে আল্লাহর ফরয করা যাকাত আদায় না করো, তাহলে এ সমস্ত সম্পদ তোমার জন্যে আগুনের অঙ্গার। কিয়ামতের দিন ঐ অঙ্গার দেখতে পাবে, যা দ্বারা তোমার শরীরে দাগ দেয়া হবে এবং তোমাকে বলা হবে- এই সেই সম্পদ, যা তুমি সঞ্চয় করেছিলে।

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪
২. সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৭১

শুধু আড়াই শতাংশ পরিশোধ করো

আল্লাহ তা'আলা যদি বলতেন যে, এ সম্পদ আমার দেয়া, তাই আড়াই শতাংশ তুমি রাখো, আর সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, তাহলেও ইনসাফের পরিপন্থী হতো না। কারণ, সমস্ত সম্পদ তাঁরই দেয়া এবং তাঁরই মালিকানাধীন। কিন্তু তিনি নিজের বান্দার প্রতি দয়া করেছেন। তিনি বলেছেন- আমি জানি, তুমি দুর্বল, তোমার এ সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে এবং এর প্রতি তোমার মনের আকর্ষণ রয়েছে। তাই যাও, এ সম্পদের সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ তোমার, আমি শুধু আড়াই শতাংশ চাচ্ছি। এ আড়াই শতাংশ আমার রাস্তায় যখন ব্যয় করবে, তখন অবশিষ্ট সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ তোমার জন্যে হালাল, পবিত্র ও বরকতময়। আল্লাহ তা'আলা এই সামান্য পরিমাণ চেয়ে অবশিষ্ট মাল আমাদের হাওলায় দিয়েছেন যে, এগুলো যেভাবে ইচ্ছা নিজের বৈধ প্রয়োজনে খরচ করো।

যাকাতের ব্যাপারে তাকিদ

এ আড়াই শতাংশ হলো, যাকাত। এই সেই যাকাত, যার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বারবার ইরশাদ হয়েছে-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

'নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।'[১]

যাকাতের ব্যাপারে এ পরিমাণ তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, যেখানে নামাযের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে একই সাথে যাকাতেরও উল্লেখ রয়েছে। একদিকে যাকাতের যখন এত তাকিদ রয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা এত বড় দয়া করেছেন যে, আমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন এবং তার মালিক বানিয়েছেন। অতঃপর শুধুমাত্র আড়াই শতাংশ দাবি করেছেন। তাই মুসলমান আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী কমপক্ষে আড়াই শতাংশ তো যথাযথভাবে আদায় করবে। এমন করলে তো তার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়বে না! কিয়ামত আপতিত হবে না!

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩

হিসাব করে যাকাত আদায় করুন !

অনেক লোক তো যাকাতের পরোয়াই করে না। নাউযুবিল্লাহ! তারা তো যাকাত দেয়ই না। তারা চিন্তা করে এ আড়াই শতাংশ কেন দেবো? সম্পদ আসছে, আসুক। অপরদিকে কিছু লোক রয়েছে, যাদের যাকাতের ব্যাপারে কিছু হলেও অনুভূতি রয়েছে এবং তারা যাকাত দিয়েও থাকে, কিন্তু যাকাত দেয়ার যে সঠিক পদ্ধতি, তা অবলম্বন করে না। যেহেতু আড়াই শতাংশ যাকাত ফরয করা হয়েছে, তাই তার দাবি হলো, সঠিকভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

কতক লোক চিন্তা করে থাকে যে, কে হিসাব-কিতাব করবে? কে পুরো স্টক চেক করবে? তাই অনুমান করে যাকাত দিয়ে দেয়। অনুমানে তো ভুল হতে পারে। যাকাত কমও হতে পারে। যাকাত যদি বেশি দেয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ পাকড়াও হবে না। কিন্তু এক টাকাও যদি কম হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণ যাকাত ফরয হয়েছে, তার থেকে এক টাকা কম দিয়েছে, তাহলে মনে রাখবেন! ঐ এক টাকা, যা আপনি হারামভাবে নিজের কাছে রেখে দিলেন, আপনার সমস্ত মাল ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট।

ঐ সম্পদ ধ্বংসের কারণ

এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন সম্পদের মধ্যে যাকাতের অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ পুরোপুরি যাকাত দিলো না, বরং কিছু যাকাত দিলো আর কিছু রয়ে গেলো, তাহলে ঐ সম্পদ মানুষের জন্যে ধ্বংস ও বিপদের কারণ হয়ে থাকে।

এ কারণে সঠিকভাবে এক এক পয়সা হিসাব করে যাকাত দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করবেন। এ ছাড়া সঠিকভাবে যাকাতের ফরয আদায় হয় না। আলহামদুলিল্লাহ! বিরাট সংখ্যক মুসলমান যাকাত দিয়ে থাকেন। কিন্তু সঠিকভাবে হিসেব করে যাকাত দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন না। যে কারণে তাদের সম্পদের মধ্যে যাকাতের অর্থ মিশে থাকে। যার ফলে বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হয়।

যাকাতের পার্থিব উপকারিতা

যাকাত তো এ নিয়তেই দিতে হবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার হুকুম, তাঁর সন্তুষ্টির কারণ এবং ইবাদত। যাকাত দেয়ায় আমার কোনো লাভ হোক বা না হোক, কোনো উপকার হোক বা না হোক আল্লাহ তা'আলার হুকুমের আনুগত্য করা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। যাকাতের আসল উদ্দেশ্য এটাই। তবে যখন কোনো মানুষ যাকাত দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে তাকে অনেক ফায়দা দিয়ে থাকেন। সেই ফায়দা এই যে, তার সম্পদের মধ্যে বরকত হয়। কুরআনে কারীমে– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ[1]

'আল্লাহ তা'আলা সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং যাকাত ও দানকে বৃদ্ধি করেন।'[1]

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন কোনো মানুষ যাকাত দেয়, তখন আল্লাহর ফেরেশতারা তার জন্যে এভাবে দু'আ করেন–

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনার পথে ব্যয় করে তাকে আরো বাড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তার সম্পদ আটকে রাখে এবং যাকাত দেয় না, আপনি তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।'[2]

এ জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

'কোনো দানই কোনো সম্পদের ঘাটতি ঘটায় না।'[3]

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৩৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭৭০৯

৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৮৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৬৯০৮, মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ১৫৯০

এ কারণে অনেক সময় দেখা যায়, একজন মুসলমান একদিকে যাকাত দেয়, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তার আয়ের অন্যান্য পথ খুলে দেন। সে পথে যাকাতের চেয়ে অধিক পরিমাণ টাকা তার কাছে চলে আসে। অনেক সময় এরকম হয় যে, যাকাত দেয়ার কারণে টাকার অঙ্ক যদিও কমে যায়, কিন্তু অবশিষ্ট মালের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বরকত হয় যে, অল্প সম্পদে অনেক উপকার হয়।

সম্পদে বরকতহীনতার পরিণতি

বর্তমান বিশ্ব অংকের বিশ্ব। বরকতের অর্থ মানুষের বুঝে আসে না। বরকত বলা হয় অল্প সম্পদে অধিক লাভ হওয়াকে। যেমন আজকে আপনি অনেক টাকা কামিয়েছেন। কিন্তু বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন, ছেলে অসুস্থ। তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। এক পরীক্ষাতেই সব টাকা ব্যয় হয়ে গেল। এর অর্থ হলো, আপনি যে টাকা কামিয়েছেন তাতে বরকত হয়নি। কিংবা উদাহরণ স্বরূপ আপনি টাকা কামিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। পথে ডাকাতের মুখোমুখি হলেন। সে পিস্তল দেখিয়ে সমস্ত টাকা ছিনিয়ে নিলো। এর অর্থ হলো, পয়সা তো লাভ হয়েছে, কিন্তু তাতে বরকত হয়নি। কিংবা উদাহরণ স্বরূপ আপনি টাকা কামিয়ে খাবার কিনে খেলেন। খাওয়ার ফলে আপনার বদহজম হলো। এর অর্থ হলো, ঐ সম্পদে বরকত হয়নি। এ সবগুলো বরকতহীনতার আলামত। বরকত হলো- আপনি টাকা কামিয়েছেন অল্প। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ অল্প টাকা দ্বারা অধিক কাজ সমাধা করে দিয়েছেন। আপনার অনেক কাজ হয়ে গেছে। এর নাম হলো বরকত। এ বরকত আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেন, যে তাঁর হুকুম মোতাবেক আমল করে। তাই আমরা আমাদের সম্পদের যাকাত দেবো এবং আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন সেভাবে দেবো। হিসাব-কিতাব করে যাকাত দেবো, অনুমান করে নয়।

যাকাতের নেসাব

এর সামান্য ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকাতের একটি নেসাব নির্ধারণ করেছেন। ঐ নেসাব থেকে কম সম্পদের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয হয় না। সেই নেসাব হলো- সাড়ে বায়ান্ন

তোলা রূপা বা তার সমমূল্যের নগদ টাকা, গহনা বা ব্যবসার পণ্য ইত্যাদি। যার নিকট এসব সম্পদ এ পরিমাণে রয়েছে তাকে নেসাবের মালিক বলা হবে।

প্রতিটি টাকার উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়

নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি এক বছর পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। এ ব্যাপারে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি এই পাওয়া যায় যে, মানুষ মনে করে থাকে যে, প্রতিটি টাকার উপর পুরো এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। এ কথা ঠিক নয়। বরং বছরের শুরুতে একবার যখন কোনো ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলো, যেমন ধরুন পহেলা রমাযান কোনো ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলো, এরপর যখন পরবর্তী পহেলা রমাযান এলো তখনও যদি সে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকে তাহলে সে নেসাবের মালিক বলে গণ্য হবে। বছরের মাঝে যে টাকা এসেছে এবং গেছে তা ধর্তব্য হবে না। দেখতে হবে পহেলা রমাযান আপনার কাছে কতো টাকা রয়েছে, সে পরিমাণ টাকার যাকাত দিতে হবে। তার কিছু টাকা যদি একদিন পূর্বেও এসে থাকে তারও যাকাত আজই দিতে হবে।

যাকাত দেয়ার তারিখে যতো টাকা থাকবে তার যাকাত দিতে হবে

যেমন ধরুন এক ব্যক্তির নিকট পহেলা রমাযান এক লক্ষ টাকা ছিলো। পরবর্তী বছর পহেলা রমাযানের দু'দিন পূর্বে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা এলো। এর ফলে পহেলা রমাযানে তার কাছে দেড় লাখ টাকা হলো। এখন ঐ দেড় লাখ টাকার উপর যাকাত ফরয হবে। এ কথা বলা চলবে না যে, এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো মাত্র দু'দিন আগে এসেছে। এর উপর তো বছর পুরো হয়নি। তাই এর উপর যাকাত আসার কথা নয়। এ কথা ঠিক নয়। বরং যাকাত দেয়ার যে তারিখ রয়েছে, যে তারিখে আপনি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়েছেন, ঐ তারিখে যে পরিমাণ সম্পদ আপনার নিকট থাকবে তার

উপর যাকাত ফরয হবে। সে টাকার পরিমাণ গত বছরের পহেলা রমাযানের টাকার তুলনায় কম হোক বা বেশি হোক। যেমন গত বছর এক লাখ টাকা ছিলো। এখন দেড় লাখ টাকা হয়েছে। তাহলে দেড় লাখ টাকার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এ বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকার যাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝে যে টাকা ব্যয় হয়েছে, তা গণ্য হবে না এবং তার যাকাতও দিতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা হিসাব-কিতাবের ভেজাল থেকে বাঁচানোর জন্যে এই সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। বছরের মাঝে তোমাদের পানাহারের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা হিসাব করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে বছরের মাঝে যে অর্থ এসেছে তারও পৃথকভাবে হিসাব রাখতে হবে না যে, তা কতো তারিখে এলো এবং কখন তার উপর বছর পুরো হলো। বরং যাকাত দেয়ার তারিখে যতো টাকা আপনার কাছে আছে, তার যাকাত দিন। বছর অতিবাহিত হওয়ার অর্থ এটাই।

যাকাতযোগ্য সম্পদ কোন্ কোন্টা?

এটাও আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া যে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর যাকাত ফরয করেননি। সম্পদ তো কতো প্রকারেরই রয়েছে। যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয তা এই,

এক. নগদ টাকা, তা যে আকারেই হোক না কেন। নোটের আকারে হোক বা মুদ্রার (কয়েন) আকারে।

দুই. সোনা-রূপা, তা গহনার আকারে হোক বা মুদ্রার আকারে। অনেকে মনে করে যে, মহিলাদের ব্যবহারের অলংকারের উপর যাকাত ফরয নয়, এ কথা ঠিক নয়।

সঠিক কথা হলো, ব্যবহারের অলংকারের উপরেও যাকাত ফরয। তবে শুধু সোনা-রূপার অলংকারের উপর যাকাত ফরয। যদি সোনা-রূপা ছাড়া অন্য কোনো ধাতবের অলংকার থাকে, তা প্লাটিনাম হলেও তার উপর যাকাত ফরয নয়। এমনিভাবে হীরে-জহরত- শুধু ব্যবহারের জন্যে হলে, ব্যবসার জন্যে না হলে- তার উপরে যাকাত ফরয নয়।

যাকাতের সম্পদের মধ্যে যুক্তি খাটাবেন না

এখানে এ বিষয়টাও বোঝা উচিত যে, যাকাত আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপ করা একটি ফরয ইবাদত। কতক মানুষ যাকাতের মধ্যে নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি খাটায়। তারা প্রশ্ন করে, এ জিনিসের উপর যাকাত ফরয কেন এবং ঐ জিনিসের উপর ফরয নয় কেন?

মনে রাখবেন! যাকাত একটি ইবাদত। আর ইবাদতের অর্থই হলো, আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে। যেমন কেউ প্রশ্ন করলো, সোনা-রূপার উপর যাকাত ফরয, হীরে-জহরতের উপর যাকাত ফরয নয় কেন? প্লাটিনামের উপর যাকাত নেই কেন? এ প্রশ্ন ঠিক এমনই, যেমন কেউ বললো, সফরের অবস্থায় যোহর, আসর ও ইশার নামাযে কসর রয়েছে। চার রাকআতের পরিবর্তে দুই রাকআত পড়তে হয়। তাহলে মাগরিব নামাযে কসর নেই কেন? বা কেউ এরূপ বললো যে, এক ব্যক্তি বিমানের ফার্স্ট ক্লাসে সফর করছে। এ সফরে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। অথচ তার নামায অর্ধেক হয়ে থাকে। আর আমি করাচীতে বাসের মধ্যে অতি কষ্টে সফর করি, আমার নামায অর্ধেক হয় না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই, তাহলো- এটা তো আল্লাহ তা'আলার দেয়া ইবাদতের বিধান, ইবাদতের এসব বিধান মেনে চলা জরুরী। অন্যথায় এটা ইবাদতই হবে না।

ইবাদত আল্লাহর হুকুম

কিংবা কেউ বললো, এর কী কারণ যে, যিলহজ্জের নয় তারিখেই হজ্জ হয়ে থাকে। আমার তো এখন হজ্জ করলে সুবিধা। আমি আরাফায় একদিনের পরিবর্তে তিনদিন অবস্থান করতে পারবো। এখন যদি সে ব্যক্তি একদিনের জায়গায় তিনদিনও সেখানে বসে থাকে, তবুও তার হজ্জ হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের যে পদ্ধতি বলেছেন, সে অনুপাতে করেনি। অথবা কেউ বললো, হজ্জের তিনদিন 'জামারা'তে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে অনেক ভিড় হয়, এজন্যে আমি চতুর্থ দিন একত্রে সবদিনের কঙ্কর নিক্ষেপ করে আসবো, তাহলে তার এ কঙ্কর নিক্ষেপ করা সঠিক হবে না। কারণ, এটা ইবাদত। আর ইবাদতের জন্যে যে পদ্ধতি ও নিয়ম বলা হয়েছে, সে নিয়মে সম্পাদন করা হলে তবেই তা

ইবাদত হবে, অন্যথায় নয়। তাই এরূপ প্রশ্ন করা যে, সোনা-রূপার উপর যাকাত কেন ফরয এবং হীরার উপর ফরয নয় কেন? এটা ইবাদতের দর্শনের পরিপন্থী। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা সোনা-রূপার উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা ব্যবহারের জিনিস হলেও তার উপর ফরয। আরো যাকাত ফরয করেছেন নগদ টাকার উপর।

ব্যবসার পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

আরো যে জিনিসের উপর যাকাত ফরয, তা হলো ব্যবসার পণ্য। উদাহরণস্বরূপ কারো দোকানে বিক্রির জন্যে যে মাল রয়েছে তার পুরো স্টকের উপর যাকাত ফরয। তবে স্টকের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সুযোগ রয়েছে যে, যাকাত দেয়ার সময় এভাবে হিসেব করবে যে, আমি যদি এ স্টক একত্রে বিক্রি করি, তাহলে বাজারে তার কী পরিমাণ মূল্য রয়েছে। দেখুন! একটি হলো খুচরা মূল্য, আর অন্যটি হলো পাইকারী মূল্য। তৃতীয় হলো, পুরো স্টক একত্রে বিক্রি করার ক্ষেত্রে তার মূল্য, তাই যখন দোকানের মালের যাকাত হিসাব করবে, তখন এই তৃতীয় প্রকারের মূল্য নির্ধারণের সুযোগ রয়েছে। সে মূল্য ধরে, তার আড়াই শতাংশ যাকাত দিতে হবে। তবে সতর্কতা হলো, সাধারণ পাইকারী মূল্য হিসেব করে সে অনুপাতে যাকাত দেয়া।

ব্যবসার পণ্যের মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত

তাছাড়া বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা প্রত্যেকটি জিনিস ব্যবসার পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই কোনো ব্যক্তির যদি প্লট, জমি বা বাড়ি ক্রয় করার সময় শুরুতেই এ নিয়ত থাকে যে, আমি এটা বিক্রি করবো, তাহলে তার মূল্যমানের উপর যাকাত ফরয হবে। এমন অনেক লোক আছে, যারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্লট ক্রয় করে। শুরু থেকেই তাদের নিয়ত থাকে যে, মূল্য বৃদ্ধি হলে এটা বিক্রি করবো। সে ক্ষেত্রে এই প্লটের মূল্যমানের উপর যাকাত ফরয হবে। কিন্তু যদি এই নিয়তে প্লট ক্রয় করে যে, সুযোগ হলে এর উপরে বসবাসের জন্যে বাড়ি বানাবো, কিংবা ভাড়া দেবো, কিংবা সুযোগ-সুবিধামতো বিক্রি করবো, কোনোটারই স্পষ্ট নিয়ত ছিলো না, সে ক্ষেত্রে আগামীতে এর উপর বাড়ি বানিয়ে বসবাসের সম্ভাবনাও আছে, ভাড়া দেয়ার সম্ভাবনাও আছে, আবার বিক্রি করারও

সম্ভাবনা আছে, এমতাবস্থায় ঐ প্লটের উপর যাকাত ফরয হবে না। তাই যাকাত শুধুমাত্র ঐ অবস্থাতেই ফরয হবে, যখন ক্রয় করার সময়ই তা বিক্রি করার নিয়ত থাকে। এমনকি যদি প্লট ক্রয় করার সময় নিয়ত ছিলো যে, এর উপর বাড়ি বানিয়ে বসবাস করবো। পরবর্তীতে নিয়ত পরিবর্তন করেছে যে, এটা বিক্রি করে পয়সা কামাবো। এ ক্ষেত্রে শুধু নিয়তের পরিবর্তন দ্বারা হুকুমের পরিবর্তন হবে না। ঐ প্লট বিক্রি করে তার টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত এর উপর যাকাত ফরয হবে না।

মোটকথা, যে জিনিস ক্রয় করার সময়ই তা বিক্রি করার নিয়ত থাকে, তা ব্যবসার পণ্য বলে গণ্য হবে এবং তার মূল্যমানের উপর আড়াই শতাংশ যাকাত ফরয হবে।

কোন্ দিনের মূল্যমান ধর্তব্য হবে

এ কথাও মনে রাখুন যে, যেদিন আপনি যাকাত হিসাব করবেন, ঐ দিনের মূল্যমান ধর্তব্য হবে। যেমন ধরুন, আপনি এক লাখ টাকা দিয়ে একটি প্লট ক্রয় করেছিলেন, এখন ঐ প্লটের মূল্য হয়েছে দশ লাখ টাকা। তাহলে আড়াই শতাংশ হিসেবে দশ লাখ টাকার যাকাত দিতে হবে, এক লাখ টাকার নয়।

কোম্পানীর শেয়ারের যাকাতের হুকুম

কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসার পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হলো, আপনি কোনো কোম্পানীর শেয়ার এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করলেন যে, এর মাধ্যমে কোম্পানীর মুনাফা (Dividend) অর্জন করবেন। এর উপর কোম্পানীর পক্ষ থেকে বার্ষিক লাভ আপনি পেতে থাকবেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, আপনি কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্যাপিটাল গেইন (Capital Gain)-এর উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছেন। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছেন যে, বাজারে যখন এর দাম বাড়বে, তখন তা বিক্রি করে লাভ করবেন। যদি আপনি দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন- অর্থাৎ শেয়ার ক্রয় করার সময় তা বিক্রি করার নিয়ত করে থাকেন, তাহলে এমতাবস্থায় পুরো শেয়ারের পূর্ণ বাজারমূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে।

যেমন আপনি পঞ্চাশ টাকা হিসেবে শেয়ার ক্রয় করেছেন। আর আপনার উদ্দেশ্য ছিলো, এর মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিক্রি করে লাভ করবেন। এখন যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব বের করবেন, সেদিন শেয়ারের মূল্য ষাট টাকা হয়েছে, তাহলে এখন ষাট টাকা হিসেবে ঐ শেয়ারের মূল্যমান ধরতে হবে এবং তার উপর আড়াই শতাংশ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

কিন্তু যদি প্রথম পদ্ধতি হয়, অর্থাৎ আপনি এই নিয়তে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেছেন যে, কোম্পানীর পক্ষ থেকে এর উপর বার্ষিক লাভ পেতে থাকবেন এবং তা বিক্রি করার নিয়ত না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্যে এ সুযোগ রয়েছে যে, এটা যে কোম্পানীর শেয়ার, সেই কোম্পানীর কী পরিমাণ Fixed Asset রয়েছে, যেমন ভবন, যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি, আর কী পরিমাণ তরল সম্পদ- অর্থাৎ নগদ টাকা, ব্যবসার পণ্য ও কাঁচামাল- আকারে রয়েছে, এসব তথ্য কোম্পানী থেকেই অবগত হওয়া সম্ভব। যেমন ধরুন, কোনো কোম্পানীর ষাট শতাংশ সম্পদ নগদ টাকা, ব্যবসার পণ্য, কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত মালের আকারে রয়েছে, আর চল্লিশ শতাংশ সম্পদ রয়েছে ভবন, যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি আকারে। এমতাবস্থায় আপনি ঐ শেয়ারের বাজারমূল্য ধরে তার ষাট শতাংশের উপর যাকাত পরিশোধ করবেন। উদাহরণস্বরূপ শেয়ারের বাজারমূল্য ছিলো ষাট টাকা, আর কোম্পানীর ষাট শতাংশ সম্পদ হলো যাকাতযোগ্য, আর চল্লিশ শতাংশ সম্পদ যাকাত যোগ্য নয়। তাহলে এমতাবস্থায় আপনি শেয়ারের পুরো মূল্য ষাট টাকার পরিবর্তে ছত্রিশ টাকার যাকাত পরিশোধ করবেন। আর যদি কোনো কোম্পানীর বিস্তারিত তথ্য জানতে না পারেন, তাহলে এ অবস্থায় সতর্কতাস্বরূপ শেয়ারের পুরো বাজারমূল্যের উপর যাকাত দিবেন।

শেয়ার ছাড়া যতো Financial Instruments রয়েছে- তা বন্ড হোক, বা Certificate হোক, এগুলোর আসল মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে।

কারখানার কোন্ কোন্ জিনিসের উপর যাকাত আসে

কোনো ব্যক্তি কারখানার মালিক হলে, কারখানার প্রস্তুতকৃত পণ্যের মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। এমনিভাবে যে সমস্ত মাল প্রস্তুতির

বিভিন্ন ধাপে রয়েছে, বা কাঁচা মালের আকারে রয়েছে, তার উপরও যাকাত ফরয হবে। তবে কারখানার যন্ত্র, ভবন, গাড়ি ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয হবে নয়।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি ব্যবসার মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টাকা বিনিয়োগ করে ঐ ব্যবসার আনুপাতিক অংশের মালিক হয়েছে, তাহলে তার মালিকানায় যে পরিমাণ অংশ রয়েছে, তার বাজারমূল্য হিসেবে যাকাত ফরয হবে।

সারকথা হলো, নগদ টাকার উপর যাকাত ফরয- যার মধ্যে ব্যাংক ব্যালেন্স ও Financial Instruments-ও অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসার পণ্য- যার মধ্যে তৈরী মাল, কাঁচা মাল এবং যে সব মাল প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপে রয়েছে সে সবই অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসার পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া যেসব জিনিস বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, সেগুলো ব্যবসার পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। যাকাত দেয়ার সময় সে সবের সামগ্রিক মূল্যমান বের করে তার যাকাত দিতে হবে।

উসুলযোগ্য ঋণের যাকাত

এ ছাড়া অনেক টাকা থাকে অন্যের থেকে উসুলযোগ্য। যেমন, অন্যকে ঋণ দিয়েছে, কিংবা বাকিতে মাল বিক্রি করেছে, যার মূল্য উসুল হবে। এমতাবস্থায় যখন নিজের মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদের যাকাতের হিসাব করবে, তখন ঐ সব ঋণ ও উসুলযোগ্য অর্থও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া উত্তম। যদিও শরীয়তের বিধান এই যে, যে সব ঋণ এখনও উসুল হয়নি, তা উসুল হওয়ার আগ পর্যন্ত যাকাত আদায় করা ফরয নয়। তবে যখন উসুল হবে, তখন বিগত সবগুলো বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন ধরুন, আপনি এক ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা ধার দিয়েছেন। পাঁচ বছর পর সেই টাকা ফেরৎ পেলেন। এই এক লাখ টাকার উপর যদিও গত পাঁচ বছরে যাকাত দেয়া ফরয হয়নি, কিন্তু তা উসুল হওয়ার পর গত পাঁচ বছরের যাকাত (বকেয়া সহ) দিতে হবে। যেহেতু বিগত বছরের যাকাত এক সাথে পরিশোধ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, তাই উত্তম হলো, ঐ ঋণ দেয়া টাকার যাকাতও প্রতি

বছর আদায় করে দিবে। এ জন্যে যখন যাকাতের হিসাব করবে, তখন ঐ ঋণগুলোকেও সমগ্র মালের অন্তর্ভুক্ত ধরবে।

ঋণ বিয়োগ করা

অপরদিকে দেখবেন যে, আপনার দায়িত্বে অন্য লোকের কী পরিমাণ ঋণ (পাওনা) রয়েছে। তারপর সমস্ত মালের মধ্যে থেকে সেগুলো বিয়োগ করবেন। বিয়োগ করার পর যা বাকী থাকবে, তা হবে যাকাতযোগ্য সম্পদ। এখান থেকে আড়াই শতাংশ বের করে যাকাতের নিয়তে আদায় করবেন। উত্তম হলো, যাকাতের অর্থ আলাদা করে বের করে রাখবেন। তারপর সময় সুযোগ মতো সেগুলো যাকাতের হকদারদের পিছনে ব্যয় করবেন। এটা হলো যাকাত বের করার নিয়ম।

ঋণ দুই প্রকার

ঋণ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে। তা হলো, ঋণ দুই প্রকার। এক হলো সাধারণ ঋণ, যা মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা সাময়িক প্রয়োজনে নিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ হলো, যা বড় বড় পুঁজিপতিরা উৎপাদনের (অর্থ বাড়ানোর) লক্ষ্যে নিয়ে থাকে। যেমন কারখানা করা, যন্ত্রপাতি-মেশিন ক্রয় করা, বা ব্যবসার পণ্য আমদানি করার জন্যে ঋণ নিয়ে থাকে। কিংবা উদাহরণস্বরূপ একজন পুঁজিপতির নিকট আগে থেকে দু'টি কারখানা রয়েছে। কিন্তু সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তৃতীয় আরেকটি কারখানা করলো। এখন যদি এই দ্বিতীয় প্রকারের ঋণকে মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ করা হয়, তাহলে ঐ পুঁজিপতিদের উপর একপয়সাও যাকাত ফরয হবে না। শুধু তাই নয়, উল্টো বরং তারাই যাকাত খাওয়ার হকদার হয়ে যাবে। এ কারণে যে, তাদের কাছে যে মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি পরিমাণ ঋণ তারা ব্যাংক থেকে নিয়ে রাখে। বাহ্যত তাদেরকে ফকির ও মিসকীন দেখা যাচ্ছে। যে কারণে শরীয়ত ঋণ বিয়োগ করার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছে।

ব্যবসায়িক ঋণ কখন বিয়োগ করা হবে

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, প্রথম প্রকারের ঋণ তো মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ করে যাকাত আদায় করতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ঋণের মধ্যে এ ব্যাখ্যা রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছে এবং তা দ্বারা এমন সব জিনিস ক্রয় করেছে, যা যাকাতযোগ্য- যেমন, কাঁচা মাল বা ব্যবসার পণ্য ক্রয় করেছে- তখন ঐ ঋণ মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ হবে। কিন্তু ঐ ঋণ দ্বারা যদি এমন সম্পদ ক্রয় করে থাকে, যেগুলো যাকাতযোগ্য নয়, তখন ঐ ঋণ মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ হবে না।

ঋণের দৃষ্টান্ত

যেমন, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। ঐ টাকা দ্বারা সে বিদেশ থেকে একটি মেশিন আমদানি করেছে। যেহেতু এ মেশিন যাকাতযোগ্য নয়, তাই এ ঋণ বিয়োগ হবে না। কিন্তু সে যদি এ ঋণের টাকা দিয়ে কাঁচামাল ক্রয় করে। আর কাঁচামাল যেহেতু যাকাতযোগ্য, তাই এ ঋণ বিয়োগ হবে। কারণ, এ কাঁচামাল যাকাতযোগ্য মোট সম্পদের মধ্যে পূর্বেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সারকথা হলো, সাধারণ ঋণ পুরোটাই মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ হবে। আর উৎপাদনমূলক কাজের জন্যে যে ঋণ নেয়া হয়েছে, তা দ্বারা যদি এমন মাল ক্রয় করে, যা যাকাতযোগ্য নয়, তাহলে ঐ ঋণ বিয়োগ হবে না। আর যদি যাকাতযোগ্য মাল ক্রয় করে, তাহলে তা বিয়োগ হবে। এই হলো, যাকাত আদায় সংক্রান্ত বিধান।

হকদারকে যাকাত আদায় করুন

অপরদিকে যাকাত আদায় করার ব্যাপারেও শরীয়ত বিধান দিয়েছে। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন- আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেননি যে, যাকাত বের করো, এ কথাও বলেননি যে, যাকাত ফেলে দাও, বরং বলেছেন- آتُوا الزَّكَاةَ 'যাকাত আদায় করো'। অর্থাৎ লক্ষ্য করো! যাকাত যেনো সেই জায়গায় যায়, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেখানে যাওয়া উচিৎ। কতক মানুষ যাকাত তো

দেয়, কিন্তু তা সঠিক খাতে যাচ্ছে কি না তার পরোয়া করে না। যাকাত বের করে কারও হাতে দিয়ে দেয়। যাচাই করে দেখে না, সঠিক খাতে সে ব্যয় করবে কি না। আজ দুনিয়াতে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তার মধ্যে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যারা এ কথার প্রতি লক্ষ্য করে না যে, যাকাত সঠিক খাতে ব্যয় হচ্ছে কি না? এ জন্যে বলেছেন- যাকাত আদায় করো। অর্থাৎ যাকাতের যে হকদার তাকে দাও।

যাকাতের হকদার কে?

এর জন্যে শরীয়ত এ মূলনীতি নির্ধারণ করেছে যে, যাকাত শুধুমাত্র ঐ সব ব্যক্তিকেই দেয়া যাবে, যারা নেসাবের মালিক নয়। এমনকি যদি তাদের মালিকানায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন সম্পদ থাকে, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান, তাহলে তারাও যাকাতের হকদার নয়। যাকাতের হকদার ঐ ব্যক্তি, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান অর্থ বা সম্পদ নেই।

হকদারকে মালিক বানিয়ে দিবে

এ ক্ষেত্রেও শরীয়তের নির্দেশ হলো, যাকাতের হকদারকে মালিক বানিয়ে দিবে। অর্থাৎ যাকাতের হকদার এ সম্পদের ব্যাপারে স্বাধীন হবে, ইচ্ছে মতো সে ব্যবহার করতে পারবে। এ কারণেই কোনো বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজে যাকাত ব্যবহার করা যাবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনের খাতে যাকাত ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, যাকাতের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠান করার অনুমতি দেয়া হলে যাকাতের টাকা খেয়ে দেয়ে শেষ করে ফেলতো। কারণ, একেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বেতন অনেক হয়ে থাকে। নির্মাণ কাজে লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। এ জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, যার নেসাব পরিমাণ মাল নেই, তাকে মালিক বানিয়ে দাও। যাকাত গরীব, অসহায় ও দরিদ্র লোকের হক। তাই যাকাতের মাল তাদের কাছেই পৌছতে হবে। যখন তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিবে, তখন তোমার যাকাত আদায় হবে।

যে সব আত্মীয়কে যাকাত দিতে পারবে

যাকাত আদায়ের নির্দেশ মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করে যে, আমার নিকট এই পরিমাণ যাকাতের টাকা রয়েছে, সঠিক খাতে তা ব্যয় করতে হবে। তাই তারা তালাশ করে যে, কে কে এর হকদার রয়েছে। হকদারদের তালিকা তৈরী করে তাদের নিকট যাকাত পৌছিয়ে দেয়। এটাও মানুষের একটি দায়িত্ব। আপনার মহল্লায়, ঘনিষ্ঠদের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যারা হকদার তাদেরকে যাকাত দিবেন। এদের মধ্যেও আত্মীয়দেরকে যাকাত দেয়া অধিক উত্তম। এতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়ে থাকে। যাকাত আদায় করার সওয়াবও হয়ে থাকে, আত্মীয়তা বজায় রাখার সওয়াবও হয়ে থাকে। সমস্ত আত্মীয়কেই যাকাত দেয়া যায়। তবে দুই শ্রেণীর আত্মীয় এমন রয়েছে, যাদেরকে যাকাত দেয়া যায় না।

এক. জন্মসূত্রের আত্মীয়। এ কারণে বাপ ছেলেকে এবং ছেলে বাপকে যাকাত দিতে পারবে না।

দুই. বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়। এ কারণে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। এ ছাড়া অন্য সমস্ত আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে। যেমন ভাই, বোন, চাচা, খালা, ফুফু, মামাকে যাকাত দেয়া যাবে। তবে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তারা যেন যাকাতের হকদার হয় এবং নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হয়।

বিধবা ও এতিমকে যাকাত দেয়ার হুকুম

কতক লোক মনে করে থাকে যে, কোনো বিধবা মহিলা থাকলে তাকে অবশ্যই যাকাত দেয়া উচিত। অথচ এখানেও শর্ত রয়েছে যে, সে যেন যাকাতের হকদার হয় এবং নেসাবের মালিক না হয়। কোনো বিধবা মহিলা যদি যাকাতের হকদার হয়ে থাকে তাহলে তাকে সাহায্য করা খুবই উত্তম কাজ। কিন্তু কোনো বিধবা মহিলা যদি যাকাতের হকদার না হয়, তাহলে শুধু বিধবা হওয়ার কারণে সে যাকাত প্রদানের খাত বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে এতিমকে যাকাত দেয়া ও সাহায্য করা খুবই উত্তম কাজ। কিন্তু এটা দেখে যাকাত দিতে হবে যে, সে যাকাতের

হকদার কি না। কোনো এতিম যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে এতিম হওয়া সত্ত্বেও তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। এসব মাসআলা সামনে রেখে যাকাত দেয়া উচিত।

ব্যাংক থেকে যাকাত কর্তনের বিধান

কিছুদিন ধরে আমাদের দেশে সরকারী পর্যায়ে যাকাত উসুল করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এ কারণে অনেক আর্থিক-প্রতিষ্ঠান থেকে যাকাত উসুল করা হয়ে থাকে। কোম্পানিগুলোও যাকাত কর্তন করে সরকারকে দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা তুলে ধরছি।

ব্যাংক ও আর্থিক-প্রতিষ্ঠানসমূহের যাকাত কর্তন সম্পর্কে মাসআলা হলো, এ কর্তনের দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সতর্কতা স্বরূপ পহেলা রমাযান আসার আগেই মনে মনে নিয়ত করবে যে, আমার টাকা থেকে যে যাকাত কর্তন করা হবে, তা আমি আদায় করছি। এতে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার যাকাত দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

এ ক্ষেত্রে কারো কারো সন্দেহ জাগে যে, আমার পুরো টাকার উপর বছর অতিবাহিত হয়নি, অথচ পুরো টাকার উপর যাকাত কর্তন করা হলো। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক টাকার উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। বরং আপনি যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়ে থাকেন, তাহলে বছর পুরো হওয়ার একদিন পূর্বেও আপনার নিকট যে টাকা এসেছে এবং তার উপর যে যাকাত কর্তন করা হয়েছে, তা পুরোপুরি সঠিকভাবে কর্তন করা হয়েছে। কারণ, তার উপরেও যাকাত ফরয হয়েছে।

একাউন্টের টাকা থেকে ঋণ বিয়োগ করবেন কীভাবে?

কোনো ব্যক্তির পুরো সম্পদই যদি ব্যাংকে থাকে, তার নিকট কিছুই না থাকে। অপরদিকে তার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যাংক তো নির্ধারিত তারিখে যাকাত কর্তন করে নেয়, অথচ তার সম্পদ থেকে ঋণ বিয়োগ করা হয় না। যার ফলে অতিরিক্ত যাকাত কর্তন করা হয়। এর

একটি সামাধান তো এই যে, নির্ধারিত তারিখ আসার আগেই ব্যাংক থেকে নিজের টাকা তুলে নিবে, বা Current Account-এর মধ্যে রেখে দিবে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের টাকা Current Account-ই রাখা উচিত। Saving Account-এ মোটেই রাখা উচিত নয়। কারণ, এটা সুদভিত্তিক একাউন্ট। Current Account-এ যাকাত কর্তন করা হয় না। মোটকথা, যাকাতের নির্ধারিত তারিখ আসার পূর্বে নিজের টাকা Current Account-এ হস্তান্তর করবে। এখান থেকে যেহেতু যাকাত কর্তন করা হবে না, তখন নিজের মতো করে হিসাব করে ঋণ বাদ দিয়ে যাকাত আদায় করবে। দ্বিতীয় সমাধান এই যে, ঐ ব্যক্তি ব্যাংকে লিখিত দিবে যে, আমি নেসাবের মালিক নই, যে কারণে আমার উপর যাকাত ফরয নয়। এটা লিখে দিলে আইনানুগভাবে তার থেকে যাকাত কর্তন করা হবে না।

কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত কর্তন

একটি মাসআলা হলো, কোম্পানীর শেয়ার সংক্রান্ত। কোম্পানী যখন শেয়ারের উপর বার্ষিক লাভ বণ্টন করে, তখন যাকাত কর্তন করে নেয়। কিন্তু কোম্পানী যাকাত কর্তন করে শেয়ারের ফেইজ ভ্যালুর উপর। অথচ শরীয়তের বিধান মতে যাকাত ফরয হয় শেয়ারের মার্কেট ভ্যালুর উপর। তাই ফেইজ ভ্যালুর উপর যে পরিমাণ যাকাত কর্তন করা হয়েছে তা তো আদায় হয়ে গেছে। তবে শেয়ারের যাকাতের আলোচনায় যে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে আপনাকে ফেইজ ভ্যালু আর মার্কেট ভ্যালুর মধ্যে যেই পার্থক্য রয়েছে তা হিসাব করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ একটি শেয়ারের ফেইজ ভ্যালু ছিলো পঞ্চাশ টাকা, অথচ তার মার্কেট ভ্যালু হলো ষাট টাকা। তাহলে কোম্পানীর লোকেরা পঞ্চাশ টাকার যাকাত আদায় করেছে। তাই দশ টাকার যাকাত আপনাকে পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। কোম্পানীর শেয়ার এবং এন আই টি ইউনিট উভয়ের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি। তাই যে ক্ষেত্রে ফেইজ ভ্যালুর উপর যাকাত কর্তন করা হয়, সেখানে মার্কেট ভ্যালুর হিসাব করে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য হবে, পৃথকভাবে তার যাকাত দেয়া জরুরী।

যাকাতের তারিখ কোন্‌টি?

আরেকটি কথা বুঝুন! শরীয়তে যাকাত দেয়ার নির্ধারিত কোনো তারিখ বা সময় নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির যাকাত দেয়ার তারিখ ভিন্ন। শরীয়তে যাকাতের আসল তারিখ ঐটা, যে তারিখ এবং যে দিনে প্রথমবার নেসাবের মালিক হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি পহেলা মুহাররমে প্রথমবার নেসাবের মালিক হয়েছে। তাহলে তার যাকাত দেয়ার তারিখ হবে পহেলা মুহাররম। পরবর্তী প্রতিবছর সে পহেলা মুহাররম যাকাতের হিসাব করবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে যে, প্রথম কখন নেসাবের মালিক হয়েছে, তা স্মরণ থাকে না। এ অপারগতার কারণে নিজের জন্যে সুবিধাজনক একটি তারিখ নির্ধারণ করে নিবে, যে তারিখে তার জন্যে হিসাব করা সহজ হবে। পরবর্তী প্রতি বছর ঐ তারিখে হিসাব করে যাকাত দিবে। তবে সতর্কতাস্বরূপ কিছু অতিরিক্ত দিবে।

রমাযানুল মুবারকের তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে কী?

সাধারণত মানুষ রমাযানুল মুবারকে যাকাত দিয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, হাদীস শরীফে আছে, রমাযানুল মুবারকে এক ফরযের সওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়। যাকাতও যেহেতু একটি ফরয আমল, তাই রমাযান মাসে তা আদায় করলে সত্তরগুণ লাভ হবে। কথা সঠিক। এ মানসিকতাও ভালো। কিন্তু কারো যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার তারিখ জানা থাকে, তাহলে শুধু সওয়াবের কারণে সে রমাযানুল মুবারকের তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে না। সেই নির্ধারিত তারিখেই তাকে যাকাত হিসাব করতে হবে। তবে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে সে এটা করতে পারে যে, অল্প অল্প করে যাকাত দিতে থাকবে। অবশিষ্ট যাকাত রমাযানুল মুবারকে আদায় করবে। তবে যদি তারিখ স্মরণ না থাকে, তাহলে রমাযানুল মুবারকের কোনো একটি তারিখ নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে সতর্কতা হিসেবে কিছু অতিরিক্ত দিয়ে দিবে। যাতে করে তারিখ আগপাছ হওয়ার কারণে যে পার্থক্য হয়েছে, তা পুরো হয়ে যায়।

যখন একবার একটি তারিখ নির্ধারণ করে, তখন প্রতি বছর ঐ তারিখেই হিসাব করতে হবে। ঐ তারিখে দেখবে কী কী সম্পদ রয়েছে।

নগদ টাকা কতো রয়েছে। স্বর্ণ থাকলে ঐ তারিখের স্বর্ণের মূল্য যোগ করবে। শেয়ার থাকলে ঐ তারিখের শেয়ারের মূল্য যোগ করবে। স্টকের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে ঐ তারিখের স্টকের মূল্য নির্ধারণ করবে। তারপর প্রতি বছর ঐ তারিখেই হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। এ তারিখ থেকে আগপাছ করা উচিত নয়।

যাকাতের বিষয়ে অল্প-বিস্তর আলোচনা তুলে ধরলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব বিধানের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

যিকির

গুরুত্ব, তাৎপর্য, পদ্ধতি

খুব ভালো করে বুঝে নিন, দ্বীনদারীর সঙ্গে এ সমস্ত কাশফ ও কারামতের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য এর সাথে সম্পর্কিত নয়। আসল দ্বীনদারী হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে চলা। তাঁর হুকুম তামিলের জন্যেই যিকির করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে। সেই সম্পর্ক সঠিক করতে হবে। যিকির করতে কষ্ট লাগুক, বোঝা মনে হোক, মনোযোগ না আসুক, তারপরও বসে যান এবং আল্লাহর যিকিরে রত হন। এই আনুগত্যের পরিণতিতে দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা কেমন নূর ও বরকত দান করেন। ধীরে ধীরে এ সমস্ত যিকিরও সহজে পুরা হতে থাকবে এবং যিকিরের আসল ফায়দা অর্থাৎ, আল্লাহমুখী হওয়া এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এর তাওফীক দান করুন, আপনাদেরকেও দান করুন। আমীন।

যিকিরের গুরুত্ব*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

প্রতি বছর পবিত্র রমাযান মাসে যোহরের নামাযের পর হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর কিতাব 'আনফাসে ঈসা' থেকে মালফূযাত শোনানোর আমল চলে আসছে। কিন্তু এ বছর আমি সফরে থাকার কারণে এ আমল এখনো শুরু করা যায়নি। আর মাত্র অল্প ক'দিন বাকি আছে, তাই ভাবলাম, এই কিতাবের কোনো একটি অংশকে সামনে রেখে তার উপর কিছু আলোচনা করি।

এখন পবিত্র রমাযানের শেষ দশক চলছে। এ দশক পুরা রমাযানের সারনির্যাস। আল্লাহ তা'আলা এ দশকে রহমতের সব দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সবদিক থেকে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীস শরীফে এ দশককে عِتْقٌ مِنَ النِّيْرَانِ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দশকে বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন।[১]

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ৩০-৪৭, ইসলাহী মাওয়ায়িয, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৭১-৯২

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ডঃ ৮, পৃ. ৪৬৩, হাদীস নং ২৩৬৬৮, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১৪৮৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ডঃ ৪, পৃ. ৩৬৮

রমাযানের শেষ দশকে রাসূল সা.-এর অবস্থা

হাদীস শরীফে এসেছে যে, যখন পবিত্র রমাযানের শেষ দশক আরম্ভ হতো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই হতো যে-

شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَأَحْيَا لَيْلَهٗ وَأَيْقَظَ أَهْلَهٗ

'তিনি নিজের লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে নিতেন, রাতকে জীবিত রাখতেন (অর্থাৎ, জাগ্রত থাকতেন) এবং পরিবারের লোকদেরকেও ইবাদতের জন্যে জাগিয়ে দিতেন।'[১]

شَدَّ مِيْزَرَهٗ এর শাব্দিক অর্থ- 'তিনি তাঁর লুঙ্গি বেঁধে নিতেন'। এর দ্বারা একটি বাগধারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো, কোনো কাজের জন্যে কোমর কষে বাঁধা। অর্থাৎ তিনি কোমরকে কষে বাঁধতেন এবং ইবাদতের মধ্যে অধিকতর পরিশ্রম ও কষ্ট-সাধনার জন্যে প্রস্তুত হতেন।

وَأَحْيَا لَيْلَهٗ 'এবং রাতকে জীবিত রাখতেন'। অর্থাৎ রাতের বেলা জাগতেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্যে রাত অতিবাহিত করতেন।

وَأَيْقَظَ أَهْلَهٗ 'এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও ইবাদতের জন্যে জাগিয়ে দিতেন'।

অন্যান্য দিনে তাহাজ্জুদের সময়ের অবস্থা

অন্যান্য দিনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিলো যে, রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্যে জাগতেন তখন পরিবারের লোকদের যেন ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে খুব গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতেন। হাদীস শরীফে সে অবস্থা এই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

قَامَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

'যখন তিনি বিছানা থেকে উঠতেন, তখন খুব আস্তে উঠতেন, (যেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘুম ভেঙ্গে না যায়) এবং যখন দরজা খুলতেন, তখন খুব আস্তে খুলতেন, যাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।'[২]

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৪, সহীহু মুসলিম, হাদীস নং ২০০৮, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ১১৬৮, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৭৫৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৩০০১

২. সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ২০১০

নিজের পরিবারের লোকদের ঘুমের ব্যাপারে তিনি এত সজাগ ছিলেন। কিন্তু যখন পবিত্র রমাযানের শেষ দশক আরম্ভ হতো, তখন তিনি তাদেরকে গুরুত্বের সাথে জাগিয়ে দিতেন। এটি ইবাদতের সময়, এ সময় আল্লাহর ইবাদত করো।

কতক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে-

وَكَثُرَ صَلَاتُهُ

অর্থাৎ এ দিনগুলোতে তিনি অধিকহারে নামায পড়তেন। ইবাদতের এই গুরুত্ব শুধু বেজোড় রাতেই নয়, বরং শেষ দশকের সব রাতেই এরূপ গুরুত্ব দিতেন।

শেষ দশক কীভাবে অতিবাহিত করবেন?

যাই হোক! আল্লাহর যিকিরে অতিবাহিত করার জন্যেই এই শেষ দশক। নামাযও যিকিরের একটি শাখা। অন্যান্য ইবাদতও যিকিরের শাখা। উদ্দেশ্য হলো- পবিত্র রমাযানের এই শেষ দশক আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে। মুখের যিকির ও দিলের যিকিরে এ সময়গুলো কাটাতে হবে।

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন যে, শেষ দশকের এ রাতগুলোকে সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রামে ব্যয় করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। বিপজ্জনক ব্যাপার। এ রাতগুলো সভা-সমিতি ও বক্তৃতার জন্যে নয়; বরং এ রাতগুলো শুধুই আমলের জন্যে। মানুষ নির্জনে একাকী বসে, নিজের প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করবে, শুধু সে থাকবে আর তার আল্লাহ থাকবেন, তৃতীয় আর কেউ থাকবে না। এভাবে এ দশক অতিবাহিত করুন। যিকিরে কাটান। মুখেও যিকির থাকবে, অন্তরেও যিকির থাকবে। চলাফেরা, ওঠা-বসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করবে। বাজারে, অফিসে, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকলে তখনো মুখে এবং অন্তরে আল্লাহর যিকির থাকবে। অবস্থা এই হবে যে-

دل بیار دست بکار

'হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে, আর মন থাকবে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ।'

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কথা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

'হে ঈমানদারগণ! অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো।'[১]

কতক ছাত্র মনে করে যে, যিকির করা আল্লাহ্র ওলীদের কাজ। মৌলবী ও আলেমদের যিকির করে কী হবে? উলামায়ে কেরামের কাজ তো হলো- তাঁরা ওয়াজ করবে, তাবলীগ করবে, পাঠদান করবে, সবক পড়াবে, মুতালাআ করবে, তাকরার করবে ইত্যাদি।মৌলবীদের যিকিরের সাথে কিসের সম্পর্ক? যিকির করা তো আল্লাহর ওলীদের কাজ। যখন খানকায় যাবো, তখন যিকির করবো। আরে ভাই! আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম, এখানে তো সমস্ত ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। এবার আপনারাই বলুন যে, আলেমগণ ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত কি না?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

(হে ঈমানদারগণ! অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো) -এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে সবাই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে এরূপ মনে করা যে, আমরা তো তালিবে ইলম, আমরা তো কিতাব পড়বো, মুতালাআ করবো, তাকরার করবো, কিন্তু যিকির করবো না। মনে রাখবেন, এটি মারাত্মক কথা।

যিকিরের মধ্যে আধিক্য কাম্য

তাছাড়া এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর যিকির অধিকহারে করো। যার অর্থ এই যে, একবার দু'বার যিকির করা যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহর নাম বলতে থাকো। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে সব সময় তোমার মুখে যেন যিকির চালু থাকে। এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ হবে?

---

১. সূরা আহযাব, আয়াত ৪১

উত্তরে তিনি বললেন-

اَلذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ

'যে সমস্ত নারী-পুরুষ অধিকহারে আল্লাহর যিকির করে।'[১]

মনোযোগ ছাড়া আল্লাহর যিকির করা

কতক মানুষের অন্তরে এই প্রশ্ন জাগে যে, এটা কেমনতর যিকির যে, মন-মগজ অন্যদিকে ব্যস্ত আর মুখে যিকির চলছে! সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা-এর তাসবীহ পড়ছে, অথচ মনোযোগ অন্যদিকে, চিন্তা অন্যদিকে, মস্তিষ্ক অন্যদিকে, এমন যিকির দ্বারা কী লাভ হবে? মনে রাখবেন! এটি শয়তানের ধোঁকা। শুধু যদি জিহ্বা আল্লাহর যিকিরের তাওফীক লাভ করে। মন-মস্তিষ্ক অন্যদিকে ব্যস্ত থাকলেও তা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। এটাও বড় দৌলত। এটাও কি কম দৌলত যে, দেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে একটি হলেও তো তাঁর স্মরণে মগ্ন রয়েছে।

মুখে যিকির আর মনে অন্য চিন্তা

এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ আছে-

بر زباں تسبیح ودر دل گاؤ خر
ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

'মুখে যিকির চলছে আর মনের মধ্যে গরু-গাধার চিন্তা। এমন তাসবীহের অন্তরে কী প্রভাব পড়বে?'

জনৈক কবি এ কবিতা বলেছেন, কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন যে, যে ব্যক্তি এ কবিতা বলেছে, সে প্রকৃত অবস্থা জানে না। প্রকৃত অবস্থা তো এই যে,

بر زباں تسبیح ودر دل گاؤ خر
ایں چنیں تسبیح ہم دارد اثر

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৩৪, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩২৯৮, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৮৯৬৪

'মুখে যদি তাসবীহ জারি থাকে এবং অন্তরে গরু-গাধার চিন্তা আসে, আল্লাহর মেহেরবানীতে এমন তাসবীহও অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে।'

মুখের যিকির এ পথের প্রথম সিঁড়ি। মুখ যদি আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত না হয়, তাহলে কখনই অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা আবাদ হবে না। যে ব্যক্তি এই প্রথম সিঁড়ি অতিক্রম করবে না, তার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ কী করে প্রতিষ্ঠিত হবে? এ জন্যে মুখে যিকির করা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম ধাপ। মুখের যিকির যদি না থাকে তাহলে যেন সিঁড়ির প্রথম ধাপই নেই। এ জন্যেই এমন মনে করা উচিত নয় যে, মনোযোগ ছাড়া শুধু মুখে যিকির করার দ্বারা লাভ কী? বরং মন বসুক বা না বসুক, মুখে যিকির করতে থাকুন। মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হোক বা না হোক, আপনি যিকির চালিয়ে যান। আপনার কাজ হলো- আল্লাহর নাম জপতে থাকা। ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলা মনের একাগ্রতাও সৃষ্টি করে দেবেন। মনে করুন, যদি সারা জীবনেও মনের একাগ্রতা সৃষ্টি না হয়, তবুও মুখের যিকির ফায়দাহীন নয়।

আল্লাহর যিকির একটি শক্তি

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. বলতেন- 'আল্লাহর যিকির হলো একটি এনার্জি এবং শক্তি। এ জন্যেই সকালে ওঠার পর নাস্তা করার পূর্বে এই এনার্জি ও শক্তি সঞ্চয় করে নাও। কারণ, আল্লাহর যিকির অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে। সংকল্পে শক্তি যোগান দেয়। সাহসে শক্তি সৃষ্টি করে। এর ফলে মানুষের মধ্যে শয়তান ও নফসের সঙ্গে মোকাবেলা করার সাহস জন্মায়। এ জন্যে নফস ও শয়তানকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে যিকিরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যিকিরকারী ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হয় না। এই মৌখিক যিকিরের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করার যোগ্যতা পয়দা হয়।

আল্লাহর যিকির গোনাহ থেকে বাধা দিলো

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে যখন গোনাহের অবস্থা সৃষ্টি হলো এবং গোনাহের সমস্ত উপকরণ একত্রিত হলো, এই যিকিরই তখন তাঁকে গোনাহ থেকে বাধা দিলো। কারণ, যখন যুলায়খা বললো-

هَيْتَ لَكَ

'আমার কাছে আসো।'[১]

তখন তিনি উত্তরে বললেন-

مَعَاذَ اللّٰهِ

'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[২]

এমন কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর আশ্রয়ের অনুভূতিই এই শক্তি যুগিয়ে ছিলো। এমন চেতনা বিধ্বংসী পরিবেশে- যেখানে মানুষের পদস্খলনের ৯৯% সম্ভাবনা ছিলো- সেখানে আল্লাহর এই যিকিরই তাঁকে গোনাহ থেকে বাধা দিয়েছিলো।

শিরায় শিরায় যিকির বিস্তার লাভ করেছিলো

এরপর হযরত ইউসুফ আ. পরবর্তী কথা যা বলেছিলেন, তা ছিলো-

إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ

'তিনি আমার প্রভু। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন।'[৩]

মুফাসসিরগণ এ বাক্যের দু'টি তাফসীর করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমার প্রভু' দ্বারা 'আযীযে মিসর' উদ্দেশ্য। যুলায়খা যার বিবি ছিলেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, 'আমার প্রভু' দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য। তিনি এ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদিও তুমি সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছো এবং দরজাগুলোতে তালা লাগিয়ে দিয়েছো আর মনে করেছো যে, এর ফলে কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু

---

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৩
২. সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৩
৩. সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৩

আমার একজন প্রভু আছেন, যিনি আমাকে এ অবস্থাতেও দেখছেন। যিনি আমাকে উত্তম ঠিকানা দিয়েছেন। 'তিনি আমার প্রভু' -এ চিন্তা যিকিরের বরকতেই এসেছে। সেই যিকির- যা তাঁর শিরায় শিরায় বিস্তার লাভ করেছিলো। আল্লাহ তা'আলার স্মরণ তাঁর মন-মগজে গেঁথে গিয়েছিলো। এর ফলে তিনি গোনাহ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। যাই হোক, এই যিকির একটি শক্তি এবং এনার্জি, সকাল বেলায় কর্মজীবনে প্রবেশ করার পূর্বে যা অর্জন করা উচিত।

মাসনূন যিকিরের জন্যে শায়খের অনুমতির প্রয়োজন নেই

সাধারণ নিয়ম তো এই যে, যখন কোনো মানুষ কোনো শায়খের কাছে যায়, তখন শায়খ তাকে কিছু যিকির এবং তাসবীহ বলে দেন যে, সকাল বেলা এই তাসবীহ এবং সন্ধ্যা বেলা এই তাসবীহ পাঠ করবে। কিন্তু কিছু তাসবীহ এমন আছে, যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। ঐ সমস্ত তাসবীহ পড়ার জন্যে কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। যেমন প্রতিদিন-

এক. একশ' বার سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

দুই. একশ' বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

তিন. একশ' বার ইস্তিগফার

চার. এবং একশ' বার দরূদ শরীফ- এই চারটি তাসবীহ প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন আদায় করতে পারে। বিধায় যাদের নিয়মিত আমলের মধ্যে এ সমস্ত তাসবীহ অন্তর্ভুক্ত নেই, তারা এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

যাইহোক! এই 'আনফাসে ঈসা' কিতাবে হযরত থানভী রহ. যিকির সম্পর্কিত কিছু মালফূয উল্লেখ করেছেন। এ জন্যে মনে হলো, এই রমাযানে যিকির সম্পর্কিত মালফূয পড়ে তার কিছু ব্যাখ্যা পেশ করি।

যিকিরের কষ্ট স্বতন্ত্র উপকারী

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.-এর নিকট পত্রযোগে তার অবস্থা লিখে জানালো যে-

'যিকির করতে গেলে মনের উপর বিরাট বোঝা অনুভূত হয়। যখন যিকির করতে বসি মন ঘাবড়ে যায়।'

উত্তরে হযরত থানভী রহ. লিখলেন-

'বোঝা' একটি কষ্ট। কষ্ট করতে মন না চাইলে বুঝে নাও, যিকিরে মন বসলে যে পরিমাণ উপকার হয়, এ কষ্ট তার চেয়ে কম উপকারী নয়। যেভাবে হোক, যথাসাধ্য যিকির পুরা করবে। ধীরে ধীরে সব কষ্টই সহজ হয়ে যাবে।'[১]

যখন মানুষ যিকির করতে আরম্ভ করে, তখন প্রথম পর্যায়ে তার মন খুব পেরেশান হয়। যিকির করতে কষ্ট মনে হয়। মন বিচলিত হয়। তখন কিছু মানুষ সাহস হারিয়ে ফেলে এবং যিকির করা ছেড়ে দেয়। এমন লোক বঞ্চিত হয়ে যায়।

জোরপূর্বক যিকিরে লেগে থাকুন!

যিকিরের নিয়ম এই যে, যখন যিকির করতে বসবে, তখন মন লাগুক বা না লাগুক, মন চাক বা না চাক, মন বিচলিত হোক কি ভীত হোক, যিকিরে লেগে থাকবে। মনকে বলবে, তুমি ঘাবড়াও আর পেরেশান হও, আমাকে তো এ কাজ করতেই হবে। আমাদের শায়খ হযরত আরেফী রহ. বলতেন যে, নিজের মনকে বলে দাও-

آرزئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

'সমস্ত কামনা ধূলিস্মাৎ হোক, সমস্ত আক্ষেপ নস্যাৎ হোক,
এখন তো আমার অন্তরকে তোমার যোগ্য বানাতেই হবে।'

একবার নিজের মনকে এ কথা বলে দাও যে, তুমি এর থেকে পালাও আর বিচলিত হও, আমি তার পরোয়া করবো না। আমি তো এ কাজ করেই যাবো। কেউ এ সংকল্প করলে, তারপর ইনশাআল্লাহ কয়েক দিনের মধ্যে এ ভীতি ও পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এই ভয়ে

---

১. আনফাসে ঈসাঃ ৬৩

পলায়ন করে এবং যিকির করা ছেড়ে দেয়, তখন পুনরায় যিকিরের দিকে ফিরে আসা মুশকিল হয়ে যায়।

মন বিচলিত হওয়ার কোনো চিকিৎসা নেই

লোকে জিজ্ঞাসা করে যে, হযরত এর কোনো চিকিৎসা বলে দিন, যেন যিকির করতে মন বিচলিত না হয় এবং যিকিরের মধ্যে মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন, এর কোনো চিকিৎসা নেই। এমন কোনো বড়ি, পাউডার বা সিরাপ নেই যে, তা খেলে যিকিরের মধ্যে মন বসবে। এর চিকিৎসা এটাই যে, মন বসুক বা না বসুক নিজের ইচ্ছা শক্তি ব্যবহার করে যিকিরে লেগে থাকতে হবে। লক্ষ্য করুন! এ মালফূযে হযরত থানভী রহ. যিকিরে মন না বসার ব্যাপারে এবং যিকির বোঝা মনে হওয়ার বিষয়ে কী উত্তর দিয়েছেন।

এ কষ্ট ও বোঝা ফায়দাহীন নয়

তিনি বলেছেন যে, এ 'বোঝা' একটি কষ্ট। অর্থাৎ যিকির করতে মনের মধ্যে যে বোঝা ও চাপ অনুভূত হয়, তা একটি কষ্ট। কষ্টের কাজে যদি মন না বসে তাহলে বুঝে নাও যে, এ কষ্টও যিকিরে মন বসার চেয়ে কম উপকারী নয়। অর্থাৎ যিকির করতে যদি কষ্ট হয় এবং তাতে মন না বসে তাহলে এমতাবস্থায় এ কথা চিন্তা করবে যে, যিকির করতে যে কষ্ট হচ্ছে এ কষ্টও ফায়দা দেয়ার ক্ষেত্রে মন লাগার চেয়ে কম উপকারী নয়। যিকিরের মধ্যে যদি মন বসতো এবং খুব বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে মন লাগিয়ে যিকির করতো, তাতে যে ফায়দা হতো, এ কষ্টের ফায়দাও তার চেয়ে কম নয়।

এমন যিকিরে অধিক 'নূরানিয়াত' লাভ হয়

বরং কোনো কোনো জায়গায় হযরত থানভী রহ. লিখেছেন যে, এই কষ্টপূর্ণ যিকিরের ফায়দা মন লাগিয়ে যিকির করার ফায়দার চেয়েও অধিক হয়ে থাকে। কারণ, যিকিরের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাদ ও মজা পায় এবং যার মন বসে, তার যিকিরের মধ্যে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে উপভোগের জন্যে যিকির করছে। স্বাদ ও মজার জন্যে যিকির করছে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির যিকির করতে কষ্ট হচ্ছে, যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা ছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। সে উপকার ও সওয়াবের দিক থেকে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে। এ জন্যে কখনোই এরূপ চিন্তা করবেন না যে, কষ্টের সাথে যিকির করায় লাভ কি? আরে! এর মধ্যেও অনেক বড় লাভ রয়েছে। আপনার মন একদিকে, চিন্তা আরেক দিকে, যিকিরের মধ্যে মন বসছে না, এমতাবস্থায়ও যে আপনি যিকির করছেন, এরপরও যে আপনি মনকে জোর করে লাগিয়ে রেখেছেন, এই যিকির আল্লাহ তা'আলার নিকট খুব পছন্দনীয়। কতক সময় স্বাদ ও উপভোগযুক্ত যিকিরের চেয়ে এমন যিকিরের মধ্যে 'নূরানিয়াত' ও 'রূহানিয়াত' অধিক হয়ে থাকে।

'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াতে'র হাকীকত

একবার হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. এই 'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াত' সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি বলেন- ভালো কোনো স্বপ্ন দেখা গেলে, কাশফ হলে, ইবাদত করতে মজা লাগলে মানুষ এটাকে 'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াতে'র দলীল মনে করে। অথচ 'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াতে'র সাথে এসব কিছুর কোনো সম্পর্ক নেই। 'নূরানিয়াত' তো রয়েছে আল্লাহর হুকুম মানার মধ্যে। যেদিন আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিলে, সেদিন 'নুরানিয়াত' হাসিল হলো। সারা জীবনেও নামাযের মধ্যে মজা লাগে না, তারপরও সে নামায আদায় করছে, তাহলে তার পরিপূর্ণ 'নূরানিয়াত' লাভ হয়েছে।

এ সবের কোনো বাস্তবতা নেই

আমাদের এখানে এক ব্যক্তি আছে, যাকে 'শায়খে তরিকত' বলা হয়। তার মুরীদের সংখ্যাও অসংখ্য বলা হয়। তিনি লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের মুরীদকে মাসজিদুল হারামের মধ্যে নামায পড়াতে পারে না, সে শায়খ হওয়ার যোগ্য নয়।' অর্থাৎ শায়খ মুরীদের সামনে মাসজিদুল হারামকে তুলে ধরবে এবং মুরীদকে তার মধ্যে নামায পড়াবে; যে পীর এমন করতে পারবে না, সে পীর হওয়ার যোগ্য নয়। এ সব কথার কারণে মানুষের মনে এ বিষয়টি বসে গেছে যে, এ সমস্ত

কাশফ ও মুরাকাবার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। মনে রাখবেন! এ সমস্ত জিনিসের বাস্তবভিত্তিক কোনো গুরুত্ব নেই। কেউ যদি এগুলো লাভ করে, তবে তা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। কিন্তু এটি বড় নাজুক নেয়ামত। অনেক সময় এটি একটি পরীক্ষাও হয়ে থাকে। এটি লাভ হওয়ার পর বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। শয়তান অনেক মানুষকে এসব জিনিস দ্বারাই পথভ্রষ্ট করেছে। এ জন্যে কখনই এগুলো অর্জন করার পিছনে পড়বেন না। এগুলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বেশির চেয়ে বেশি এগুলো প্রশংসিত এবং মনের পছন্দনীয় অবস্থা।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সঠিক করুন

আসল জিনিস হলো- আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সঠিক করা। আল্লাহ তা'আলা হারাম শরীফে বসে আছেন, না কি বাইতুল্লাহ শরীফে বসে আছেন? আল্লাহ তা'আলা যেভাবে হারাম শরীফে বিদ্যমান, একইভাবে এখানেও বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার সাথে যে দিন আপনার সম্পর্ক সঠিক হলো, সে দিনই আপনার হারাম শরীফ হাসিল হয়ে গেল।

শেখ সাদী রহ. বলেন-

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

অর্থাৎ, তুমি শবে কদর তালাশ করছো? সব রাত-ই শবে কদর, যদি তুমি তার কদর করতে পারো। যে রাতে তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সঠিক করে নিলে, সে রাতই তোমার জন্যে শবে কদর।

এখানেই তোমার হারাম শরীফ লাভ হবে

এ জন্যে এরূপ মনে করা যে, আমি যদি হারাম শরীফে না গেলাম এবং হারামের মধ্যে নামায না পড়লাম তাহলে আমার কিছুই লাভ হলো না, এ কথা ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা যদি হারাম শরীফে নিয়ে যান, তাহলে এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। আর যদি আপনি সেখানে যেতে না পারেন। কারণ, আইনী জটিলতা আছে বা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা নেই বা সফর করার মতো দৈহিক শক্তি নেই, তাহলে কি এ কারণে আল্লাহ

তা'আলা আপনাকে বঞ্চিত করবেন? আরে! যে আবেগ আপনাকে হারাম শরীফে নিয়ে যাচ্ছে, সে আবেগকে যদি ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে এখানে বসে ব্যবহার করেন, তাহলে এখানেই আপনার হারাম শরীফ হাসিল হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কোনো ঈমানদারকে মাহরূম করেন না।

সর্বাবস্থায় যিকিরে রত থাকুন!

খুব ভালো করে বুঝে নিন, দ্বীনদারীর সঙ্গে এ সমস্ত কাশফ ও কারামতের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এর সাথে সম্পর্কিত নয়। আসল দ্বীনদারী হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে চলা। তাঁর হুকুম তামিলের জন্যেই যিকির করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে। সেই সম্পর্ক সঠিক করতে হবে। যিকির করতে কষ্ট লাগুক, বোঝা মনে হোক, মন না বসুক তারপরও বসে যান এবং আল্লাহর যিকিরে রত হন। এই আনুগত্যের পরিণতিতে দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা কেমন নূর এবং বরকত দান করেন। ধীরে ধীরে এ সমস্ত যিকিরও সহজে পুরা হতে থাকবে এবং যিকিরের আসল ফায়দা অর্থাৎ আল্লাহমুখী হওয়া এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এর তাওফীক দান করুন এবং আপনাদেরকেও দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

কষ্ট হলেও নিয়মিত যিকির করতে থাকবে

গতকাল আমি নিবেদন করেছিলাম যে, মানুষ যখন প্রথম প্রথম যিকির করতে আরম্ভ করে, তখন মনের মধ্যে কষ্ট ও বোঝা অনুভব হয়। এ অবস্থা শুধু যিকিরের ক্ষেত্রে নয়, বরং যে কোনো নতুন কাজ শুরু করলে প্রথম প্রথম কষ্ট অনুভব হয়। একইভাবে প্রথম প্রথম যখন একজন মানুষ নিজেকে নিজে আল্লাহর যিকিরে অভ্যস্ত করতে চায়, তখন অনেক সময় যিকির করতে মন বিচলিত হয় এবং বোঝা অনুভূত হয়।

এর চিকিৎসা হলো, এ কষ্টকে সহ্য করতে হবে এবং এ বোঝাকে বহন করতে হবে। ঘাবড়ে গিয়ে যিকির বন্ধ করা যাবে না। মন বসুক বা না বসুক, মন শান্ত থাক চাই অশান্ত হোক, সর্বাবস্থায় যিকিরে রত থাকতে হবে। এর ফলে ধীরে ধীরে মন বসতে আরম্ভ করবে।

নামায পড়তে প্রথম প্রথম কষ্ট হয়

লক্ষ্য করুন! শিশুকালে যখন মা-বাপ নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তাদের কথায় নামায আরম্ভ করেছিলেন, ঐ সময় কি নামাযের মধ্যে আপনাদের মন বসতো? না, ঐ সময় মন বসতো না। বরং মন ভেগে যেতো। নামায পড়তে মন চাইতো না। মা-বাপ যখন নামায পড়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতেন, তখন মনে হতো, এরা আমার উপর জুলুম করছে। যাইহোক! সে সময় নামায পড়তে কষ্ট হতো, কিন্তু ধীরে ধীরে

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ৫০-৭১

সেই কষ্ট জীবনের অংশে পরিণত হয়ে গেছে। এখন তো এ অবস্থা হয়ে গেছে যে, যদি কেউ বলে, তুমি এক লক্ষ টাকা নাও আর এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দাও, তাহলে এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়তে তৈরি হবে না। এখন নামায পড়া ছাড়া সে শান্তি পায় না।

যিকির জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়

যিকিরের অবস্থাও একই রকম। প্রথম প্রথম যিকির করতে কষ্ট অনুভব হয়। বোঝা মনে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন যিকির নিয়মিত আমলে পরিণত হয় এবং তার অভ্যাস গড়ে ওঠে, তখন এ যিকিরই জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা যিকিরকে জীবনের এমন অংশ বানিয়ে দেন যে, তা ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না।

আল্লাহর যিকির এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ.

হাফেয ইবনে হাজার রহ. একজন মহান মুহাদ্দিস আলেম ছিলেন। জ্ঞান-গরিমায় অনেক উচ্চাসনের অধিকারী ছিলেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র লেখক ছিলেন। তাঁর অবস্থা এই ছিলো যে, 'ফাতহুল বারী' লেখার সময় যখন কলমের মুখ (নিব) ঠিক করার প্রয়োজন পড়তো- সে যুগে কলম হতো কাঠের (বা বাঁশের কঞ্চির)। লিখতে লিখতে যখন তার মাথা নষ্ট হয়ে যেতো, তখন ছুরি দ্বারা তা ঠিক করতে হতো- কিতাব লেখার সময় হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর যখন কলম ঠিক করার প্রয়োজন পড়তো, তখন এ জন্যে যে সময়টুকু ব্যয় হতো, তাও তিনি যিকিরশূন্য কাটানো বরদাশত করতেন না। ঐ সময়টুকুও তিনি আল্লাহর যিকিরে অতিবাহিত করতেন। এ জন্যে যিকির যখন মানুষের জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়, তখন যিকির ছাড়া মানুষ শান্তি পায় না।

যিকিরের একটি পদ্ধতি হলো, জোরে যিকির করা

প্রথম পর্যায়ের যে সব মুরীদের মন আল্লাহর যিকির করতে কষ্ট অনুভব করে, কতক আল্লাহর ওলী তাদের জন্যে যিকিরের বিশেষ কিছু পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, এই এই পদ্ধতিতে যিকির করবে, তাহলে যিকিরের মধ্যে মন বসবে এবং মন বিচলিত হবে না। অন্যথায় আশঙ্কা

রয়েছে যে, ঘাবড়ে গিয়ে যিকির করা ছেড়ে দিবে। ঐ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো, জোরে যিকির করা। কারণ, সে যদি একা একা চুপে চুপে যিকির করে, তাহলে তার মন অস্থির হবে এবং ঘাবড়ে যাবে। এ জন্যে তাকে বলেছেন যে, তুমি একটু উঁচু স্বরে যিকির করবে এবং সামান্য সুর দিয়ে যিকির করবে। এর ফলে যিকিরের মধ্যে মন বসবে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন স্বরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করতে তার মন বসে না, তাহলে সুর দিয়ে এবং উঁচু আওয়াজে যখন যিকির করবে, তখন তার মন বসবে। মোটকথা, মন বসানোর জন্যে আল্লাহওয়ালাগণ এ পদ্ধতি সাব্যস্ত করেছেন যে, উঁচু আওয়াজে এবং সুর দিয়ে যিকির করবে।

যিকিরের একটি পদ্ধতি 'যরব' লাগানো

আল্লাহওয়ালাগণ কাউকে 'যরব'-এর পদ্ধতি শিখিয়েছেন যে, যিকিরের সময় 'যরব' লাগাবে। 'যরব' অর্থ- মারা, আঘাত করা। অর্থাৎ যিকির করার সময় কোনো একটি জায়গায় (অঙ্গে) চাপ সৃষ্টি করবে এবং আঘাত করবে। কার্যতঃ আল্লাহওয়ালাগণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকারী মনে করে 'যরব'-এর অনেকগুলো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি এই যে, যখন আপনি 'লা-ইলাহা' বলবেন, তখন ঘাড় এবং চেহারাকে দিলের কাছে নিয়ে যাবেন, এরপর ঘাড়কে ডান দিকে নিয়ে পিছন দিকে ফেরাবেন এবং সে সময় এ কথা কল্পনা করবেন যে, অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যতো জিনিসের মহব্বত রয়েছে, সেগুলোর মহব্বতকে মন থেকে বের করে পশ্চাতে নিক্ষেপ করছি। তারপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় ঘাড় এবং চেহারাকে পুনরায় দিলের কাছে এনে ধাক্কা মারবেন এবং সে সময় এ কথা কল্পনা করবেন যে, আমি আল্লাহর মহব্বতকে অন্তরে প্রবেশ করাচ্ছি। এ পদ্ধতি আল্লাহওয়ালাগণ এ জন্যে সাব্যস্ত করেছেন যে, যিকিরকারী ব্যক্তি যখন এই 'যরব'-এর মধ্যে মগ্ন হবে, তখন তার মন যিকিরের মধ্যে বসে যাবে। প্রতিদিন এবং বারবার যখন এ কথা কল্পনা করে যিকির করবে এবং এই নিয়মে 'যরব' লাগাবে, তখন ইনশাআল্লাহ এমন এক সময় আসবে, যখন অন্তর থেকে গাইরুল্লাহর মহব্বত বের হয়ে যাবে এবং আল্লাহর মহব্বত প্রবেশ করবে।

'যোগাসনে' উপবেসন করে যিকির করা

মোটকথা! আল্লাহওয়ালা ও পীর-মাশায়েখ যিকির করার যে সমস্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো চিকিৎসা হিসাবে করেছেন। এ সমস্ত পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় এবং প্রমাণিত করার প্রয়োজনও নেই। কতিপয় বুযুর্গ অন্যান্য পদ্ধতিও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, কতক শায়খ বলেছেন, যখন যিকির করতে বসবে, তখন আসন দিয়ে বসবে। তারপর ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলী এবং তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দ্বারা বাম দিকের হাঁটুর ভিতরের রগকে চেপে ধরবে। ঐ রগ চেপে ধরলে মনে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। ফলে মনে অন্যান্য চিন্তা ও সংশয় সৃষ্টি হবে না। এ বিষয়টি অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গেছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা এ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

যিকিরের একটি পদ্ধতি 'পাসে আনফাস'

এমনিভাবে যিকিরের বিশেষ একটি পদ্ধতিকে 'পাসে আনফাস' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্বাসের উঠানামার সময় আল্লাহর যিকিরকে এমনভাবে আকর্ষণ করা হয় যে, প্রত্যেক শ্বাসের সাথে আল্লাহর যিকির যবানে জারি হয়ে যায়। শ্বাস নেওয়ার সময়ও আল্লাহর যিকির হয়, শ্বাস ছাড়ার সময়ও আল্লাহর যিকির হয়। প্রত্যেক শ্বাসের গতির সঙ্গে আল্লাহর নাম বের হতে থাকে। পীর-মাশায়েখ এ পদ্ধতির অনুশীলন করিয়ে থাকেন। যার ফলে এ যোগ্যতা লাভ হয়।

যিকির করার সময় প্রত্যেক জিনিসের যিকির করার কথা কল্পনা করা

এমনিভাবে 'সুলতানুল আযকার'-এর নাম হয়তো আপনারা শুনেছেন। এটিও যিকিরের বিশেষ একটি পদ্ধতি। যার মধ্যে সমস্ত 'লতীফা'র সঙ্গে যিকিরের আওয়াজ বের হয়। এমনিভাবে আল্লাহর ওলীগণ এ পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন যে, যখন যিকির করতে বসবে, তখন এ কথা কল্পনা করবে যে, এই দেয়ালও আমার সঙ্গে যিকির করছে, ছাদও যিকির করছে, দরজাও যিকির করছে, বাতিও যিকির করছে, পাখাও যিকির করছে, জমিনও যিকির করছে, আসমানও যিকির করছে।

সমগ্র বিশ্বজগত যিকির করছে। এ কল্পনার দ্বারা যিকিরের মধ্যে বিশেষ এক ভাব ও আবেগের সৃষ্টি হয়।

হযরত দাউদ আ.-এর সঙ্গে পাহাড় ও পাখির যিকির

কুরআনে কারীমে হযরত দাউদ আ.-এর যিকিরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি যিকির করতেন, তখন পাহাড় এবং পাখিও তাঁর সঙ্গে যিকির করতো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

'আমি হযরত দাউদ আ.-এর সঙ্গে পাহাড় ও সকল পাখিকে নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম। এগুলো তাঁর সঙ্গে যিকির করতো।'[১]

হযরত দাউদ আ. যখন سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ তাসবীহ পাঠ করতেন, তখন পাহাড় এবং পাখিও তাঁর সঙ্গে سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ বলতো।

পাহাড় ও পাখির যিকির দ্বারা হযরত দাউদ আ.-এর উপকার

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. 'মাসায়িলুস সুলূক' কিতাবে লিখেছেন যে, পাহাড় ও পাখির যিকির করাকে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে গণ্য করেছেন, যে সমস্ত নেয়ামত তিনি দাউদ আ.-কে দান করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, পাহাড় ও পাখি যিকির করে থাকলে তার দ্বারা হযরত দাউদ আ.-এর কী লাভ হতো? যার ফলে এসব জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

তারপর তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়ে বলেন যে, এমনিতেই যিকির একটি বড় নেয়ামত। তা যে অবস্থাতেই করা হোক না কেন? এমনকি একাকী করা হলেও। তবে যিকিরকারী ব্যক্তির সঙ্গে যদি একটি দলও যিকিরে রত থাকে, তাহলে তাঁর যিকিরের মধ্যে ভাব ও আবেগ সৃষ্টি হয়। যার ফলে যিকিরের মধ্যে খুব মন বসে। এ কারণে পাহাড় ও পাখিকে বশীভূত করে তাদেরকেও, হযরত দাউদ আ.-এর সঙ্গে যিকির করার

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭৯

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে হযরত দাউদ আ.-কে এই নেয়ামত দেয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা তাঁর যিকিরের মধ্যে ভাবের সৃষ্টি হবে। আল্লাহর ওলীগণ হযরত দাউদ আ.-এর এ ঘটনা থেকে যিকিরের একটি পদ্ধতি এই বের করেছেন যে, যখন তোমরা যিকির করবে, তখন এ কথা কল্পনা করবে যে, দরজা, দেয়াল, পাহাড়, পাখি ও গাছপালাও আমার সঙ্গে যিকির করছে। এই কল্পনার অনুশীলন করবে। অধিক অনুশীলনের পর এরূপ অনুভূত হতে থাকবে যে, বাস্তবিকই এসব জিনিস আমার সঙ্গে যিকির করছে। এর ফলে নিজের মন যিকিরের দিকে ধাবিত হবে।

যিকিরের এসব পন্থা চিকিৎসা স্বরূপ

যাইহোক! আল্লাহর ওলীগণ যিকিরের যে সমস্ত পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, সেগুলো দ্বারা তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো যিকিরের মধ্যে মানুষের মন বসানো। তাঁরা এ সমস্ত পদ্ধতি চিকিৎসা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে মনে রাখতে হবে যে, এই বিশেষ পদ্ধতিসমূহ উদ্দেশ্যও নয়, সুন্নাতও নয়। এ সমস্ত পদ্ধতিকে সুন্নাত মনে করা জায়েযও নয়। যেমন, আমাদের মাশায়েখের নিকট 'বারো তাসবীহ' খুব প্রসিদ্ধ। এ বারো তাসবীহ 'যরব'-এর সাথে আদায় করা হয়, কিন্তু এই বিশেষ পদ্ধতি উদ্দেশ্যও নয় এবং সুন্নাতও নয়। কোনো ব্যক্তি যদি এ পদ্ধতিকে সুন্নাত মনে করে, তাহলে বিদআত হয়ে যাবে। বরং এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, এর সম্পর্কে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ পদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদদেরকে চিকিৎসা হিসাবে দেয়া হয়, যেন যিকিরের মধ্যে তার মন বসে এবং একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

'যরব' লাগিয়ে যিকির করার উপর আপত্তি

বর্তমান যুগে মানুষ অতিরঞ্জন ও অতি শিথিলতার শিকার। ফলে কতক মানুষ 'যরব' লাগিয়ে যিকির করাকে বিদআত বলে। তারা বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ কথা কোথাও প্রমাণিত নেই যে, তিনি কখনো এভাবে যিকির করেছেন এবং কোনো সাহাবী থেকেও 'যরব' লাগিয়ে যিকির করা প্রমাণিত নয়। এভাবে যিকির করা যেহেতু প্রমাণিত নয়, অথচ তোমরা এরূপভাবে যিকির করছো, বিধায় এটা বিদআত।

তাহলে 'জোশান্দাহ' পান করাও বিদআত

এক ব্যক্তি আমাকে বলে যে, আপনাদের সমস্ত শায়খ বিদআতী (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, এঁরা 'যরব' লাগিয়ে যিকির করা শিক্ষা দেন। অথচ এভাবে যিকির করা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সর্দি-কাশি হলে আপনি জোশান্দাহ (জোশান্দাহ- ইউনানী হাকীমের তৈরী এক ধরনের সিরাপ, যা সর্দি-কাশি নিবারণের জন্যে সেবন করা হয়।) পান করেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পান করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জোশান্দাহ পান করা প্রমাণিত আছে? তিনি কি কখনো জোশান্দাহ পান করেছেন? বা কোনো সাহাবী থেকে জোশান্দাহ পান করা প্রমাণিত আছে? তিনি বললেন- জোশান্দাহ পান করাতো প্রমাণিত নেই। আমি বললাম, যখন প্রমাণিত নেই, তখন আপনার জোশান্দাহ পান করা বিদআত। কারণ, আপনার দাবি প্রমাণিত করার জন্যে বলতে হবে যে, যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় তা বিদআত। আর যেহেতু জোশান্দাহ পান করা প্রমাণিত নয়, সুতরাং এটাও বিদআত।

আসলে সঠিক কথা এই যে, যিকির করার এ সমস্ত পদ্ধতি চিকিৎসা স্বরূপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তির যিকিরের মধ্যে মন বসে না এবং যিকিরের দিকে মন ধাবিত হয় না, তাকে চিকিৎসা স্বরূপ এ পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে যে, তুমি এই পদ্ধতিতে যিকির করবে, যেন যিকিরের মধ্যে তোমার মন বসে। এটা জোশান্দাহ পান করানোর মতো।

এ সমস্ত পদ্ধতি বিদআত হয়ে যাবে

হ্যাঁ! কোনো ব্যক্তি যদি যিকিরের বিশেষ কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে বলে যে, এটা সুন্নাত বা এটা মুস্তাহাব বা এ পদ্ধতি অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ, শ্রেষ্ঠ হওয়া, মুস্তাহাব হওয়া এবং সুন্নাত হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় তা সুন্নাত হতে পারে না, তা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। তবে উপকারী হতে পারে।

সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি একমাত্র শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, তা উপকারী হতে পারে এবং অধিকতর উপকারীও হতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। আমাদের মুরুব্বীগণ অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্য থেকে সব সময় দূরে থেকেছেন। এ কারণে যিকিরের এ সমস্ত বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা এ কথা বলেননি যে, এগুলো বিদআত, এগুলো তোমরা গ্রহণ করো না এবং এ কথাও বলেননি যে, এগুলো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

আস্তে যিকির করা উত্তম

মনে রাখবেন, সব সময়, সর্বাবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত যিকিরের উত্তম তরীকা হলো, আস্তে (নিম্নস্বরে) যিকির করা। এ বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। যিকির যতো আস্তে আওয়াজে হবে ততোই উত্তম। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً

'তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক।'[1]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

'তোমার রবকে মনে মনে ডাকো, বিনয়ের সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উঁচু আওয়াজের তুলনায় নিচু আওয়াজে।'[2]

এর দ্বারা জানা গেল যে, অধিক জোরে যিকির করা পছন্দনীয় নয়, বরং নিম্ন আওয়াজে যিকির করাই পছন্দনীয়।

সশব্দে যিকির করা জায়েয, তবে উত্তম নয়

এ মূলনীতি সব সময়ের, চিরদিনের এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে যে, আস্তে যিকির করাই উত্তম। যিকির যতো আস্তে করা হবে, ততো বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে উঁচু স্বরে যিকির করা

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত ৫৫
২. সূরা আ'রাফ, আয়াত ২০৫

জায়েয, নাজায়েয নয়। বিধায় সশব্দের যিকির আস্তে যিকিরের চেয়ে উত্তম হতে পারে না। তবে চিকিৎসা হিসাবে জোরে যিকির করায় দোষ নেই। তবে কোনো ব্যক্তি যদি জোরে যিকির করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, বা উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, বা সুন্নাত মনে করে, বা জোরে যিকির না করলে আপত্তি করে, তখন এটাই বিদআত হয়ে যায়। এরই নাম বিদআত। এ পথে অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ জন্যে আমাদের এই শেষ যুগের বুযুর্গগণ জোরে যিকির করার প্রতি বেশি উদ্বুদ্ধ করেন না। বরং আস্তে যিকির করারই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এটি ধর্মের মধ্যে নতুন সংযোজন এবং বিদআত

আসল কথা হলো, কাজ যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন তা সীমার মধ্যে থাকে না। যিকিরের উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ আল্লাহওয়ালাগণ চিকিৎসা হিসাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এ পদ্ধতিগুলোই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে গেছে। এখন প্রত্যেক সিলসিলার লোকেরা নিজেদের জন্যে একেকটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়েছে। অমুক সিলসিলায় 'পাসে আনফাস' তরীকায় যিকির হয়। অমুক সিলসিলায় 'সুলতানুল আযকার' হয়। অমুক সিলসিলায় অমুক পদ্ধতিতে যিকির হয়। এগুলো ঐ সিলসিলাসমূহের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। এখন এই সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা বাইরের লোকদেরকে এ কথা বিশ্বাস করাতে চায় যে, আপনি যে পদ্ধতিতে যিকির করেন, ঐ পদ্ধতি সঠিক নয় বা উত্তম নয়। সঠিক বা উত্তম পদ্ধতি ঐটা, যা আমাদের পীর শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে যে জিনিস উদ্দেশ্য ছিলো না, তা উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। এরই নাম ধর্মের মধ্যে নতুন সংযোজন। এরই নাম বিদআত। এর শিকড় কাটতে হবে।

যিকিরের মধ্যে 'যরব' লাগানো উদ্দেশ্য নয়

'সুতরাং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন যে-

'বিশেষ পদ্ধতিতে 'যরব' লাগানো উদ্দেশ্য নয় এবং উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া তার উপর নির্ভরশীলও নয়। অকৃত্রিমভাবে যতোটুকু হয়, তাই যথেষ্ট।'[১]

---

১. আনফাসে ঈসা, পৃ. ৬৩

'যরব' লাগিয়ে যিকির করার যে পদ্ধতি রয়েছে, এটি মূল লক্ষ্য নয় এবং যিকিরের মূল উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া এর উপর নির্ভরশীলও নয় যে, এটা ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। বরং 'যরব' ছাড়াও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে। আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর যিকির করা এবং তাঁর নাম নেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন? 'যরব' সহ হোক, বা 'যরব' ছাড়া হোক। এ জন্যেই এ সমস্ত শর্তের পিছনে পড়ার বেশি প্রয়োজন নেই।

আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নাম নেয়া

এক ব্যক্তি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ.-এর নিকট এসে বলে যে, হযরত তাসবীহ তো পড়ি, কিন্তু বারো তাসবীহ হয়ে উঠে না। সে ব্যক্তি ঐ বিশেষ পদ্ধতিতে পড়ার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পেতো না। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পদ্ধতি উদ্দেশ্য, নাকি যিকির'? সে উত্তর দিলো, 'হযরত আসল উদ্দেশ্য তো হলো যিকির, পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়।' হযরত বললেন, 'তুমি বিশেষ পদ্ধতি ছাড়াই বারো তাসবীহ পড়ো।' তারপর বললেন, 'কতক সময় আমি বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া বারো তাসবীহ পড়ে থাকি। যা ধীর-স্থিরভাবে পনের মিনিটে আদায় হয়ে যায়। বিশেষ পদ্ধতিতে 'যরব' লাগিয়ে পড়তে গেলে চল্লিশ মিনিটের প্রয়োজন পড়ে। যাই হোক, 'যরব' লাগিয়ে যিকির করা উদ্দেশ্যও নয়, সুন্নাতও নয়। সময়-সুযোগ হলে সেভাবে পড়ো। তা না হলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে, যেভাবে সম্ভব যিকির করো। আল্লাহর নাম নেও। আসল উদ্দেশ্য তো হলো, আল্লাহর নাম নেয়া।

একদল লোক এসব পদ্ধতিকে বিদআত বলে

এ বিষয়টি এ জন্যে বিস্তারিত আলোচনা করলাম যে, আমাদের যুগে এ ব্যাপারে অতিরঞ্জন চলছে। একদল লোক তো এ সমস্ত পদ্ধতিকে সরাসরি বিদআত বলে। তারা বলে যে, তাসাওউফও বিদআত, এ সমস্ত খানকাহও বিদআত, চিল্লা লাগানোও বিদআত এবং যিকির করার এ বিশেষ পদ্ধতিসমূহও বিদআত।

আরেকটি প্রান্তিকতা

অপরদিকে একদল লোক এরূপ তৈরি হয়েছে যে, তারা যিকিরের এই বিশেষ পদ্ধতিসমূহকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। এ সমস্ত জাহেল

পীরেরা নিজেদের খানকাহও খুলে বসেছে। তারা বলে, যে ব্যক্তি 'পাসে আনফাস' তরীকায় যিকির করেনি, সে তাসাওউফের অক্ষর জ্ঞানও অর্জন করেনি। যেন 'পাসে আনফাস'ই মূল লক্ষ্য। এটি আরেকটি প্রান্তিকতা।

আমাদের মুরুব্বী ও বুযুর্গগণ তো আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমাদেরকে মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সে পথে পরিচালিত করেছেন। এ মধ্যপন্থায় না অতিরঞ্জন আছে, না অতিশৈথিল্য আছে। তারা বলেছেন, এ পদ্ধতি জায়েয, কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়। এর উপর আমল করো।

'ফিকিরে'র সাথে প্রীতি লাভ হওয়া যিকিরেরই বরকত

এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর নিকট নিজের অবস্থা লেখেন যে-

'মন চায় যিকির ছেড়ে দেই এবং বসে বসে চিন্তা করতে থাকি। যিকিরের মধ্যে মন কম বসে।'

হযরত থানভী রহ. উত্তরে লিখেন-

'তুমি যে লিখেছো, যিকির ছেড়ে দিয়ে বসে চিন্তা করতে মন চায়। এটা যিকিরেরই বরকত যে, 'ফিকিরে'র সাথে 'উন্‌স' তথা প্রীতি সৃষ্টি হয়েছে। যিকির কখনোই ছাড়বে না। অন্যথায় ভিত্তি অস্তিত্বহীন হওয়ার ফলে তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভবনও বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। মন লাগুক বা না-লাগুক আমলের উপর অবিচল থাকবে।'[১]

'ফিকির' যিকিরের ফল

যিকিরেরই একটি ফল 'ফিকির'। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'ঐ সমস্ত লোক, যারা দাঁড়ানো, বসা ও পার্শ্বের উপর শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির বিষয়ে ফিকির করে।'[২]

১. আনফাসে ঈসাঃ ৬৩
২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১

এ আয়াতের মধ্যে নেক লোকদের একটি গুণ 'যিকির' এবং আরেকটি গুণ 'ফিকির' বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিকিরের সাথে সাথে ফিকিরও থাকতে হবে। যিকিরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হতে হবে 'ফিকির'। অর্থাৎ অধিক যিকিরের ফলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার কুদরত, আজমত ও মহব্বতের চিন্তায় হারিয়ে যায়। এরই নাম ফিকির। এই ফিকির, যিকিরের ফল ও পরিণতি।

হযরত থানভী রহ. বলেন, তোমার যে যিকির ছেড়ে দিয়ে বসে বসে চিন্তা করার ইচ্ছা জাগছে, এটাও মূলত যিকিরেরই বরকত। আল্লাহ তা'আলার কুদরত, আজমত ও মহব্বতের চিন্তা অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে, তা যিকিরেরই ফল। যেহেতু এটা যিকিরের বরকতে হয়েছে, তাই যিকিরকে কখনোই ছাড়বে না। অন্যথায় ভিত্তি অস্তিত্বহীন হওয়ার ফলে তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভবনও বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে।

যিকির ছাড়বে না

অন্তরে চিন্তা আসছে যে, দিন-রাত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার কুদরত, আজমত ও মহব্বতের চিন্তা করতে থাকি এবং আমার অবস্থা এই হোক যে-

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے

'মন অবসর দিবস-রজনী অন্বেষণ করছে,
যখন সব সময় প্রিয়জনের কল্পনায় বিভোর থাকবো।'

এ অবস্থা খুব ভালো। কিন্তু এ অবস্থা যিকিরের বরকতেই লাভ হয়েছে। তাই এখন যদি তুমি যিকির ছেড়ে দাও, তাহলে ফিকিরের এ অবস্থাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ জন্যে এরূপ চিন্তা করবে না যে, আমি যেহেতু ফিকিরের অবস্থানে পৌছে গেছি, তাই এখন আর যিকিরের প্রয়োজন নেই।

অন্তরের যিকির সত্ত্বেও মুখের যিকির ছাড়বে না

বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায় যে, 'যিকির' দ্বারা উদ্দেশ্য মুখের যিকির এবং 'ফিকির' দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরের যিকির। মানুষ যখন আল্লাহর

বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের চিন্তায় আত্মহারা হয়ে যায়, তারই নাম হয় অন্তরের যিকির। যেন সে অন্তর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করছে। কতক লোক ধোঁকায় পড়ে যায় যে, মুখের যিকির করতে করতে যখন অন্তরে আল্লাহর চিন্তা বসে গেছে। আল্লাহ তা'আলার কুদরত, আজমত ও মহব্বতের চিন্তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। তাই এখন উদ্দেশ্য হাসিল করার মাধ্যম ও উপকরণ অর্থাৎ মুখের যিকিরের আর প্রয়োজন নেই। তাই তারা মুখের যিকির ছেড়ে দেয়। মনে রাখবেন! এটা শয়তানের ধোঁকা। কারণ, যখন মুখের যিকির ছেড়ে দিয়েছে, তখন ধীরে ধীরে অন্তরের যিকিরও হাতছাড়া হয়ে যাবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত থানভী রহ. বলেছেন, ভিত্তি ভেঙ্গে পড়লে তার উপর গড়ে ওঠা ভবনও ভেঙ্গে পড়বে।

জাহেল পীরদের এ চিন্তা গোমরাহী

সুতরাং জাহেল পীরদের একটি দল বলে যে, আমরা তো এখন দরবেশ ও ফকীর হয়ে গেছি। এখন তো আমরা সব সময় আল্লাহর স্মরণে আত্মহারা হয়ে থাকি। তাই এখন আমাদের না নামাযের জরুরত রয়েছে, না রোযার। না তিলাওয়াতের জরুরত রয়েছে, না যিকিরের। কারণ, নামাযের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছা। এখন যখন আমাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যিকির এবং তাঁর চিন্তা বসে গেছে। তাই এখন আর আমাদের নামাযের প্রয়োজন নেই। এখন আমরা মসজিদে যাই বা না যাই, নামায পড়ি বা না পড়ি, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মনে রাখবেন, এটা গোমরাহী। গোমরাহী এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা অন্তরের যিকিরকে এই পর্যায়ের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে যে, বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগীকে বেকার মনে করতে আরম্ভ করেছে। এটাই মূল গোমরাহী।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

আমার শায়খ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. থেকে হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর এ ঘটনা অনেকবার শুনেছি। তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর নিকট এ ঘটনা

শুনেছেন। ঘটনাটি এই যে- একবার শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় কক্ষের মধ্যে এক বিশাল নূর উদ্ভাসিত হলো। সেই নূর হযরতকে, তাঁর আশেপাশের সমস্ত জিনিসকে এবং পুরা কামরাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ঐ নূরের মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো- হে আবদুল কাদের! তুমি আমার সঙ্গে এমন উঁচু স্তরের সম্পর্ক গড়েছো যে, এখন তোমার দায়িত্বে নামাযও ফরয নেই, রোযাও ফরয নেই। এখন তুমি যা ইচ্ছা করো। তুমি আমার নৈকট্য লাভ করেছো। উত্তরে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বললেন- মরদূদ! দূর হ। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈকট্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছা সত্ত্বেও তাঁর নামায মাফ হয়নি, আমার নামায কি করে মাফ হতে পারে! আমি বুঝতে পেরেছি, তুই শয়তান। আমাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছিস। এ কথা বলতেই সে নূর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর আরেকটি নূর আত্মপ্রকাশ করলো। তার মধ্য থেকে আওয়াজ এলো। হে আবদুল কাদের! আজ তোমাকে তোমার ইলম রক্ষা করেছে। অন্যথায় এটি এমন একটি ফাঁদ, যার মাধ্যমে আমি বড় বড় দরবেশকে পরাজিত করেছি এবং তাদেরকে গোমরাহ করেছি। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বললেন- মরদূদ! দূর হ। আমাকে আমার ইলম রক্ষা করেনি, বরং আমাকে আমার আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আমাকে আবার ধোঁকা দিচ্ছিস। এই দ্বিতীয় ফাঁদটি ছিলো প্রথম ফাঁদের তুলনায় অধিক বিপজ্জনক ও সূক্ষ্ম। কারণ, এর মাধ্যমে তাঁকে ইলমের অহংকারে লিপ্ত করা উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু তিনি এ ফাঁদ থেকে বেঁচে যান। তিনি বলেন যে, আল্লাহর দয়া আমাকে রক্ষা করেছে।

মুখের যিকিরকে অব্যাহত রাখতে হবে

মোটকথা! এ ধরনের কথা বলা যে, অন্তরের যিকির আমাদের মন-মগজে গেঁথে গেছে, বিধায় এখন আর মুখের যিকিরের প্রয়োজন নেই। এখন আর আমার নামাযের প্রয়োজন নেই, এসব গোমরাহী। এ জন্যে হযরত থানভী রহ. বলেছেন, 'এটা তো খুব ভালো কথা যে, সব সময় আল্লাহর ফিকির অন্তরে বিরাজ করছে, আল্লাহর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকছে, যাকে আল্লাহর ওলীগণ 'তা'আল্লুক মাআল্লাহ', 'নিসবাত' এবং

'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' বলে থাকেন। কিন্তু এসব জিনিস মৌখিক যিকিরের মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে। এ জন্যে এখন মৌখিক যিকির ছেড়ে দিবে না। বরং মৌখিক যিকির কখনোই ছাড়বে না। অন্যথায় ভিত্তি ভেঙ্গে পড়লে তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভবনও ভেঙ্গে পড়বে। মন বসুক বা না বসুক, জোর করে বসে আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। নিয়মিত আমল করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

যিকিরের কতিপয় আদব*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

ওযু সহকারে যিকির করা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন-

'ওযুসহ যিকির করায় অবশ্যই বেশি বরকত হয়, তবে ওযু রাখা জরুরী নয়। কারণ, কারো যদি ওযু না থাকে এবং বারবার ওযু করায় কষ্ট হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে। তবে এ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া ও কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই।'[১]

এ মালফূযে হযরত থানভী রহ. কয়েকটি কথা বলেছেন। প্রথম কথা এই যে, মাসআলা হলো বিনা ওযুতে যিকির করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা যিকিরের জন্যে কোনো প্রকারের শর্ত আরোপ করেননি। তিনি যিকিরকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, মানুষ যখন যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নাম নিতে চায়, অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তো মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়ার অনুমতিই হওয়ার কথা ছিলো না। ওযু করা তো দূরের কথা, মুখকে মেশক-আম্বর দ্বারা ধুলেও অনুমতি হওয়ার কথা নয়।

ہزار بار بشویم دہن ز مشک وگلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

'মুখকে মেশক ও গোলাপ দ্বারা যদি
হাজার বারও ধৌত করি, তারপরও
আপনার নাম নেয়া হবে চরম ধৃষ্টতা।'

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ডঃ ৩, পৃ. ১১৬-১৩০

১. আনফাসে ঈসাঃ ৬৪

আসল কথা তো এটাই। কিন্তু তাঁর দয়া যে, নাম নেয়ার শুধু অনুমতিই তিনি দেননি, বরং এর জন্যে কোনো শর্তও আরোপ করেননি। না মসজিদে আসা শর্ত, না জায়নামাযে বসা শর্ত, না ওযু করা জরুরী, না গোসল করা জরুরী। এমনকি মানুষ যদি নাপাক অবস্থায় থাকে, বা কোনো মহিলা যদি হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকে, তাহলে নামায পড়া ও কুরআন তিলাওয়াত করার অনুমতি যদিও তার নেই, কিন্তু এ অবস্থায়ও যিকির করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং বিছানায় শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করে।'[১]

তোমরা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, যে অবস্থায়ই থাকো না কেন, আমাকে ডাকো। এত সহজ করে দিয়েছেন! এ জন্যে যিকির করার জন্যে ওযু করা শর্ত নয়। তবে মহব্বতের দাবি তো হলো, মানুষ যখন সেই মহান সত্তার যিকির করবে, তখন ওযু সহকারে করবে। কারণ, ওযুসহ যিকির করলে বরকত বেশি হবে। এতে নূর বেশি হবে। এর ফায়দা বেশি হবে। এ জন্যে যথাসম্ভব ওযু করে যিকির করবে।

যিকিরের জন্যে তায়াম্মুমও করতে পারবে

তবে যদি কোনো ওযর থাকে, যার কারণে ওযু থাকছে না। এমন ব্যক্তির জন্যে হযরত থানভী রহ. বলছেন যে, ওযু থাকে না বিধায় যিকির ছেড়ে দিবে না, বরং যিকির করতে থাকবে। তবে যেহেতু ওযু সহকারে যিকির করায় নূর ও বরকত বেশি, এ জন্যে ওযু ভেঙ্গে গেলে আবার ওযু করবে। আবার ভাঙ্গলে আবারো ওযু করবে। আর যদি বারবার ওযু করতে কষ্ট হয়, তাহলে যিকির করার জন্যে তায়াম্মুম করবে। তবে এমন তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া এবং কুরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয হবে না।

---

১. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯১

কোন্ কোন্ আমলের জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয

একটি বিষয় ভালো করে বুঝতে হবে, তা হলো, যে সব আমল বিনা ওযুতে করা জায়েয, তবে আদবের প্রতি খেয়াল করে অযুসহ করা হয়, কোনো কারণবশত যদি অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে সেগুলো করা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তা যথেষ্ট হবে। যেমন, কুরআন শরীফ ছাড়া অন্যান্য কিতাব বিনা ওযুতে পাঠ করা এবং স্পর্শ করা মৌলিকভাবে জায়েয, তবে অযুসহ পাঠ করা আদবের দাবি। সময়-সুযোগ না থাকলে তায়াম্মুম করে নিবে। এমতাবস্থায় এ তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। এ ধরনের তায়াম্মুম দ্বারা নামায হবে না। একই অবস্থা যিকিরের ক্ষেত্রেও। যদি বারবার ওযু ভেঙ্গে যায় এবং ওযু করতে কষ্ট হয়- তাহলে তায়াম্মুম করবে। বারবার তায়াম্মুম করায় কষ্ট নেই। তবে ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয হবে না।

নামায থেকে পালানোর চিকিৎসা

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.-কে লিখেছে–

'নামায পড়া থেকে মন খুব পালিয়ে থাকে।' অর্থাৎ নামায পড়তে মন চায় না।

উত্তরে হযরত থানভী রহ. লিখেন-

'এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে মনের পালানোর উপর আমল করবে না। মনের বিরোধিতা করে গুরুত্ব সহকারে নামায পড়বে। কিছু নফল পড়ারও নিয়ম বানিয়ে নিবে। যতোটুকু পড়লে কোনো জরুরী কাজের ক্ষতি হবে না।'[১]

অর্থাৎ, মন পালাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই। মনের কাজই তো হলো সব ভালো কাজ থেকে পালানো এবং খারাপ কাজের দিকে মানুষকে ধাবিত করা। এ জন্যে এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে মন পালাতে চাইলেও সে অনুপাতে কাজ করবে না। বরং নফসের বিরোধিতা করে গুরুত্ব সহকারে নামায পড়বে। মন বসা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবে না।

---

১. আনফাসে ঈসাঃ ৬৪

যিকির করার সময় আল্লাহ তা'আলার কথা কল্পনা করবে

এক মালফূযে হযরত থানভী রহ. বলেন-

'তাসবীহ পাঠের সময় উত্তম হলো, আল্লাহ তা'আলার কথা কল্পনা করা। তবে যদি এ কল্পনা মনে না বসে, তাহলে এ কথা কল্পনা করে যিকির করবে যে, তা অন্তর থেকে বের হয়ে আসছে।'[১]

এ মালফূযে হযরত থানভী রহ. যিকিরের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ যখন যিকির করবে, তখন আসল নিয়ম হলো, আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তার কথা কল্পনা করবে। যেমন হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, কিন্তু তিনি তো তোমাকে দেখছেন।'[২]

অর্থাৎ, এমনভাবে যিকির করবে, যেন সে আল্লাহ তা'আলাকে দেখছে। আর যদি এ কল্পনা না আসে, তাহলে কমপক্ষে একথা চিন্তা করবে যে, যে মহান সত্তার যিকির আমি করছি, তিনি আমাকে দেখছেন।

আসল কথা হলো, যাঁর যিকির করা হচ্ছে, সেই আল্লাহ তা'আলার কথা কল্পনা করবে। 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' বলার সময় মন আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকবে। 'সুবহানাল্লাহ' বলার সময় মনোযোগ আল্লাহর দিকে থাকবে। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার সময় আল্লাহর নেয়ামতের কথা কল্পনা করবে।

প্রথম পর্যায়ে যিকিরের শব্দের কল্পনাও করতে পারে

কিন্তু আমাদের মতো প্রথম পর্যায়ের লোকদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কথা কল্পনা করা প্রথম প্রথম কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার কল্পনা কি করে বসবে, কারণ সেই সত্তা তো অসীম ও

---

১. আনফাসে ঈসাঃ ৬৪

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩৫, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯০৪, সুনানি আবী দাউদ, হাদীস নং ৪০৭৫

অকল্পনীয়। তিনি তো কল্পনার মধ্যে আসতেই পারেন না। এমন কি প্রথম প্রথম যিকির করার সময় আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত, তাঁর কুদরত এবং তাঁর আজমতের কল্পনাও অন্তরে জমে বসে না। এজন্যে হযরত থানভী রহ. বলছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের জন্য যিকিরের কল্পনাই করা উচিত। অর্থাৎ যেসব শব্দ মুখ দ্বারা উচ্চারণ করছে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। উদাহরণস্বরূপ যখন সে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' মুখ দ্বারা বের করছে, তখন যেন তার জানা থাকে যে, আমি এসব শব্দ মুখ দ্বারা উচ্চারণ করছি। প্রথম দিকে যখন সে যিকিরের শব্দসমূহের কথা চিন্তা করবে, তখন ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যায়ে ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলার কল্পনাও অন্তরে বসে যাবে।

যিকিরের সময় অন্যান্য কল্পনা

কোনো কোনো বুযুর্গ কতক যিকিরের সাথে সাথে বিভিন্ন কল্পনা করতেন। যেমন, বারো তাসবীহের বিষয়ে বুযুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ইল্লাল্লাহ'-এর চার তাসবীহ এমনভাবে পড়বে যে,

প্রথম তাসবীহতে لَا مَعْبُوْدَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই),

দ্বিতীয় তাসবীহতে لَا مَحْبُوْبَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রিয়জন নেই),

তৃতীয় তাসবীহতে لَا مَقْصُوْدَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য নেই)

এবং চতুর্থ তাসবীহতে لَا مَوْجُوْدَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই) কল্পনা করবে।

তবে আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, এ সব কল্পনা কেউ করলে করুক, তবে এগুলোর প্রতি অধিক যত্ন নেয়ার দরকার নেই। এসব কল্পনা ছাড়া তাসবীহ পাঠ করলেও যথেষ্ট হবে। আসল উদ্দেশ্য হলো, একটু মনোযোগসহ যিকির করা। এতে ধীরে ধীরে লক্ষ্য অর্জন হবে, ইনশাআল্লাহ।

যিকিরের মধ্যে স্বাদ না লাগা অধিক উপকারী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন-

'যিকিরের মধ্যে স্বাদ ও ভাব লাভ হওয়া একটি নেয়ামত, আর লাভ না হওয়া আরেকটি নেয়ামত। এ নেয়ামতের নাম 'মুজাহাদা'। এ দ্বিতীয় নেয়ামতটি অধিক উপকারী। যদিও অধিক সুস্বাদু নয়।'[১]

অর্থাৎ, যিকিরের মধ্যে যদি কারো স্বাদ উপভোগ হয়, তাহলে তা নেয়ামত। যদিও তা লক্ষ্য নয়। আর যদি স্বাদ উপভোগ না হয় তাহলে তা আরেকটা নেয়ামত। এর নাম 'মুজাহাদা'। এটাও একটা নেয়ামত। এ নেয়ামতটা বরং অধিক উপকারী। কারণ, যখন স্বাদ উপভোগ হচ্ছে না, আর তা সত্ত্বেও সে যিকির করছে, তাহলে এ যিকিরের ফলে সে কষ্ট করছে। এ জন্যে সে যিকিরের সওয়াব পৃথকভাবে পাবে এবং মুজাহাদার লাভ আলাদা হবে। কারণ, নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা মুজাহাদা। নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে কাজ করার অভ্যাস করার ফলে নফস মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তাই স্বাদ ছাড়া যিকির করার মধ্যে যেহেতু এ তিনটি ফায়দা রয়েছে, তাই তা অধিক উপকারী। বিধায় এমন যিকিরকে বেকার মনে করা উচিত নয়। যিকিরের মধ্যে যদি স্বাদ আসে, তাহলেও নেয়ামত, আর যদি না আসে তাহলেও নেয়ামত।

যিকিরের ফায়দা দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন-

'কথা কম বলা, মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা এবং সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কম দেয়ার উপর যিকিরের প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল। এ জিনিসগুলো অর্জনের জন্যে 'মাওয়ায়েযে আশরাফিয়া' ও 'মসনবী' অধ্যয়ন করা উচিত (যদিও বুঝে না আসুক)।'[২]

হযরত থানভী রহ. বলেন, যিকিরের যে সমস্ত ফায়দা ও ফলের কথা বুযুর্গগণ বলেন, তা ঐ সময় অর্জন হয়, যখন মানুষ যিকিরের সাথে সাথে আরো দু'টি কাজ করে। এক. কথা কম বলা এবং অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কথা প্রয়োজন পরিমাণ বলবে, অধিক বলবে না। কতক সময় এরই মাধ্যমে স্বাধীনচেতা নফসের চিকিৎসা হয়ে যায়।

---

১. আনফাসে ঈসাঃ ৬৫

২. আনফাসে ঈসাঃ ৬৫

কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এক ব্যক্তির চিকিৎসা

আমার স্মরণ আছে যে, আমার ওয়ালেদ মাজেদ মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করতো। সে খুব বেশি কথা বলতো। কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামার নাম নেই। এক প্রশ্নের পর আরেক প্রশ্ন করতো, তারপর তৃতীয় প্রশ্ন করতো। অবিরাম কথা বলতেই থাকতো। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব যেহেতু অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র মানুষ ছিলেন, এ জন্যে তিনি খুব বেশি ধর-পাকড় করতেন না। তিনি তার কথা সহ্য করে যেতেন।

একবার লোকটি হযরত ওয়ালিদ ছাহেবের নিকট বায়আত এবং ইসলাহী তা'আল্লুক করার আবেদন করে বললো- 'হযরত আমার মন চায় যে, আপনার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করি। আপনার কাছে বায়আত হই। আপনি আমাকে কিছু যিকির ও নফল নামায বলে দিন।' হযরত ওয়ালিদ ছাহেব তাকে বললেন- 'তুমি আমার সঙ্গে ইসলাহী তা'আল্লুক করতে চাইলে ঠিক আছে, তবে তোমার জন্যে নফল ও যিকির ইত্যাদি নেই।' সে জিজ্ঞাসা করলো- 'তাহলে আমি কি করবো?' হযরত ওয়ালিদ ছাহেব বললেন- 'তোমার কাজ এই যে, তুমি তোমার জিহ্বায় তালা লাগাবে। তোমার জিহ্বা যে সব সময় কাঁচির মতো চলতেই থাকে, তা বন্ধ করবে। প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবে। প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও মুখ দিয়ে বের করবে না। এটাই তোমার চিকিৎসা, এটাই তোমার অযীফা এবং এটাই তোমার তাসবীহ। ঐ ব্যক্তির উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতেই যেন তার উপর আসমান ভেঙ্গে পড়লো। কারণ, যে ব্যক্তি সারা জীবন অধিক কথা বলতে অভ্যস্ত, তার উপর এক মুহূর্তে ব্রেক লাগিয়ে দিলে। তা হবে কঠোর মুজাহাদার বিষয়। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্যে শুধুমাত্র কথা কম বলার মুজাহাদাই সফলতা বয়ে আনে। বিধায় এ পথে কথা কম বলার তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। হাদীস শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

'অসার ও অনর্থক কথা পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম।'[১]

---

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২২৪০, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৬৬, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৬৪২, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ১৪০২

শুধু প্রয়োজনের সময় কথা বলবে

হযরত থানভী রহ. বলেন, যে পর্যন্ত যিকির করার সঙ্গে সঙ্গে কথা কম বলার গুণ অর্জন না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে যিকিরের ফায়দাসমূহ পুরোপুরি লাভ হবে না। তবে আখেরাতের সওয়াব পেয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

মানুষের সাথে সম্পর্ক কমাও

দ্বিতীয় জিনিস হলো, মানুষের সাথে সম্পর্ক কম করবে। মানুষের সাথে খুব বেশি সম্পর্ক বাড়ানো, মানুষের সাথে বৈঠক বসানো, সব সময় তাদের সাথে উঠাবসা করা, যা বর্তমান যুগে একটি স্বতন্ত্র শিল্পে পরিণত হয়েছে। যাকে Public Relation বলা হয়। মানুষের সাথে কীভাবে অধিক থেকে অধিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, তা এই শিল্পে শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু আমল ও আখলাকের ইসলাহের এ পথে মানুষের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো ক্ষতিকর। বিশেষত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে।

হ্যাঁ, কারো সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে, তা হবে শুধু আল্লাহর জন্যে। পরিবারের লোকদের সাথে সম্পর্ক থাকলে, থাকবে আল্লাহর জন্যে। বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক থাকলে, থাকবে আল্লাহর জন্যে। সাধারণ মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক থাকলে, থাকবে আল্লাহর জন্যে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে মানুষের সাথে অধিক সম্পর্ক বাড়ালে এবং মেলামেশা রাখলে যিকিরের যথাযথ ফায়দা লাভ হয় না।

চোখ, কান, জিহ্বা বন্ধ করো

মাওলানা রুমী রহ. বলেন-

چشم بند و گوش بند و لب ببند * گر نہ بینی نور حق بر من بخند

অর্থাৎ, তিনটি কাজ করো। **এক.** চোখ বন্ধ করো। কিসের থেকে বন্ধ করবে? নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টি দেয়া থেকে বন্ধ করবে। **দুই.** কান বন্ধ করো। কিসের থেকে বন্ধ করবে? নাজায়েয, হারাম ও অনর্থক কথা শোনা থেকে বন্ধ করো। **তিন.** ঠোঁট, অর্থাৎ মুখ বন্ধ করো। কিসের

থেকে বন্ধ করবে? অনর্থক ও নাজায়েয কথা বলা থেকে বন্ধ করো। এরপরও যদি আল্লাহর নূর নজরে না আসে, তাহলে আমাকে নিয়ে উপহাস করো। অর্থাৎ এ তিন জিনিস বন্ধ করার পর অবশ্যই আল্লাহর নূর নজরে পড়বে।

মোট কথা, যিকিরের যেসব ফায়দা আছে, যেমন আল্লাহর নূর দেখতে পাওয়া, তা অর্জিত না হওয়ার কারণ হলো, যিকিরের সাথে সাথে কথা কম বলা এবং মানুষের সাথে কম মেলামেশা করার যে কাজ ছিলো তা করা হয়নি। যার ফলে যিকিরের উপকারিতাও লাভ হয়নি। এ জন্যে হযরত থানভী রহ. বলছেন যে, যিকিরের লাভ যদি অর্জন করতে চাও, তাহলে যিকিরের সাথে সাথে এসব জিনিসের উপরও তোমাকে আমল করতে হবে।

বিভিন্ন সম্পর্কের দিকে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা যাবে না

তৃতীয় জিনিস হলো, বিভিন্ন সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কম নিবদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রথমত মানুষের সাথে সম্পর্কই কম রাখবে। আর যদি কারো সাথে সম্পর্ক থাকেও তাহলে ঐ সম্পর্কের দিকে বেশি মনোযোগ দিবে না। যেমন, একথা চিন্তা করবে না যে, এ কাজ করলে অমুক অসন্তুষ্ট হবে বা অমুক সন্তুষ্ট হবে। এ চিন্তায় পড়ো না। মাখলুকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির চিন্তায় পড়ো না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা করো। এ তিন জিনিস অর্জিত হলে ইনশাআল্লাহ যিকিরের লাভ এবং যিকিরের ফায়দা পাওয়া যাবে।

এ তিন জিনিস অর্জনের পদ্ধতি

এখন প্রশ্ন জাগে, এ তিন জিনিস অর্থাৎ কম কথা বলা, মানুষের সাথে কম মেলামেশা করা এবং বিভিন্ন সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কম নিবদ্ধ করা। এ জিনিসগুলো কিভাবে লাভ হবে? এগুলো অর্জন করার জন্যে মাওয়ায়েয এবং মাওলানা রুমী রহ.-এর মসনবী অধ্যয়ন করতে বলেছেন। সাথে এ কথাও বলেছেন যে, মসনবী যদি বুঝে নাও আসে, তবুও তা অধ্যয়ন করো। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কতক মানুষের কথার মধ্যে প্রভাব রেখেছেন।

'মসনবী' খোদা প্রদত্ত বাণী

বলা হয় যে, কাব্য চর্চার সঙ্গে মাওলানা রূমী রহ.-এর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। মাওলানা রূমী রহ.-এর শায়খ খাজা শামসুদ্দীন তিবরিযী রহ. একবার আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে যে ইলম দান করেছেন, তা প্রকাশ করার জন্যে কোনো জিহ্বা দান করুন।' এ দু'আর ফলে মাওলানা রূমী রহ. তাঁর কাছে মুরীদ হন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখে 'মসনবী' চালু করে দেন। অথচ ইতোপূর্বে তিনি কখনো কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু শায়খের দু'আর পর তাঁর মুখে এসব কবিতা আসতে থাকে। তিনি দফতরের পর দফতর মসনবী লেখেন। যখন আল্লাহ তা'আলার মঞ্জুরী বন্ধ হলো, তখন কবিতা আসাও বন্ধ হলো। এমনকি শেষে তিনি একটি ঘটনা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই ঘটনাও পুরা হয়নি। মাঝপথেই কবিতা আসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঐ ঘটনাকে অসম্পূর্ণই রেখে যান। তার কয়েক শতাব্দী পর হিন্দুস্তানের ইলাহী বখ্‌শ কান্ধলভীর মুখে আল্লাহ তা'আলা এই কবিতা চালু করে দেন। ফলে ঐ জায়গার পর থেকে তিনি কবিতা বলতে আরম্ভ করেন। তিনি মসনবীর শেষ দফতর পুরা করেন। এ কারণে তাঁকে 'খাতেমে মসনবী' বলা হয়। যখন আল্লাহ তা'আলা এ কালাম তাঁর মুখে চালু করে দেন, তখন চালু হয়ে যায় এবং যখন বন্ধ করে দেন, তখন বন্ধ হয়ে যায়। মোটকথা, এ শব্দগুলো আল্লাহ তা'আলার দান। এর মধ্যে বিশেষ বরকত ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াও আল্লাহ তা'আলাই দান করেন। এ জন্যে হযরত থানভী রহ. বলেন যে, মসনবী অধ্যয়ন করবে, বুঝে আসুক বা না আসুক। কারণ, এটা পড়া ফায়দাশূন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ

মূলনীতি, গুরুত্ব, পদ্ধতি

ফুকাহায়ে কেরাম রহ. লিখেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায-রোযা যেমন ফরযে আইন, তেমনই অন্য কাউকে মন্দ কাজে লিপ্ত দেখলে সাধ্যমতো তাকে বাধা দেয়া এবং নিষেধ করে বলা যে- এটি গোনাহের কাজ, এ কাজ করো না- এটাও ফরযে আইন। মানুষের এ কথা তো জানা আছে যে, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরযে আইন। তবে সাধারণত এর বিস্তারিত বিবরণ জানা নেই যে, কোন্ সময় এটা ফরয এবং কোন্ সময় ফরয নয়। এই না জানার ফলে অনেক মানুষ তো এই ফরযের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল। তারা নিজেদের বউ-বাচ্চা ও বন্ধু-বান্ধবকে হারাম কাজে লিপ্ত দেখছে, কিন্তু তারপরেও বাধা দেয়ার তাওফীক হচ্ছে না। তাদেরকে ফরয কাজে কমতি করতে দেখছে, তারপরেও কিছু বলার তাওফীক হচ্ছে না। আর কতক লোক এ হুকুমকে এতো ব্যাপক মনে করে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অন্যদেরকে বাধা দেয়াকে নিজেদের কাজ বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে এ আয়াতের উপর আমল করার ক্ষেত্রে মানুষ অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্যের শিকার। এর কারণ এই যে, এ আয়াতের সঠিক অর্থ তাদের জানা নেই। তাই এর বিস্তারিত বিবরণ বোঝা প্রয়োজন।

দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾

'মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে (একে অন্যের) সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১]

'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর স্তরসমূহ

এ আয়াতের সম্পর্ক 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর সাথে। নেককার লোকদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- তারা অন্যদেরকে নেক কাজের আদেশ করে এবং মন্দ

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৮, পৃ. ২৬-৫৩

১. সূরা তাওবা, আয়াত ৭১

কাজে নিষেধ করে। 'আমর' অর্থ আদেশ করা এবং 'মারূফ' অর্থ নেক কাজ। 'নাহি' অর্থ নিষেধ করা এবং 'মুনকার' অর্থ মন্দ কাজ।

ফুকাহায়ে কেরাম রহ. লিখেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায-রোযা যেমন ফরযে আইন, তেমনই অন্য কাউকে মন্দ কাজে লিপ্ত দেখলে সাধ্যমতো তাকে বাধা দেয়া এবং নিষেধ করে বলা যে- এটি গোনাহের কাজ, এ কাজ করো না- এটাও ফরযে আইন। মানুষের এ কথা তো জানা আছে যে, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরযে আইন। তবে সাধারণত এর বিস্তারিত বিবরণ জানা নেই যে, কোন্ সময় এটা ফরয এবং কোন্ সময় ফরয নয়। এই না জানার ফলে অনেক মানুষ তো এই ফরযের ব্যাপারে সম্পূর্ণই গাফেল। তারা নিজেদের বউ-বাচ্চা ও বন্ধু-বান্ধবকে হারাম কাজে লিপ্ত দেখছে, কিন্তু তারপরেও বাধা দেয়ার তাওফীক হচ্ছে না। তাদেরকে ফরয কাজে কমতি করতে দেখছে, তারপরেও কিছু বলার তাওফীক হচ্ছে না। আর কতক লোক এ হুকুমকে এত ব্যাপক মনে করে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অন্যদেরকে বাধা দেয়াকে নিজেদের কাজ বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে এ আয়াতের উপর আমল করার ক্ষেত্রে মানুষ অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্যের শিকার। এর কারণ এই যে, এ আয়াতের সঠিক অর্থ তাদের জানা নেই। তাই এর বিস্তারিত বিবরণ বোঝা প্রয়োজন।

দাওয়াত ও তাবলীগের দু'টি পদ্ধতি

প্রথমে বুঝুন যে, দাওয়াত ও তাবলীগ তথা অন্যের কাছে দ্বীনের কথা পৌছানোর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১. এককভাবে দাওয়াত দেয়া ও তাবলীগ করা

২. সমষ্টিগতভাবে দাওয়াত দেয়া ও তাবলীগ করা

এককভাবে দাওয়াত দেয়া ও তাবলীগ করার অর্থ হলো, এক ব্যক্তি নিজ চোখে অপর এক ব্যক্তিকে কোনো গোনাহের কাজ বা মন্দ কাজে লিপ্ত দেখছে, বা কোনো ফরয ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করতে দেখছে, এখন এককভাবে তাকে মন্দ কাজটা ছেড়ে দেয়ার প্রতি বা নেক আমলটা করার প্রতি মনোযোগী করাকে এককভাবে দাওয়াত দেয়া ও তাবলীগ করা বলে।

সমষ্টিগতভাবে দাওয়াত দেয়া ও তাবলীগ করার অর্থ হলো, বড় কোনো সমাবেশের সামনে দ্বীনের কথা বলা। তাদের সামনে ওয়ায-নসীহত করা। তাদেরকে দরস দান করা। বা এমন সংকল্প করা যে, আমি তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন ছাড়াই অন্যদের নিকট গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের কথা শোনাবো। দ্বীন প্রচার করবো। যেমন, মাশাআল্লাহ! আমাদের তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা মানুষের ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে গিয়ে তাদের কাছে দ্বীনের কথা পৌছায়। এটা হলো সমষ্টিগত তাবলীগ। এ দুই প্রকারের দাওয়াত ও তাবলীগের বিধানও ভিন্ন ভিন্ন এবং আদবও ভিন্ন ভিন্ন।

সমষ্টিগত তাবলীগ ফরযে কিফায়া

সমষ্টিগত তাবলীগ ফরযে আইন নয়, ফরযে কিফায়া। এ কারণে অন্যদের নিকট গিয়ে ওয়ায করা, বা অন্যদের বাড়িতে গিয়ে তাবলীগ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয নয়। কারণ, এটা ফরযে কিফায়া। ফরযে কিফায়া হওয়ার অর্থ হলো, কিছু লোক এ কাজ করতে থাকলে অন্যদের থেকে এ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ-ই এ কাজ না করলে সকলে গোনাহগার হবে। যেমন জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জানাযার নামাযে অংশ নেয়া জরুরী নয়। অংশ গ্রহণ করলে তো সওয়াব হবে, কিন্তু না করলে গোনাহ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু লোক আদায় করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ হুকুম। কিন্তু কেউ যদি আদায় না করে, তাহলে সকল মুসলমান গোনাহগার হবে। একে ফরযে কিফায়া বলে। এরকম সমষ্টিগতভাবে দাওয়াত দেয়াও ফরযে কিফায়া, ফরযে আইন নয়।

এককভাবে দাওয়াত দেয়া ফরযে আইন

এককভাবে দাওয়াত দেয়ার অর্থ হলো, আমি নিজ চোখে একটি মন্দ কাজ হতে দেখছি, বা কাউকে একটি ফরয কাজ ছেড়ে দিতে দেখছি, তখন সাধ্যমতো সেই মন্দ কাজে বাধা দেয়া ফরযে কিফায়া নয়, বরং ফরযে আইন। ফরযে আইন হওয়ার অর্থ হলো, এ কথা চিন্তা করে বসে থাকা যাবে না যে, এ কাজ অন্যেরা করবে, বা এ কাজ তো মৌলবীদের,

বা এটা তাবলীগ জামাতওয়ালাদের কাজ। এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। এ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে এটা ফরযে আইন। তাই এককভাবে দাওয়াত দেয়া ফরযে আইন।

'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরযে আইন

কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নেক বান্দাগণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'নেক বান্দাগণ অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে।'[১]

তাই 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। বর্তমানে আমরা এটা ফরয হওয়ার ব্যাপারেও গাফেল। স্বচক্ষে নিজ সন্তানকে এবং পরিবারের লোকদেরকে ভুল পথে চলতে দেখছি, নিজের বন্ধু-বান্ধবকে অন্যায় কাজ করতে দেখছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদেরকে সতর্ক করার কোনো প্রেরণা বা আগ্রহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় না। অথচ এতে একটা স্বতন্ত্র ফরয দায়িত্ব আদায়ে অবহেলা হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, রমাযানের রোযা ফরয, যাকাত ও হজ্ব ফরয, ঠিক একইভাবে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-ও ফরয। তাই সর্বপ্রথম এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। কেউ যদি নিজের সারাটা জীবন নেক আমলের মধ্যে অতিবাহিত করে। একটা নামাযও বাদ না দেয়। একটা রোযাও না ছাড়ে। যাকাত ও হজ্ব যথানিয়মে আদায় করতে থাকে। কোনো কবীরা গোনাহেও লিপ্ত না হয়ে থাকে। কিন্তু সে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করেনি। অন্যদেরকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচানোর ফিকির করেনি। মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত সব নেক আমল করা সত্ত্বেও আখেরাতে তাকে পাকড়াও করা হবে যে, তোমার চোখের সামনে এ সব মন্দ কাজ হয়েছে, গোনাহের বন্যা বয়ে গেছে, তুমি এগুলো রোধ করার জন্যে কী পদক্ষেপ

---
১. সূরা তাওবা, আয়াত ৭১

নিয়েছিলে? তাই শুধু নিজেকে শোধরানই যথেষ্ট নয়, বরং অন্যদের সম্পর্কেও ফিকির করা জরুরী।

'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' কখন ফরয?

দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইবাদত দুই প্রকার।

এক. ঐ সমস্ত ইবাদত, যেগুলো ফরয বা ওয়াজিব। যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি।

দুই. ঐ সমস্ত ইবাদত, যেগুলো সুন্নাত বা মুস্তাহাব। যেমন মিসওয়াক করা, খানা খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা, তিন শ্বাসে পানি পান করা ইত্যাদি। এ প্রকারের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সুন্নাত অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে গোনাহের কাজও দুই প্রকার।

এক. ঐ সমস্ত গোনাহ, যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ। যেগুলো শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত।

দুই. ঐ সমস্ত গোনাহ, যেগুলো হারাম বা না-জায়েয নয়, বরং খেলাফে সুন্নাত, অনুত্তম বা আদবের পরিপন্থী।

কোনো ব্যক্তি ওয়াজিব বা ফরয ছেড়ে দিচ্ছে, কিংবা হারাম ও না-জায়েয কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তখন 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরযে আইন। যেমন, কোনো ব্যক্তি মদ পান করছে, বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে, বা গীবত করছে, বা মিথ্যা বলছে, এগুলো যেহেতু স্পষ্ট গোনাহের কাজ, তাই এ ক্ষেত্রে 'নাহি আনিল মুনকার' ফরয। কিংবা এক ব্যক্তি ফরয নামায ছেড়ে দিচ্ছে, বা যাকাত দিচ্ছে না, বা রমাযানের রোযা রাখছে না, তখন তাকে এগুলো করতে বলা ফরয।

'নাহি আনিল মুনকার' কোন্ সময় ফরয নয়?

তবে এ ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা আছে। 'নাহি আনিল মুনকার' ঐ সময় ফরয, যখন তা মেনে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে 'নাহি আনিল মুনকার'কারীর কোনো কষ্টে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তাই কেউ যদি গোনাহে লিপ্ত থাকে, আর আপনার মনে হয়, আমি নিষেধ করলে সে যে মানবে না তা নিশ্চিত, বরং সে শরীয়তের বিধান নিয়ে

উল্টা উপহাস করবে, শরীয়তের বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং এর ফলে তার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, শরীয়তের কোনো বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করা শুধু গোনাহই নয়, বরং এ কাজ মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং কাফের বানিয়ে দেয়। তাই তার যদি প্রবল ধারণা হয় যে, এখন যদি আমি তাকে এ গোনাহ থেকে বাধা দেই, তাহলে সে শরীয়তের বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, এমতাবস্থায় ঐ সময়ের জন্যে তার থেকে 'নাহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। এমন সময় তাকে ঐ গোনাহ থেকে বাধা দেয়া উচিৎ নয়। বরং ঐ গোনাহের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া উচিৎ। আর ঐ ব্যক্তির জন্যে দুআ করা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দা একটি রোগে আক্রান্ত, আপনি মেহেরবানী করে তাকে এ রোগ থেকে পরিত্রাণ দিন।

গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সময়ে বাধা দিবে

এক ব্যক্তি পরিপূর্ণ আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে গোনাহের দিকে ধাবিত রয়েছে। এমন সময় সুদূর সম্ভাবনাও নেই যে, সে কারো কথা শুনবে বা মানবে। আর ঠিক এমন মুহূর্তে এক ব্যক্তি তার নিকট তাবলীগ করার জন্যে এবং 'আমর বিল মারূফ' করার জন্যে এলো। এ সময় তাবলীগ করার পরিণতি কী হবে, তা চিন্তা না করে সে ঐ অবস্থায় তাবলীগ করলো। সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি শরীয়তের ঐ বিধান নিয়ে উপহাস করলো। ফলে সে কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল। তখন এ ব্যক্তির কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণ ঐ ব্যক্তি হলো, যে তাকে এমন মুহূর্তে তাবলীগ করলো। এ জন্যে যখন কেউ গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে ঠিক ঐ মুহূর্তে তাকে বাধা দেয়া ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এমন সময় বাধা দেয়া উচিৎ নয়। বরং পরবর্তীতে উপযুক্ত সময়ে তাকে বুঝিয়ে বলা উচিৎ যে, তুমি যে কাজ করছো তা ঠিক নয়।

যদি মানা ও না-মানার সমান সম্ভাবনা থাকে?

আর যদি উভয় সম্ভাবনা সমান সমান থাকে। অর্থাৎ সে আমার কথা শুনে মেনে নিবে এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে,

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো সে আমার কথা মানবে না, তাহলে এমন সময় সঠিক কথা বলে দেয়া জরুরী। কারণ, জানা তো নেই, হয়তো তোমার বলার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে কথাটি বসিয়ে দিবেন। ফলে তার সংশোধন হয়ে যাবে। তোমার বলার ফলে যদি তার সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে তার ভবিষ্যতের সমস্ত নেক আমলের সওয়াব তোমার আমলনামায় লেখা হবে।

যদি কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে?

আর যদি ধারণা হয় যে, গোনাহে লিপ্ত এ ব্যক্তিকে যদি আমি বাধা দেই, তাহলে শরীয়তের বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন তো করবে না, তবে আমাকে কষ্ট দিবে। তাহলে এমতাবস্থায় নিজেকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে তাকে গোনাহ থেকে বাধা না দেয়া জায়েয আছে। এমন সময় 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরয থাকবে না। তবে এ সময়ও সঠিক কথা বলে দেয়া উত্তম। সে চিন্তা করবে যে, যদিও আমাকে সে কষ্ট দিবে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, কিন্তু তারপরেও আমি হক কথা বলবো। তাই এমন সময় হক কথা বলা উত্তম। এ কারণে কষ্ট আসলে তা সহ্য করবে। যাইহোক, উপরোক্ত তিনটি অবস্থা মনে রাখতে হবে। সারকথা হলো, যে ক্ষেত্রে এ আশঙ্কা হবে যে, এ ব্যক্তি আমার কথা মানবে তো না, উল্টা শরীয়তের বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, সেখানে 'আমর বিল মারূফ' করবে না। বরং চুপ থাকবে। আর যে ক্ষেত্রে উভয় সম্ভাবনা থাকবে যে, এ ব্যক্তি আমার কথা মানতেও পারে আবার হেয় প্রতিপন্নও করতে পারে, সে ক্ষেত্রেও হক কথা বলা জরুরী। আর যে জায়গায় আশঙ্কা রয়েছে যে, সে আমাকে কষ্ট দিবে, সে ক্ষেত্রে বলা জরুরী নয়, তবে বলে দেয়া এবং এর জন্যে কষ্ট আসলে তা সহ্য করা উত্তম। এ হলো উপরের আলোচনার সারকথা। এ কথাগুলো সবার মনে রাখা উচিৎ।

বাধা দেয়ার সময় নিয়ত সহী হওয়া উচিৎ

উপরন্তু শরীয়তের কথা বলার সময় সর্বদা নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা উচিৎ। এমন মনে করা উচিৎ নয় যে, আমি 'মুসলিহ' (সংস্কারক-সংশোধক) ও

মুরুব্বী। আমি দ্বীনদার ও পরহেযগার। আর এ ব্যক্তি ফাসেক ও পাপাচারী। আমি তার সংশোধন করছি। আমি আল্লাহর সৈনিক ও দারোগা। কারণ, এ নিয়তে যদি কথা বলেন, তাহলে না তার ফায়দা হবে, না আপনার। কারণ, এমন নিয়ত থাকলে আপনার মনের মধ্যে অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হবে। যার কারণে এ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। ফলে আপনার আমল বেকার ও বৃথা হবে। আপনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। শ্রোতার অন্তরেও আপনার কথার কোনো প্রভাব পড়বে না। এ জন্যে বাধা দেয়ার সময় নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া জরুরী।

কথা বলার পদ্ধতি সঠিক হওয়া উচিৎ

অন্য কাউকে যখনই শরীয়তের কথা বলবে, সঠিক পদ্ধতিতে বলবে। ভালোবাসা ও কল্যাণকামনার সাথে বলবে। যাতে সে অধিকতর কম কষ্ট পায়। এমন আঙ্গিকে কথা বলবে, যেন তার অবমাননা না হয়। মানুষের সামনে সে অসম্মানিত না হয়। শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. একটি কথা বলতেন। কথাটি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর নিকট থেকে অনেকবার শুনেছি। তা হলো, হক কথা হক নিয়তে এবং হক পদ্ধতিতে যখনই বলা হবে, তা ক্ষতিকর হবে না। তাই যখনই তুমি দেখবে যে, হক কথা বলার ফলে কোথাও লড়াই-ঝগড়া হয়েছে, বা ক্ষতি হয়েছে, বা ফেৎনা-ফাসাদ হয়েছে, তখন বুঝবে যে, ঐ তিনটির কোনো একটি অবশ্যই বিঘ্নিত হয়েছে। হয় কথা হক ছিলো না, কিন্তু অহেতুক এটাকে হক কথা মনে করা হয়েছে। অথবা কথা তো হক ছিলো, কিন্তু নিয়ত বিশুদ্ধ ছিলো না। কথার পেছনে অন্যের সংশোধন উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো নিজের বড়ত্ব জাহির করা। না হলে অন্যকে অপমান করা উদ্দেশ্য ছিলো। যে কারণে কথার মধ্যে সঠিক প্রভাব ছিলো না। কিংবা কথাও হক ছিলো এবং নিয়তও সঠিক ছিলো, তবে কথা বলার পদ্ধতি সঠিক ছিলো না। এমন পদ্ধতিতে কথা বলেছে, যেন অন্যকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে। হক কথা কোনো লাঠি নয় যে, তা দ্বারা কাউকে আঘাত করবে। হক কথা বলা তো ভালোবাসা ও কল্যাণকামনার কাজ।

হক পদ্ধতিতে তা সম্পাদন করতে হবে। কল্যাণকামনার অভাব হলে তখন হক কথা দ্বারাও ক্ষতি হয়ে থাকে।

নরমভাবে বুঝাতে হবে

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. বলতেন- আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আ. ও হযরত হারূন আ.-কে ফেরাউনের সংশোধনের জন্যে পাঠান। ফেরাউন কে ছিলো? যে খোদা হওয়ার দাবি করেছিলো। যে বলেছিলো-

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝

'আমি তোমাদের বড় খোদা।'[১]

ফেরাউন ছিলো জঘণ্যতম কাফের। কিন্তু এই দুই নবী যখন ফেরাউনের কাছে যাচ্ছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন-

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝

'তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে গিয়ে নরম ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে নসীহত গ্রহণ করবে বা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।'[২]

এ ঘটনা শোনানোর পর ওয়ালেদ মাজেদ রহ. বলেন- তোমরা হযরত মুসা আ.-এর চেয়ে বড় মুসলিহ হতে পারবে না এবং তোমাদের প্রতিপক্ষ যতো বড় ফাসেক, ফাজের ও মুশরিকই হোক, ফেরাউনের চেয়ে বড় গোমরা হতে পারবে না। কারণ, সে তো ছিলো খোদা হওয়ার দাবিদার। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আ. ও হযরত হারূন আ.-কে বলছেন- যখন ফেরাউনের কাছে যাবে, নরমভাবে কথা বলবে। কঠোরভাবে বলবে না। এর মাধ্যমে আমাদের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগত লোকদের জন্যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, যখনই কারো সঙ্গে দ্বীনের কথা বলবে, নরমভাবে বলবে। শক্তভাবে বলবে না।

---

১. সূরা নাযি'আত, আয়াত ২৪

২. সূরা ত-হা, আয়াত ৪৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বোঝানোর আঙ্গিক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন সেখানে প্রবেশ করলো। এসে অতি দ্রুত নামায পড়লো। নামাযের পর সে এক অদ্ভুত ধরনের দুআ করলো-

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا

'হে আল্লাহ! আমার উপর রহম করুন এবং মুহাম্মাদের উপর রহম করুন। আমাদের ছাড়া অন্য কারো উপর রহম করবেন না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ দুআ শুনে বললেন- তুমি আল্লাহর রহমতকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দিয়েছো। তুমি বলেছো, শুধু দু'জনের উপর রহম করুন, অন্য কারো উপর রহম করবেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলার রহমত অনেক প্রশস্ত। অল্পক্ষণ পর ঐ বেদুইন লোকটিই মসজিদের মধ্যে বসে পেশাব করে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাকে মসজিদের মধ্যে পেশাব করতে দেখেছেন, তখন তারা দৌড়ে গিয়ে তাকে শাসানোর উপক্রম হয়েছেন। ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

لَا تُزْرِمُوْهُ

'তার পেশাব বন্ধ করো না।'

তার যা করার ছিলো তা তো করেই ফেলেছে। তাকে পেশাব শেষ করতে দাও। তাকে ধমক দিও না। তারপর বললেন-

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

'তোমাদেরকে মানুষের জন্যে কল্যাণকামী ও সহজকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কঠিনকারী বানিয়ে পাঠানো হয়নি।'

এখন পানি দিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করো। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন- মসজিদ আল্লাহর ঘর।

এ ঘর এ সব কাজের জন্যে নয়। তোমার এ কাজ করা ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না।[১]

আম্বিয়ায়ে কেরামের তাবলীগের আঙ্গিক

আমাদের সামনে কেউ যদি এভাবে মসজিদে পেশাব করে, তাহলে হয়তো তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, লোকটি বেদুইন ও অজ্ঞ। না জেনে, না বুঝে এ কাজ করেছে। তাই তাকে এখন ধমক দেয়া যাবে না। এখন তাকে নরমভাবে বোঝাতে হবে। তিনি তাকে নরমভাবে বুঝিয়ে দিলেন। নবীগণের শিক্ষা এটাই। বিপক্ষ গালি দিলেও উত্তরে তাঁরা গালি দেন না। কুরআনে কারীমে মুশরিকদের এ কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা নবীগণকে সম্বোধন করে বলেছে-

إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ۝٦٦

'আমরা তোমাকে দেখছি যে, তুমি একজন বেওকুফ লোক এবং আমাদের ধারণায় তুমি একজন মিথ্যুক।'[২]

এ যুগে কেউ যদি কোনো আলেম, বক্তা বা খতীবকে বলে যে, তুমি বেওকুফ ও মিথ্যুক। তাহলে উত্তরে সে তাকে বলবে- তুই বেওকুফ, তোর বাপ বেওকুফ। কিন্তু নবী এর উত্তরে বলেছেন-

يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝٦٧

'হে আমার জাতি! আমি বেওকুফ নই। আমি তো রব্বুল আলামীনের পয়গম্বর।'[৩]

লক্ষ্য করুন! গালির উত্তরে গালি দেয়া হয়নি। বরং স্নেহ ও ভালোবাসার আচরণ করা হয়েছে।

---

১. সহীহু বুখারী, হাদীস নং ৫৫৫১, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৭, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১২০১, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩২৪, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৫২৩

২. সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬৬

৩. সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬৭

অপর এক সম্প্রদায় তাদের নবীকে বলেছে-

إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۝

'তোমাকে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে দেখছি।'[১]

উত্তরে নবী বলেন- হে আমার জাতি! আমি গোমরাহ নই। আমি তো বরং আল্লাহর রাসূল।

এটা হলো নবীগণের দাওয়াত ও ইসলাহের পদ্ধতি। আমাদের কথার যে কোনো ফল হয় না, এর কারণ হলো, হয় আমাদের কথা হক নয়, না হয় পদ্ধতি সঠিক নয়, না হয় নিয়ত বিশুদ্ধ নয়। যার ফলে এ সমস্ত অনিষ্ট দেখা দিচ্ছে।

হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর ঘটনা

হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. ঐ সমস্ত বুযুর্গের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা এর উপর আমল করে দেখিয়েছেন। তাঁর একটি ঘটনা। একবার তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে ওয়ায করছিলেন। ওয়াযের মধ্যে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো- মাওলানা! আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. বললেন- কী সে প্রশ্ন? সে বললো- আমি শুনেছি, আপনি হারামজাদা। নাউযুবিল্লাহ! ঠিক ওয়াযের মাঝে ভরা মজমায় এ কথা সে এমন এক ব্যক্তিকে বলছে, যিনি শুধু বড় আলেমই ছিলেন না, বরং শাহী খান্দানের শাহজাদা ছিলেন। আমাদের মতো কেউ হলে সাথে সাথে রাগ চলে আসতো। জানা নেই, তার কী পরিণতি করতাম। আমরা না করলে আমাদের ভক্তবৃন্দ তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। বলতো, সে আমাদের শাইখকে এমন বললো কেন? কিন্তু হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. উত্তরে বললেন- ভাই! আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। আমার মায়ের বিয়ের সাক্ষী তো এখনো দিল্লীতে বর্তমান রয়েছে। এভাবে তার গালির উত্তর দিলেন। এটাকে ঝগড়ার কোনো বিষয়ই বানালেন না।

---

১. সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬০

কথার মধ্যে প্রভাব কীভাবে সৃষ্টি হবে?

যখন আল্লাহর কোনো বান্দা নিজের নাফসানিয়াতকে বিলুপ্ত করে এবং নিজেকে নিজে মিটিয়ে দিয়ে কেবল আল্লাহর জন্যে কথা বলে এবং জগৎবাসী জানতে পারে যে, তার নিজের কোনো স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে নয়, বরং সে যা কিছু বলছে, আল্লাহর জন্যে বলছে, তখন তার কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হয়। সুতরাং হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর এক এক ওয়াযে হাজার হাজার মানুষ তাঁর হাতে তাওবা করতো। আজ আমরা প্রথমত দাওয়াত ও তাবলীগ ছেড়ে দিয়েছি, আর কেউ করলেও এমন পদ্ধতিতে করি, যা মানুষকে উল্টা উত্তেজিত করে। যার দ্বারা সঠিক অর্থে কোনো ফায়দা হয় না। এ কারণে এ তিনটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, কথা হক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়ত হক হতে হবে। তৃতীয়ত, পদ্ধতি হক হতে হবে। হক কথা হক পদ্ধতিতে হক নিয়তে বলা হলে তা কখনো ক্ষতির কারণ হবে না। তার দ্বারা অবশ্যই ফায়দা হবে।

সমষ্টিগত তাবলীগ করার অধিকার কার রয়েছে?

দ্বিতীয় প্রকার তাবলীগ হলো, সমষ্টিগত তাবলীগ। অর্থাৎ মানুষকে সমবেত করে ওয়ায-নসীহত করা, বক্তব্য দেয়া- একে সমষ্টিগত তাবলীগ বলা হয়। সমষ্টিগত তাবলীগ ফরযে আইন নয়, ফরযে কিফায়া। কিছু লোক যদি এ ফরয আদায়ের জন্যে কাজ করে তাহলে অন্যান্যদের থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। সমষ্টিগত তাবলীগ করা সবার কাজ নয় যে, যার ইচ্ছা তাবলীগ করতে দাঁড়িয়ে গেল এবং ওয়ায করতে আরম্ভ করলো। বরং তার জন্যে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। সে পরিমাণ ইলম না থাকলে সে সমষ্টিগত তাবলীগের জন্যে 'মুকাল্লাফ' তথা দায়িত্বশীল নয়। কমপক্ষে এতোটুকু ইলম থাকা জরুরী, যাতে ওয়াযের মধ্যে ভুল কথা বলার আশঙ্কা না থাকে। এমন ব্যক্তির জন্যে ওয়ায করার অনুমতি রয়েছে, অন্যথায় অনুমতি নেই। ওয়ায ও তাবলীগের বিষয়টি খুবই নাজুক। মানুষ যখন দেখে যে, এতোগুলো মানুষ বসে আমার কথা শুনছে, তখন তার নিজের মধ্যেই অহঙ্কার চলে আসে। তখন সে নিজেই ওয়ায ও বয়ান দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। মানুষ ধোঁকা খায় যে, লোকটার ইলম আছে, বড় নেক

লোক সে। মানুষ যখন ধোঁকা খায়, তখন সে নিজেও ধোঁকায় পড়ে যায় যে, এতোগুলো মানুষ আমাকে আলেম বলছে, ভালো এবং নেককার বলছে, তাহলে আমি তো অবশ্যই কিছু একটা হয়ে গেছি। তা না হলে তো এরা এমন বলতো না। এতোগুলো মানুষ তো আর পাগল হয়নি। মোটকথা, ওয়ায ও বয়ান করার ফলে মানুষ এই ফেৎনার শিকার হয়ে যায়।

এ কারণে সবার ওয়ায ও বয়ান করা উচিৎ নয়। তবে যদি ওয়ায করার জন্যে বড় কেউ কোথাও বসিয়ে দেয়, আর বড়দের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্যও চাইতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ ফেৎনা থেকে হেফাজত করেন।

কুরআন ও হাদীসের দরস দান করা

ওয়ায ও বয়ান তুলনামূলক সহজ বিষয়, এখন তো কুরআন ও হাদীসের দরস পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। যার মন চাইলো, সে-ই কুরআনের দরস দিতে আরম্ভ করলো। অথচ কুরআনে কারীম সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কুরআনে কারীমের তাফসীর সম্পর্কে কোনো কথা বলবে, সে যেন জাহান্নামের মধ্যে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'[১]

অন্য এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন-

مَنْ قَالَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهٖ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

'যে ব্যক্তি নিজের মনমতো মহান আল্লাহর কিতাবের তাফসীর করবে, সে যদি ঠিক তাফসীরও করে, তবুও ভুল করেছে।'[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কঠিন ধমকি দিয়েছেন। এরপরও বর্তমানে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, কেউ বই-পুস্তক পড়ে দ্বীনের কিছু কথা জানতে পারলে, সেও আলেম বনে যায়। সে এখন

১. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৭৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯৬৫
২. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩১৬৭, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৭৬

কুরআনের দরস দিতে আরম্ভ করে। অথচ কুরআন ও হাদীসের দরস দেয়া এমন একটা কাজ, যা করতে বড় বড় আলেমও ভয় পান। সেখানে সাধারণ মানুষের কুরআনের দরস দেয়া এবং তাফসীর করার তো প্রশ্নই আসে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. ও তাফসীরে কুরআন

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. জীবনের সত্তর-পঁচাত্তরটি বছর দ্বীনী ইলম পড়া ও পড়ানোর কাজে অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে এসে 'মাআরিফুল কুরআন' নামে তাফসীর সংকলন করেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে বারবার বলেন যে, আমার মধ্যে তো তাফসীর বিষয়ে কলম ধরার কোনো যোগ্যতা নেই, কিন্তু হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ.-এর তাফসীরটি আমি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছি মাত্র। সারাটা জীবন তিনি এ কথা বলেছেন। বড় বড় আলেম তাফসীর বিষয়ে কথা বলতে কাঁপতে থাকেন।

ইমাম মুসলিম রহ. ও হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত ইমাম মুসলিম রহ.- যিনি 'সহীহ মুসলিম' নামে সহীহ হাদীসের একটি সংকলন তৈরী করেছেন। তিনি সহীহ হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন ঠিক, কিন্তু হাদীসের ব্যাখ্যায় নিজের পক্ষ থেকে একটি কথাও বলা পছন্দ করেননি। এমনকি অন্যান্য মুহাদ্দিস যেমন 'নামাযের অধ্যায়', 'পবিত্রতার অধ্যায়' ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে অধ্যায় বসিয়েছেন, তিনি তাঁদের মতো অধ্যায়-শিরোনামও দেননি। শুধু এ কথা চিন্তা করে তিনি অধ্যায়-শিরোনাম দেননি যে, হয়তো আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাখ্যায় কোনো কথা বলবো, আর তা ভুল হয়ে যাবে। ফলে আল্লাহর দারবারে আমাকে পাকড়াও করা হবে। শুধু এতোটুকু বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ সংকলন করছি। উলামায়ে কেরাম সকল হাদীস থেকে যে সমস্ত মাসআলা ইচ্ছা উদ্ভাবন করবেন। এবার অনুমান করে দেখুন, কাজটি কতো জটিল। কিন্তু বর্তমানে যার মন চায় দরস দিতে আরম্ভ

করে। জানতে পারি যে, অমুক জায়গায় অমুকে দরসে কুরআন দিতে আরম্ভ করেছেন। অমুকে হাদীসের দরস দিতে আরম্ভ করেছেন। অথচ তাদের না ইলম আছে, না তাদের মধ্যে দরস দেয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান। যার ফলে আজ নানা রকমের ফেৎনা বিস্তার লাভ করছে। ফেৎনার বাজার আজ গরম।

এ কারণে কারো দরসে কুরআন বা দরসে হাদীসে অংশ নেয়ার পূর্বে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, যিনি দরস দিচ্ছেন, তিনি বাস্তবিকই দরস দেয়ার যোগ্য কি না? তার নিকট এ বিষয়ের পরিপূর্ণ ইলম আছে কি না? কারণ দরস দান করা সবার কাজ নয়। যাইহোক, আমি আরজ করছিলাম যে, যার নিকট যথোপযুক্ত ইলম নেই, তার সমষ্টিগত তাবলীগ, ওয়ায ও বয়ান করা উচিৎ নয়। তবে তার ব্যক্তিগত তাবলীগের কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ।

আমলহীন ব্যক্তি কি ওয়ায-নসীহত করবে না?

এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজে কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে অন্যদেরকে সেই অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেয়ার অধিকার তার নেই। যেমন এক ব্যক্তি নিয়মিত জামাতের সাথে নামায আদায় করে না। তখন বলা হয় যে, সে নিজে যে পর্যন্ত নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে নামায আদায় করা আরম্ভ না করবে, অন্যদেরকেও জামাতের সাথে নামায আদায় করার কথা বলবে না। -এ কথা ঠিক নয়। বাস্তবে কথা এর বিপরীত। তা হলো, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে জামাতের সাথে নামায আদায় করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, তার নিজেরও নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে নামায পড়া উচিৎ। এটা নয় যে, যে জামাতের সাথে নিয়মিত নামায আদায় করে না, সে অন্যদেরকেও তা করতে বলবে না। সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে (এ বিষয়ের দলীল হিসেবে) এ আয়াতটি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না।'[১]

---

১. সূরা সফ, আয়াত ২

অনেক মানুষ এ আয়াতের অর্থ এই বোঝে, যে ব্যক্তি যে কাজ করে না, সে অন্যদেরকেও সে কাজের কথা বলবে না। যেমন এক ব্যক্তি দান করে না, তাহলে সে অন্যদেরকেও দান করতে বলবে না। কিংবা এক ব্যক্তি সত্য বলে না, তাহলে সে অন্যদেরকেও সত্য বলতে বলবে না। আয়াতের এ অর্থ করা সঠিক নয়। বরং এ আয়াতের অর্থ হলো, যে বিষয় এবং যে গুণ তোমার মধ্যে নেই, তুমি তার দাবি করো না যে, এটা আমার মধ্যে আছে। যেমন তুমি যদি জামাতের সাথে নিয়মিত নামায না পড়ো, তাহলে মানুষকে বলো না, আমি জামাতের সাথে নিয়মিত নামায পড়ি। কিংবা তুমি যদি নেককার ও পরহেযগার না হয়ে থাকো, তাহলে অন্যদের নিকট দাবি করো না যে, তুমি নেককার ও পরহেযগার। কিংবা যেমন তুমি হজ্জ করোনি, তাহলে এমন বলো না যে, আমি হজ্ব করেছি। এ আয়াতের সঠিক অর্থ এটা। অর্থাৎ যে কাজ তুমি করো না, অন্যের সামনে তার দাবি করো কেন? আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, তুমি যে কাজ করো না, অন্যদেরকে তা করতেও বলো না। কারণ, অনেক সময় অন্যকে বলার কারণে মানুষের নিজের উপকার হয়ে থাকে। মানুষ যখন অন্যকে বলে, আর নিজে আমল করে না, তখন তার শরম লাগে। সেই শরমের ফলে মানুষ নিজে আমল করতে বাধ্য হয়।

অন্যকে নসীহতকারী ব্যক্তি নিজেও আমল করবে

কুরআনে কারীমে আরেকটি আয়াত আছে। সে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

'তোমরা কি অন্যদেরকে নেক কাজের কথা বলো, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও!'[১]

অর্থাৎ, যখন তোমরা অন্যদেরকে কোনো নেক আমলের নসীহত করছো, তখন নিজেও তার উপর আমল করো। এ অর্থ নয় যে, নিজে যেহেতু আমল করো না, তাই অন্যদেরকেও নসীহত করো না।

১. সূরা বাকারা, আয়াত ৪৪

যাই হোক, আমি নিজে আমল করি না, এটা যেন অন্যদেরকে নসীহত করার কাজে প্রতিবন্ধক না হয়। বরং বুযুর্গগণ তো বলেছেন-

من نکردوم شما حذر بکنید

'আমি করিনি, তোমরা সতর্ক হও!

হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন- কোনো কোনো সময় যখন আমার মধ্যে কোনো দোষ অনুভব হয়, তখন আমি সেই দোষ সম্পর্কে বয়ান করি, এর ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সংশোধন করে দেন।

তবে একথা ঠিক যে, আমলদার ব্যক্তির নসীহত, আর আমলহীন ব্যক্তির নসীহতের প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তি নিজে আমল করে অন্যকে নসীহত করে, আল্লাহ তা'আলা তার কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেন। তার কথা মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। তার দ্বারা মানুষের জীবনে বিপ্লব সাধিত হয়। আর নিজে আমল না করে যে নসীহত করা হয়, তার প্রভাব শ্রোতাদের উপরও যথাযথভাবে পড়ে না। জিহ্বা দিয়ে কথা বের হয় আর কানের সাথে বাড়ি খেয়ে ফিরে চলে যায়। অন্তরে প্রবেশ করে না। সে জন্যে অবশ্যই আমলের চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু এটা নসীহত করতে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিৎ নয়।

মুস্তাহাব ছেড়ে দিলে তিরস্কার করা ঠিক নয়

মোটকথা, কোনো ব্যক্তি যদি ফরয ও ওয়াজিব পালনে ত্রুটি করে, বা স্পষ্ট কোনো গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে তাবলীগ করা এবং 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' করা ফরয। যে সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। শরীয়তের কিছু বিধান এমন আছে, যেগুলো ফরয-ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। মুস্তাহাব অর্থ হলো, কেউ তা করলে সওয়াব পাবে, কিন্তু না করলে কোনো গোনাহ হবে না। বা শরীয়তের বিভিন্ন আদব আছে, যেগুলো উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন। এ সমস্ত মুস্তাহাব ও আদব সম্পর্কে হুকুম হলো, মানুষকে এর জন্যে উৎসাহিত করা হবে যে, এমনভাবে যদি করো তাহলে ভালো হয়। কিন্তু তা না করলে তিরস্কার করা যাবে না। কেউ যদি এই মুস্তাহাব

আমল না করে, তাহলে তাকে তিরস্কার করা বা বকা দেয়া আপনার জন্যে জায়েয নেই। আপনি তাকে বলতে পারবেন না যে, তুমি এ কাজ করলে না কেন? হ্যাঁ, সে যদি আপনার ছাত্র হয়, বা সন্তান হয়, বা আপনার দীক্ষাধীন হয়, যেমন আপনার মুরীদ, তাহলে অবশ্যই তাকে বলা উচিৎ যে, তুমি অমুক সময় অমুক মুস্তাহাব আমলটি ছেড়ে দিয়েছো। বা অমুক আদবের লেহাজ করোনি। কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষ যদি কোনো মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর আপত্তি উত্থাপনের অধিকার আপনার নেই। অনেক মানুষ মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব দিয়ে অন্যের উপর আপত্তি করতে থাকে যে- তুমি এ কাজ কেন ছাড়লে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তো কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, তুমি অমুক মুস্তাহাব কাজটি কেন করোনি? ফেরেশতাও এ প্রশ্ন করবে না। কিন্তু আপনি আল্লাহর সৈনিকের রূপ ধারণ করে মানুষের উপর আপত্তি করছেন যে- তুমি এ মুস্তাহাব কাজ কেন ছাড়লে? এমন করা কোনোভাবেই ঠিক নয়।

আযানের পর দুআ পড়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের পর পাঠ করার জন্যে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

'হে আল্লাহ! পরিপূর্ণ এ আহ্বান ও পরবর্তীতে অনুষ্ঠেয় নামাযের (আপনিই) প্রভু, আপনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসীলা, ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে আপনি সেই মাকামে মাহমুদে পৌছে দিন, যার ওয়াদা আপনি তাঁর সাথে করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদার বিপরীত করেন না।'[১]

---

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৭৯, সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫, সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ৬৭৩, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৪৫, সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৭১৪, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৪০৯২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানকে আযানের পর এ দু'আ পাঠ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বড় বরকতময় এ দু'আ। নিজেদের সন্তানদেরকে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে এটা তালীম দেয়া উচিৎ। যাতে তারা এটা পাঠ করতে পারে। অন্য মুসলমানগণকেও এ দু'আ পাঠ করার জন্যে উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি আযানের পর এ দু'আ পাঠ না করে আর আপনি সে জন্যে তার উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, 'এ দু'আ পড়লে না কেন?' তবে তা ঠিক নয়। কারণ আপত্তি করা হবে সবসময় ফরয কাজ ছেড়ে দিলে বা গোনাহের কাজে লিপ্ত হলে। মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দিলে আপত্তি করা যাবে না।

আদব-শিষ্টাচার ত্যাগ করলে আপত্তি করা জায়েয নেই

এমন কিছু আমল আছে, যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব নয়। কুরআন ও হাদীসে সেগুলোকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়নি, তবে কতিপয় আলেম সেগুলোকে আদব বলে গণ্য করেছেন। যেমন খাবার খাওয়ার জন্যে হাত ধুয়ে তোয়ালে বা রুমাল দিয়ে হাত না মোছাকে কতক আলেম আদব বলেছেন। এমনিভাবে এটাকেও আদব বলেছেন যে, দস্তরখানে তুমি প্রথমে বসবে, তারপর খানা দেয়া হবে। খানা আগে দেয়া হলো, পরে তুমি বসলে এটা খানার আদবের পরিপন্থী। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এসব আদবের উল্লেখ নেই। কিন্তু উলামায়ে কেরাম এগুলোকে খানার আদব বলেছেন। এগুলোকে মুস্তাহাব বলাও মুশকিল। এখন কেউ যদি এসব আদব পালন না করে, উদাহরণ স্বরূপ কেউ খানা খাওয়ার জন্যে হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে তা মুছলো বা দস্তরখানে আগে খানা সাজানো হলো আর সে পরে গিয়ে বসলো, এখন তার উপর আপত্তি করা এবং বলা যে, তুমি শরীয়ত পরিপন্থী বা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করেছো, এটা ঠিক নয়। কারণ, এ সমস্ত আদব শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাতও নয়, মুস্তাহাবও নয়। তাই এগুলো ছেড়ে দিলে তার উপর আপত্তি করা বা তাকে ধরে বসা ঠিক নয়। এসব বিষয়ে আমাদের সমাজে খুব বেশি অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। কতক সময় ছোট ছোট বিষয়ে শক্তভাবে ধরে বসা হয়, যা কোনভাবেই ঠিক নয়।

চারজানু হয়ে খানা খাওয়াও জায়েয

খানা খাওয়ার সময় চারজানু হয়ে বসাও জায়েয। নাজায়েয নয়। এতে কোনো গোনাহ্ হয় না। তবে এভাবে বসার মধ্যে এ পরিমাণ বিনয় প্রকাশ পায় না, যা দুইজানু হয়ে বসলে বা একপা উঠিয়ে খানা খাওয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই দুইজানু হয়ে বা একপা উঠিয়ে বসে খানা খাওয়ার অভ্যাস করা উচিৎ। চারজানু হয়ে বসে খানা খাবে না। কিন্তু কেউ যদি এভাবে বসতে না পারে, বা কোনো ব্যক্তি আরামের জন্যে চারজানু হয়ে বসে খানা খায়, তাহলে এতে গোনাহ্ হবে না। মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, চারজানু হয়ে বসে খানা খাওয়া জায়েয নেই, এ ধারণা ঠিক নয়। চারজানু হয়ে বসে খাওয়া যেহেতু জায়েয, তাই কেউ এভাবে বসে খানা খেলে তার উপর আপত্তি করা ঠিক নয়।

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াও জায়েয

চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়া গোনাহ্ বা নাজায়েয নয়। তবে মাটিতে বসে খাওয়ার মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের সওয়াবও রয়েছে এবং সুন্নাতের অধিক নৈকট্যও রয়েছে। তাই যদ্দুর সম্ভব মাটিতে বসে খানা খাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ, সুন্নাতের নৈকট্য যতো অধিক হবে, ততো অধিক বরকত হবে এবং সওয়াবও লাভ হবে ততো অধিক। ততো বেশি উপকারিতাও লাভ হবে। মোটকথা, টেবিল-চেয়ারে বসে খানা খাওয়া জায়েয। গোনাহের কাজ নয়। এ কারণে টেবিল-চেয়ারে খানা খেলে আপত্তি করা ঠিক নয়।

মাটিতে বসে খানা খাওয়া সুন্নাত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কারণে মাটিতে বসে খানা খেতেন। এক তো এই যে, সে যুগের জীবনাচার ছিলো সহজ-সরল। চেয়ার-টেবিলের প্রচলনই ছিলো না। এজন্যে নিচে বসে খানা খেতেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নিচে বসে খানা খাওয়ার মধ্যে অধিক বিনয় রয়েছে। এতে খানার প্রতি সম্মান প্রদর্শনও হয়ে থাকে অধিক। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খেলে মনের অবস্থা একরকম হবে, আর মাটিতে বসে খেলে মনের অবস্থা হবে অন্যরকম। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য অনুভূত হবে। কারণ,

মাটিতে বসে খানা খেলে মনে অধিক বিনয়, নম্রতা, অসহায়ত্ব ও দাসত্ব ফুটে উঠবে। পক্ষান্তরে চেয়ার-টেবিলে বসে খেলে এসব গুণ সৃষ্টি হবে না। এ কারণে যদ্দুর সম্ভব মাটিতে খানা খাওয়া উচিৎ। তবে চেয়ার-টেবিলে বসার পরিস্থিতি হলে এভাবে খাওয়ায় দোষ নেই এবং এতে গোনাহও হবে না। তাই এ বিষয়ে কঠোরতাও ঠিক নয়। যেমন অনেকে চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়াকে হারাম ও নাজায়েয মনে করে থাকে এবং এর উপর অত্যাধিক আপত্তি করে থাকে। এরূপ করা ঠিক নয়।

এ সুন্নাতকে নিয়ে যেন ঠাট্টা করা না হয়

আমি যে, বললাম- মাটিতে খানা খাওয়া সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী, অধিক উত্তম এবং অধিক সওয়াবের কারণ। তবে এটা তখন, যখন এ সুন্নাতকে ঠাট্টার বস্তু না বানানো হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত করুন। তাই কোথাও যদি আশঙ্কা দেখা দেয় যে, মাটিতে বসে খানা খাওয়া হলে মানুষ এ সুন্নাতকে নিয়ে উপহাস করবে, এমতাবস্থায় মাটিতে বসে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করাও ঠিক নয়।

হোটেলে মাটিতে খানা খাওয়া

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. একদিন আমাদেরকে এ ঘটনা শোনান যে, 'একবার আমি এবং আমার কিছু সঙ্গী দেওবন্দ থেকে দিল্লী যাই। দিল্লীতে পৌছার পর খানা খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। খানা খাওয়ার অন্য কোনো জায়গা ছিলো না। এ জন্যে আমরা এক হোটেলে চলে যাই। বলা বাহুল্য যে, হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে চেয়ার-টেবিলে। আমাদের দু'জন সাথী বললো- আমরা তো চেয়ার-টেবিলে বসে খাবো না। কারণ, মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নাত। সুতরাং তারা হোটেলের মধ্যে মাটির উপর নিজেদের রুমাল বিছিয়ে বেয়ারাকে বলে সেখানে খানা আনানোর ইচ্ছা করলো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন- আমি তাদেরকে নিষেধ করলাম যে, এরূপ করবেন না। চেয়ার-টেবিলে বসেই খানা খান। তারা বললো, আমরা চেয়ারে বসে কেন খানা খাবো? মাটিতে বসে খানা খাওয়া যেহেতু সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী, তাই মাটিতে বসে খানা খেতে ভয় করবো কেন? কেন লজ্জা করবো? হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন- লজ্জা বা ভয়ের বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো, যখন আপনারা

মাটিতে রুমাল বিছিয়ে বসে খানা খাবেন, তখন মানুষের সামনে এ সুন্নাতকে উপহাসের পাত্র বানাবেন। মানুষ তখন এ সুন্নাতকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। সুন্নাতকে হেয় প্রতিপন্ন করা শুধু গোনাহই নয়, বরং অনেক সময় তা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

তারপর হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাদেরকে বললেন- আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। অনেক বড় মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন সোলায়মান আ'মাশ রহ.। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এরও উস্তায। হাদীসের কিতাবাদিতে তাঁর বর্ণনা ভরপুর। আরবী ভাষায় 'আ'মাশ' বলা হয় 'ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন' ব্যক্তিকে। চোখের পালক পড়ে গিয়ে জ্যোতি হ্রাস পেলে তাকে 'আ'মাশ' বলা হয়। তিনিও যেহেতু ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তাই আ'মাশ নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁর কাছে একজন শাগরিদ আসেন। তিনি ছিলেন 'আ'রাজ' অর্থাৎ ল্যাংড়া। তার পা ছিলো বিকল। এই ছাত্র সবসময় উস্তাযের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। উস্তায যেখানে যেতেন তিনিও সাথে যেতেন। ইমাম আ'মাশ রহ. যখন বাজারে যেতেন, তখন এই খোঁড়া ছাত্রও তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতেন। এঁদের দেখে বাজারের লোকেরা বলত- দেখো উস্তায হলো 'আ'মাশ'- ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন, আর ছাত্র হলো 'আ'রাজ'- ল্যাংড়া। ইমাম আ'মাশ রহ. তার ছাত্রকে বললেন- আমি বাজারে গেলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না। ছাত্র বললো- কেন? আমি আপনার সঙ্গ ছাড়বো কেন? ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন- আমরা যখন বাজারে যাই, মানুষ আমাদের নিয়ে উপহাস করে যে, উস্তায 'আ'মাশ' আর ছাত্র 'আ'রাজ'!

ছাত্র বললো-

مَا لَنَا نُؤْجَرُ وَيَأْثَمُوْنَ

হযরত! যারা উপহাস করছে করতে দিন। এর ফলে আমরা সওয়াব পেয়ে থাকি, আর তাদের গোনাহ হয়। এতে আমাদের তো কোনো ক্ষতি নেই। বরং উপকার রয়েছে।

হযরত ইমাম আ'মাশ রহ. উত্তরে বললেন-

نَسْلَمُ وَيَسْلَمُوْنَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ نُوْجَرَ وَيَأْثَمُوْنَ

আরে ভাই! আমরা সওয়াব লাভ করি, আর তাদের গোনাহ হোক, তার থেকে তারাও গোনাহ থেকে বাঁচুক আর আমরাও গোনাহ থেকে বাঁচি এটা উত্তম। আমার সাথে যাওয়া তো কোনো ওয়াজিব-ফরয নয়। না গেলে কোনো ক্ষতিও নেই। তবে এই লাভ রয়েছে যে, মানুষ এ গোনাহ থেকে রক্ষা পাবে। এ জন্যে আগামীতে আমার সঙ্গে বাজারে যাবে না।

এটা হলো দ্বীনের বুঝ। বাহ্যত ছাত্রের কথাই সঠিক মনে হচ্ছিলো যে, মানুষ উপহাস করলে করুক। কিন্তু সৃষ্টিজীবের প্রতি যার স্নেহের দৃষ্টি রয়েছে, সে মানুষের ভুলের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয় না। সে বরং চিন্তা করে যে, যদ্দুর সম্ভব মানুষকে গোনাহ থেকে রক্ষা করি। এটা উত্তম। এ জন্যে তিনি বাজারে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। মোটকথা, যেখানে মানুষের অধিক হঠকারিতা প্রদর্শনের আশঙ্কা থাকে, সেখানে কিছু না বলা উত্তম।

হযরত আলী রাযি.-এর উক্তি

হযরত আলী রাযি.-এর এই উক্তি স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেন-

كَلِّمُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ، أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ

'যখন কারো সামনে দ্বীনের কথা বলবে, তখন এমন আঙ্গিকে বলবে যেন মানুষের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টি না হয়। তোমরা কি পছন্দ করো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হোক?'[১]

যেমন, অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে দ্বীনের কোনো কথা বললো, যার ফলে মিথ্যারোপ করা হলো। এমন ক্ষেত্রে দ্বীনের কথা বলা ঠিক নয়।

---

১. আল মুর্তাযাঃ ২৮৭, নাহজুল বালাগাহর উদ্ধৃতিতে, কোনো কোনো কিতাবে উক্তিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহইয়াউল উলূম লিল গাযালী, খণ্ডঃ ১, পৃ. ৩৯, রূহুল মা'আনী, খণ্ডঃ ২২, পৃ. ১৬০, মানাহিলুল ইরফান, খণ্ডঃ ২, পৃ. ৬৬ দ্রষ্টব্য

মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আজ কোন্ মুসলমান অবগত নয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাবলীগ ও দ্বীন দাওয়াতের জযবা তাঁর সিনার মধ্যে ভরে দিয়েছিলেন। যেখানে বসতেন, দ্বীনের কথা শুরু করে দিতেন এবং দ্বীনের পয়গাম পৌছাতেন। তাঁর একটি ঘটনা কেউ শুনিয়েছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে আসা-যাওয়া করতো। দীর্ঘ দিন আসতে থাকে। লোকটির দাড়ি ছিলো না। যখন তার আসা-যাওয়া দীর্ঘ দিন হয়ে গেলো, তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. চিন্তা করলেন যে, এ লোক তো এখন আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে, সুতরাং একদিন তিনি লোকটিকে বললেন- ভাই ছাহেব! আমার মন চায় তুমিও দাড়ির সুন্নাতের উপর আমল করো। লোকটি তাঁর কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হলো এবং পরের দিন থেকে আসা বন্ধ করে দিলো। যখন কয়েকদিন অতিবাহিত হলো, তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. লোকদেরকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা জানালো, সে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর খুব আক্ষেপ হলো। তিনি লোকদেরকে বললেন- আমার চরম ভুল হয়েছে। আমি কাঁচা তাওয়ায় রুটি দিয়েছি। অর্থাৎ তাওয়া গরম হয়ে উপযুক্ত হওয়ার আগেই আমি রুটি দিয়েছি। যার ফল এই হয়েছে যে, সে ব্যক্তি আসাই ছেড়ে দিয়েছে। সে যদি আসতে থাকতো তাহলে কমপক্ষে দ্বীনের কথা তার কানে ঢুকতো। ফলে তার উপকার হতো। বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলবে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজ করতে থাকলে তাকে মৌখিকভাবে বলে দাও। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যদি হাত দ্বারা মন্দ কাজে বাধা দিতে না পারো তবে মুখে বলে দাও।[১] কিন্তু আপনারা দেখলেন- মুখে বলা ক্ষতির কারণ হলো। কারণ, এখনও তার মস্তিষ্ক এর জন্যে প্রস্তুত হয়নি। এগুলো হিকমতের কথা যে, কখন কোন্ কথা বলতে হবে, কীভাবে বলতে হবে

---

১. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০০৩, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১০৬৫১

এবং কতোটুকু বলতে হবে? দ্বীনের কথা কোনো পাথর নয় যে, তা তুলে ছুঁড়ে মারলো বা এমন কোনো দায়িত্ব নয় যে, মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে ফেললো। বরং এটা লক্ষ্য করুন যে, এটা বলার ফল কী হবে? কোনো খারাপ ফল হবে না তো? যদি কথা বলার দ্বারা খারাপ ফল হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে ঐ সময় দ্বীনের কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। ঐ সময় কথা বলা উচিত নয়। এটাও সক্ষম না হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা

মোটকথা, কোন্ মুহূর্তে কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, কোন্ সময় কঠোরতা করবে, আর কোন্ সময় নম্রতা অবলম্বন করবে, এ বিষয় সোহবত অবলম্বন করা ছাড়া শুধু কিতাব পড়ার দ্বারা লাভ হয় না। যে পর্যন্ত কোনো আল্লাহ ওয়ালা মুত্তাকী বুযুর্গের সঙ্গে থেকে মানুষ ঘষা-মাজা না খায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ যোগ্যতা লাভ হয় না। তাই অন্য মানুষ যখন কোনো ভুল করে, তখন অবশ্যই তাকে ধরা এবং বলা উচিত। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে ধরা ফরয এবং কোন্ ক্ষেত্রে ফরয নয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে কীভাবে কথা বলা উচিত তা জানা এবং মেনে চলা জরুরী। এগুলো হলো দাওয়াত ও তাবলীগের বিধি-বিধানের সারকথা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর সঠিক বুঝ দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের এবং সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনের সংশোধন করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

জিহাদ এবং দাওয়াত ও তাবলীগ *

জিহাদের সংজ্ঞা

'জিহাদে'র শাব্দিক অর্থ শ্রম-সাধনা। আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের জন্যে যে কোনো শ্রম-সাধনাই আভিধানিক অর্থে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় ঐ কাজকে, শত্রু বা কাফেরের মোকাবেলায় যা করা হয়। শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করেছে আর আমরা তা প্রতিহত করছি, বা আমরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে কোনো শত্রুর উপর আক্রমণ করছি, উভয়টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়টাই শরীয়তসম্মত।

খ্রিস্টানদের চরম পরাজয়

আপনাদের জানা আছে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত খ্রিস্টজগত মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলো। মুসলমানগণ আরবদেশের বাইরে পদার্পণ করলে তাদের সর্ব প্রথম মোকাবেলা হয় রোম সম্রাট কায়সারের সঙ্গে। রোম সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে চরম ক্ষতির মুখোমুখি হয়। যার ফলে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের শত্রু হয়ে যায়। পরিণতিতে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে ক্রুশেড (ক্রুশ-যুদ্ধ) অব্যাহত থাকে। এসব যুদ্ধে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী, নুর উদ্দীন যঙ্গী ও ইমাদুদ্দীন যঙ্গী রহ. খ্রিস্টানদেরকে আঘাতের পর আঘাত করে পরাস্ত করেন।

ক্রুশেড যুদ্ধসমূহ

আমাদের ধর্মে 'জিহাদ' একটি ইবাদত। জিহাদে শহীদ হওয়া বা জিহাদে অংশ গ্রহণ করায় কুরআন ও হাদীসে অনেক সওয়াব ও

---

* তাকরীরে তিরমিযী : খণ্ড-২, পৃ: ১৯৯-২১৬

পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে। সেই বিরাট সওয়াব ও পুরস্কার অর্জনের জন্যে মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে জিহাদ ইবাদত নয়। বরং তাদেরকে ইঞ্জিলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে তাহলে তুমি তোমার অপর গালটি পেতে দাও। এ কারণে তাদের ধর্মে যুদ্ধ-জিহাদের কোনো ধারণা নেই। কিন্তু যখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধপরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন তারাও জিহাদের মোকাবেলায় 'ক্রুসেড' তথা 'ক্রুশ যুদ্ধ' ও 'পবিত্র যুদ্ধ' ইত্যাদি পরিভাষা নির্ধারণ করে। তাদের ধর্ম গুরু 'পোপ' খ্রিস্টজগতে ঘোষণা দেয় যে, এত দিন তো আমরা বলেছি- কেউ এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দিও, কিন্তু এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করা হবে তাও ক্রুসেড তথা পবিত্র যুদ্ধ বলে গণ্য হবে। সাথে এ ঘোষণাও দেয় যে, যে ব্যক্তি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে সে তো পবিত্র হবেই, কেউ যদি এ যুদ্ধে চাঁদা দেয় তাহলে চাঁদার বাক্সে টাকা পড়ার আগেই সে জান্নাতের হকদার হবে। এ ধরনের ঘোষণা দেয়ার পর ক্রুশেড যুদ্ধের সূচনা হয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। কিন্তু কখনোই উন্মুক্ত ময়দানে তারা বড় ধরনের বিজয় লাভ করেনি, বরং যখনই মোকাবেলায় নেমেছে পরাজয় বরণ করেছে।

বায়েজীদ ইয়ালদারূমের বিস্ময়কর ঘটনা

সেই ক্রুশেড যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা লিখেছে যে, বায়েজীদ ইয়ালদারূম নামে তুরস্কের একজন বাদশাহ ছিলেন। তুর্কী ভাষায় 'ইয়ালদারূম' বলে বজ্র ও বিদ্যুতকে। বাস্তবিকই তিনি শত্রু পক্ষের জন্যে বজ্রের চেয়ে কম ছিলেন না। একবার ইউরোপের ষাটটি রাজ্য তার উপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। যে ষাটটি রাজ্য আক্রমণে অংশ নিয়েছিলো, তারা তাদের শাহাজাদাদেরকেও এ যুদ্ধে প্রেরণ করে। ইউরোপের ষাটজন শাহজাদা নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে আসে এবং বায়েজীদ ইয়ালদারূমের উপর আক্রমণ করে বসে। বায়েজীদ ইয়ালদারূম তাদের সবাইকে শুধু পরাজিতই করেননি, বরং সেই ষাটজন শাহজাদাকে জীবিত বন্দী করেন। তারপর শাহজাদাদেরকে সসম্মানে তাবুর মধ্যে রাখেন। কিছু দিন পর তিনি

তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন- 'বলো! আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করবো?' তারা বললো- আমরা আপনার কাছে বন্দী। আপনি বিজয়ী, আমরা পরাজিত। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। চাইলে হত্যা করতে পারেন। চাইলে দাস বানিয়ে রাখতে পারেন। বায়েজীদ ইয়ালদারম বললেন- আমি তোমাদেরকে একটি শর্তে ছেড়ে দেবো। শর্তটি এই যে, তোমরা আমার সঙ্গে ওয়াদা করবে, তোমরা সকলে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে পুরো বছর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। তারপর আগামী বছর সবাই মিলে পুনরায় আমার উপর আক্রমণ করবে। তোমরা যদি এই ওয়াদা করো, তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে দেবো। অন্যথায় ছাড়বো না।

বায়েজীদ ইয়ালদারমের বন্দিত্ব ও মৃত্যু

তিনি এমন মুজাহিদ ব্যক্তি ছিলেন! ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানদের তিনি দাঁত চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী উপায়ে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেছিলেন এবং বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছেছিলেন। কিন্তু পিছন থেকে তৈমুর লং আক্রমণ করায় তিনি অবরোধ উঠিয়ে আনতে বাধ্য হন। তৈমুর লং আক্রমণ করে বায়েজীদ ইয়ালদারমকে পরাজিত করেন এবং খাঁচায় বন্দী করে নিয়ে যান। অবশেষে তিনি ঐ খাঁচার মধ্যেই মৃত্যু বরণ করেন।

যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানগণ কখনোই পরাজয় বরণ করেনি

মোটকথা, ঐ সমস্ত ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের হাতে অনেক মার খায় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের চরম শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ক্রুশেড যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে না পেরে পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তারা দেখে যে, যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরকে পরাজিত করা কঠিন। তাই অন্যান্য উপায়ে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার চেষ্টা করে। তারা মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, তার মধ্যে নিজেদের চিন্তা-চেতনা ঢুকিয়ে দেয়।

ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেছে?

তারা প্রোপাগান্ডা ছাড়ায় যে, তরবারীর জোরে মানুষকে মুসলমান বানানোর জন্যে জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে। হয় মুসলমান হয়ে যাও, নয় মেরে ফেলবো! জিহাদ মূলত জোরপূর্বক ইসলাম প্রচারের একটি উপায়। এ বিষয়টিকে তারা এভাবে বলে যে, 'ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে।' মানুষ ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস মেনে নিয়ে মুসলমান হয়নি। খুব জোরে-শোরে এ প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়।

অথচ এ প্রোপাগান্ডার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, খোদ কুরআনেই ইরশাদ হয়েছে-

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।'[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

'এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরী করুক।'[২]

দ্বিতীয় কথা হলো, জিহাদের উদ্দেশ্য যদি জোর-জবরদস্তি করে মানুষকে মুসলমান বানানো হয়, তাহলে 'জিযিয়া' দেয়ার ও গোলাম বানানোর ব্যবস্থা কেন থাকবে? যদি মুসলমান না হও তাহলে 'জিযিয়া' পরিশোধ করো, আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো না। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, 'জিযিয়া' দেয়ার ব্যবস্থা থাকাই বলে দেয়, জিহাদের দ্বারা মানুষকে জোর-জবরদস্তি মুসলমান বানানো উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানদের পুরো ইতিহাসে এর নজির নেই যে, মুসলমানগণ কোনো এলাকা জয় করার পর সেখানকার লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে মুসলমান হতে বাধ্য করেছে। বরং তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর ছেড়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে, যারা মুসলমান হয়েছে, সেই দাওয়াতের ফলেই হয়েছে। আর যারা মুসলমান হয়নি, তাদেরকেও সেসব নাগরিক অধিকার দেয়া হয়েছে, যা দেয়া হয়েছে

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬
২. সূরা কাহাফ, আয়াত ২৯

একজন মুসলমানকে। তাই তরবারীর জোরে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে বা জিহাদের উদ্দেশ্য মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো, এ কথার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই।

জিহাদের উদ্দেশ্য কী?

এখন প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে জিহাদের উদ্দেশ্য কী? ভালো করে বুঝুন! জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, কুফুরী শক্তিকে চূর্ণ করা, ইসলামী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আল্লাহর কালিমাকে সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে ঠিক আছে, কোরো না, তুমি জানো আর তোমার খোদা জানে। আখেরাতে তুমি শাস্তি পাবে। কিন্তু তোমরা নিজেদের কুফুরী ও অন্যায়-অবিচারমূলক আইন আল্লাহর জমিনে জারি করবে। আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখবে। জুলুম-অত্যাচার করবে। তাদের উপর আল্লাহর আইন বিরোধী এমন কোনো আইন চালু করবে, যেসব আইন দ্বারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। আমরা তোমাদেরকে সে অনুমতি দেবো না। তাই হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা নিজেদের ধর্মের উপর থেকে 'জিযিয়া' প্রদান করো। 'জিযিয়া' দেয়ার অর্থ হলো, আমাদের ও আমাদের আইনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া। কারণ, তোমরা যে আইন চালু করেছো, তা মানুষকে মানুষের গোলাম বানানোর আইন। এমন আইন আমরা চালু রাখতে দেবো না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনই বলবৎ থাকবে। আল্লাহর কালিমাই সমুচ্চ থাকবে। এটা হলো, জিহাদের উদ্দেশ্য।

এটা বলা হয় না যে, তোপের জোরে কী বিস্তার করা হয়েছে?

আকবর এলাহবাদী বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি পশ্চিমাদের আপত্তির উত্তরে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। পশ্চিমারা আপত্তি করে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই চর্তুপদী রচনা করেছেন-

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے
غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے

یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

অর্থাৎ, আপত্তি করা হয় যে, তরবারীর জোরে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু তোমরা তোপের জোরে সারা বিশ্বে কী চাপিয়ে দিয়েছো, তা বলো না। তোমরা সারা বিশ্বে তোপের জোরে নগ্নতা, অশ্লীলতা, চরিত্রহীনতা ছড়িয়েছো। ধরে নিলাম, ইসলাম যদি তরবারীর জোরেই বিস্তার লাভ করে থাকে, তবে তার মাধ্যমে তো নেকী, পরহেযগারী, সততা ও সতীত্বই বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে তোমরা অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা ছড়িয়েছো।

স্বঘোষিত সংস্কারকদের নিকট জিহাদ শুধু প্রতিরক্ষামূলক

ইংরেজদের আধিপত্যের সময় থেকে আমাদের সমাজে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে, পশ্চিমারা ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করলেই সে শ্রেণীর লোকেরা পশ্চিমাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলে যে, হুজুর! আপনাদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমাদের ধর্মে এমন কথা নেই। এতে তারা ক্ষমা চাওয়ার একটা পরিবেশ তৈরি করে।

এরপর যখন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে এই প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয় যে, ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে, তখন বিশেষ এই শ্রেণী বলতে আরম্ভ করে যে, ইসলামে যেই জিহাদের বিধান রয়েছে, তা কেবল প্রতিরক্ষার জন্যে। অর্থাৎ শত্রু পক্ষ আমাদের উপর আক্রমণ করলে কেবল তখনই আমরা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ করি। এগিয়ে গিয়ে কোনো জাতির উপর আক্রমণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এ কথার অর্থ হলো, কেউ আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমরা তাদেরকে আঘাত করবো, আর আঘাত না করলে তাদের সঙ্গে জিহাদ করা এবং তাদের উপর আক্রমণ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না। যেন তাদের ভাষায় প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয এবং আক্রমণাত্মক জিহাদ নাজায়েয।

তারা তাদের এ অবস্থানকে সাব্যস্ত করার জন্যে কুরআনের আয়াত দ্বারা ভুলভাবে প্রমাণ পেশ করে থাকে। যেমন তারা এ আয়াত তুলে ধরেছে-

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

'যাদের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে (যে, তারা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করবে।) কারণ, তাদের উপর অবিচার করা হয়েছে।'[১]

দেখো! এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, যাদের সঙ্গে অন্যেরা যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং যাদের উপর অবিচার করা হবে, তাদের জন্যে যুদ্ধ ও লড়াই করার অনুমতি রয়েছে। অন্যদের জন্যে নেই। এমনিভাবে এ আয়াতও তারা তুলে ধরে-

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

'আল্লাহর পথে তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করো, যারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে।'[২]

এসব আয়াতে অগ্রগামী হয়ে আক্রমণ করা এবং জিহাদ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এসব আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে তারা বলে যে, জিহাদ মূলত প্রতিরক্ষার জন্যে বিধিসম্মত হয়েছে। যখন মুশরিকরা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে বা জুলুম করবে, প্রতিউত্তরে তোমরা জিহাদ ও কিতাল করবে। পক্ষান্তরে মুশরিকরা যদি তোমাদের উপর আক্রমণ না করে বা তোমাদের উপর জুলুম-অত্যাচার না করে তাহলে জিহাদ করার অনুমতি নেই।

জিহাদের বিধান ক্রমান্বয়ে এসেছে

কিন্তু এটি এমন একটি উক্তি, যা চৌদ্দশ' বছর পর্যন্ত উম্মতের কোনো ফকীহ গ্রহণ করেননি যে, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয এবং আক্রমণাত্মক জিহাদ জায়েয নয়। মূলত জিহাদের বিধান ক্রমান্বয়ে

---

১. সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯
২. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০

কয়েক ধাপে এসেছে। সর্ব প্রথম ধাপ এই যে, মক্কার জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তরবারী উত্তোলন করতে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করা হয়েছিলো। বরং সবর করার হুকুম করা হয়েছিলো। কেউ তোমাদেরকে কষ্ট দিলে প্রতিউত্তরে তোমরা কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে না। মক্কার জীবনে কোনো প্রকার জিহাদই বিধিসম্মত ছিলো না। এরপরে আসে দ্বিতীয় ধাপ। এতে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু ফরয করা হয়নি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

'যাদের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে (যে, তারা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করবে।) কারণ, তাদের উপর অবিচার করা হয়েছে।'[১]

এ আয়াতে জিহাদ ও কিতালের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই শর্তে যে, যখন অন্য কেউ তোমাদের উপর জুলুম করবে বা হত্যা করবে, তখন প্রতিউত্তরে তোমাদের জন্যে লড়াই করা জায়েয।

আক্রমাণাত্মক জিহাদও জায়েয

তারপর আসে তৃতীয় ধাপ। যখন প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের অনুমতি দিয়ে এ আয়াত নাযিল হয়-

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

'আল্লাহর পথে তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে।'[২]

তারপর চতুর্থ ধাপে এই হুকুম দেয়া হয় যে-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

'তোমাদের প্রতি (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়।'[৩]

---

১. সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯

২. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০

৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬

এ আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এখন আক্রমণাত্মক লড়াইও করতে হবে। শুধু প্রতিরক্ষার মধ্যেই লড়াই সীমাবদ্ধ নয়। তারপর সূরায়ে তাওবার এ আয়াত নাযিল হয়-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

'অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে (যারা তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো) যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্যে প্রত্যক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে।'[১]

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আলী রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পয়গাম মানুষের মাঝে পৌছান যে, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, তাদেরকে চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত সময় দেয়া হচ্ছে। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি নেই, তাদেরকে চার মাসের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তারা চার মাসের ভিতর আরব উপদ্বীপ খালি করে চলে যাবে, তা না হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো।

মোটকথা, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আক্রমণাত্মক জিহাদও জায়েয হয়ে যায়। এখন যদি কেউ ইসলামের শুরুর দিকের আয়াতসমূহ নিয়ে ফায়সালা দেয় যে, জিহাদ তো জায়েযই নেই। মুশরিকরা কষ্ট দিলে মুসলমানদেরকে তো সবর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- বলা বাহুল্য যে, তা ভুল হবে। ঠিক একইভাবে যদি কেউ শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক আয়াতসমূহ গ্রহণ করে বলে, মুসলমানদের জন্যে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয, আক্রমণাত্মক জিহাদ জায়েয নয়। এটাও ঠিক নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ভুল। মূলত আক্রমণাত্মক জিহাদও জায়েয।

দ্বীনদার শ্রেণীর একটি ভ্রান্ত ধারণা ও তার অপনোদন

এ তো হলো স্বঘোষিত সংস্কারকদের কথার বিস্তারিত উত্তর। যারা পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলে যে, ইসলামে শুধু প্রতিরক্ষামূলক

---

১. সূরা তাওবা, আয়াত ৫

জিহাদ জায়েয, আক্রমণাত্মক জিহাদ জায়েয নয়। স্বঘোষিত সেসব সংস্কারকদের ছাড়া শিক্ষিত দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যেও আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা পাওয়া যায়। যা ক্রমে খুব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। আমাদের তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা এ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হচ্ছেন। এ কারণে সে বিষয়েও আলোকপাত করতে চাচ্ছি।

সেই ভ্রান্ত ধারণা এই যে, জিহাদ শুধুমাত্র তখন এবং তাদের সঙ্গে শরীয়তসম্মত, যখন কোনো জাতি দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক হবে। যেন আসল উদ্দেশ্যই হলো দাওয়াত। দাওয়াত বিস্তারের পথে কোনো দেশ যদি প্রতিবন্ধক হয় এবং সে দেশ দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি না দেয়, তখন জিহাদ শরীয়তসম্মত। পক্ষান্তরে কোনো দেশ যদি অনুমতি দেয় যে, এখানে এসে দাওয়াতের কাজ করো। তাবলীগ করো। তাহলে তাদের সঙ্গে জিহাদ করা শরীয়তসম্মত নয়। এ কথা তো আগে শুধু স্বঘোষিত সংস্কারকরা বলতো। এখন শিক্ষিত দ্বীনদার শ্রেণীর লোক এবং তাবলীগ জামাতের লোকেরাও বলতে আরম্ভ করেছে। আগে তো শুধু মানুষের মুখে মুখে শুনেছি। কিন্তু এখন রীতিমতো লেখাও দেখেছি। তাই এ কথা বলছি। জিহাদের হাকীকত না বোঝার ফলেই এরূপ কথা বলা হচ্ছে।

কোনো কাফের রাষ্ট্র তাদের দেশে তাবলীগের অনুমতি দিয়েছে, তাই এখন আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করা উচিত নয়- এটি মারাত্মক আশঙ্কাজনক কথা। শুধু তাবলীগের অনুমতি দেয়ার দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য পুরা হয় না। কারণ, জিহাদের উদ্দেশ্য কুফুরী শক্তিকে চূর্ণ করা এবং আল্লাহর কালিমাকে সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কুফুরী শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন-মগজ হক কবুল করার জন্যে উন্মুক্ত হবে না। এটা একটা মূলনীতি যে, কোনো জাতির রাজনৈতিক শক্তি ও তাদের প্রতিপত্তি যখন মানুষের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন তাদের কথা মানুষের তাড়াতাড়ি বুঝে আসে এবং তাদের বিরুদ্ধ কথা মানুষের অন্তরে সহজে ঢোকে না। চাইলে পরীক্ষা করে দেখুন। সুতরাং আজ পশ্চিমা বিশ্বের সুস্পষ্ট ভ্রান্ত কথা যে মানুষ শুধু শোনে তাই নয়, বরং তা গ্রহণ করে এবং সে অনুপাতে কাজও

করে। কেন? কারণ সারা পৃথিবীতে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। তাদের চিন্তা-দর্শন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। এমতাবস্থায় কোনো পশ্চিমা দেশে যদি তাবলীগ জামাত যায়, আর ঐ দেশ তাদেরকে ভিসা দেয় এবং তাবলীগ করার অনুমতি দেয়, শুধু এতোটুকুর দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য লাভ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শক্তি না ভাঙবে, তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত না হবে এবং মানুষের অন্তরে আচ্ছন্ন তাদের প্রভাব অপসারিত না হবে। এ শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব ততোক্ষণ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে লড়াই করা না হবে। তাই এরূপ বলা যে, কোনো দেশ যদি তাবলীগের অনুমতি দেয় তাহলে তাদের সঙ্গে জিহাদের প্রয়োজন নেই, এতেই জিহাদের উদ্দেশ্য লাভ হয়েছে- এটা অনেক বড় ধোঁকা।

জিহাদ অস্বীকারকারী কাফের

এখন প্রশ্ন জাগে যে, কোনো ব্যক্তি বা দল যদি অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে এবং শুধু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের প্রবক্তা হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এই দল বা ব্যক্তির অবস্থান কী? তাদেরকে কাফের বা গোমরাহ বলা কি ঠিক হবে?

আমি তো উপরে বলেছি যে, এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে ভুল যে, জিহাদ শুধু প্রতিরক্ষার জন্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বা দল এর প্রবক্তা হবে, তাদের কাফের হওয়ার ফতওয়া দেয়াও কঠিন। কারণ, কাউকে কাফের বলার ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা জরুরী। তাই যে ব্যক্তি বা দল জিহাদকেই অস্বীকার করবে তাদের উপর নিঃসন্দেহে কাফের হওয়ার ফতওয়া দেয়া হবে। কারণ, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি 'জরুরিয়াতে দ্বীন'-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি বা দল প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে স্বীকার করে, আর আক্রমণাত্মক জিহাদের বৈধতাকে অস্বীকার করে, তারা আক্রমণাত্মক জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের 'তাবীল' করে। অর্থাৎ ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। আর 'তাবীলকারী'কে কাফের সাব্যস্ত করা হয় না। তাই তাদেরকেও কাফের বলা হবে না। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। আর এটা শুধু ইজতিহাদী মতবিরোধ নয়, বরং হক ও বাতিলের

বিরোধ। আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলা হবে যে, তারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, হকের উপর নয়, তবে কাফের হওয়ার ফতওয়া দেয়া হবে না।

ইসলামের উপর 'রক্তপিপাসু ধর্ম' হওয়ার অভিযোগ কেন?

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে যে, পশ্চিমারা জিহাদের সুবাদে ইসলামের উপর সবচেয়ে বড় অপবাদ দিয়েছে যে, ইসলাম একটি রক্তপিপাসু ধর্ম। এ আপত্তি ও অপবাদ তো তখন ওঠার কথা ছিলো, যখন মুসলমানগণ জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে রেখেছিলো। তখন বাস্তবেই দুনিয়াবাসীর অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারতো যে, মুসলমানদের বিজয় পদক্ষেপ হয়তো বা কোনো রক্তপাত ঘটানোর উপদেশমূলক শিক্ষার প্রতিফল। কিন্তু আজ যখন মুসলমানগণ সবদিক থেকে পরাজিত ও পতনমুখী, এমন সময় এ ধরনের অপবাদ দেয়ার পিছনে ধর্মহীন গোষ্ঠীকে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে?

আসল কথা হলো, বর্তমানে মুসলমানগণ যদিও দুর্বল, কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস বলে, আল্লাহ তা'আলা যখনই তাদেরকে একটু মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে, তখনই তারা শত্রুর নাকে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে। তাদের সংকল্প বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। যেসব শক্তি বর্তমান বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করে আছে, তারা যদিও দেখছে যে, মুসলমানগণ বর্তমানে দুর্বল। কিন্তু তারা সবসময় ভীতিকর স্বপ্ন দেখতে থাকে যে, এই ঘুমন্ত সিংহ যদি কোনো সময় জেগে যায়, আমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে। এই পশ্চিমা শক্তি যদিও মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাদের দমন করে রাখার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি গল্প আছে যে, এক দুর্বল ব্যক্তি কিছু কৌশল আত্মস্থ করে এক পালোয়ানকে ধরাশায়ী করে তার বুকের উপর উঠে বসে কাঁদতে আরম্ভ করে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কাঁদছো কেন? সে উত্তর দিলো- 'এই পালোয়ান এখন উঠে আমাকে মারবে। এ কথা চিন্তা করে কাঁদছি।' পশ্চিমাদের অবস্থাও তাই। শক্তির জোরে তো তারা মুসলমানদের ধরাশায়ী করতে পারেনি। কিন্তু কৌশলের মাধ্যমে এভাবে ধরাশায়ী করেছে যে, মুসলমানদের মাঝে তারা বিরোধ

সৃষ্টি করে রেখেছে, তাদেরকে শতধা বিভক্ত করে রেখেছে এবং ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে যে, তাদের মাঝে যেন ঐক্য সৃষ্টি হতে না পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু একই সাথে পশ্চিমারা এ জন্যে অস্থির যে, কোনো সময় যদি মুসলমানদের চেতনা ফিরে আসে এবং তারা একতাবদ্ধ হয়, তাহলে আমাদের পরিণতি খারাপ করে ছাড়বে।

জিহাদের তিনটি শর্ত

একজন ছাত্র প্রশ্ন করেছে যে, নববী যুগের প্রথম তেরো বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, তখন পারিভাষিক অর্থে জিহাদ বিদ্যমান ছিলো না। ধৈর্য ও সাধনার পর সাহাবায়ে কেরামের আমল আখলাক যখন পরিচ্ছন্ন হয়, তখন পরবর্তী মাদানী জীবনে এসে জিহাদ ও কিতালের ধারা আরম্ভ হয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে, বর্তমান যুগের মুসলমানগণ যেহেতু আত্মশুদ্ধির সেই পর্যায়ে উপনীত নয়, তাই এমতাবস্থায় জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধির দিকে মনোযোগ আরোপ করা উচিত নয় কি?

প্রশ্নটি খুবই সুন্দর। মূলত আক্রমণাত্মক যেই জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা মৌলিক তথা নীতিগত। কিন্তু আক্রমণাত্মক জিহাদের জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে। ঐ শর্তগুলো না পাওয়া পর্যন্ত সেই জিহাদ যে শরীয়তসম্মত হবে না শুধু তাই নয়, বরং ক্ষতিকরও হতে পারে। সেসব শর্তের অন্যতম হলো, তা জিহাদ 'ফী সাবীলিল্লাহ' হতে হবে, 'ফী সাবীলিন নাফ্স' না হতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর কালিমাকে সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হতে হবে। কিন্তু কেউ যদি এ জন্যে জিহাদ করে যে, আমার খ্যাতি লাভ হবে। মানুষ আমাকে মুজাহিদ ও বাহাদুর বলবে। আমার প্রশংসা করা হবে। বলা বাহুল্য যে, তা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' হবে না, বরং তা হবে 'জিহাদ ফী সাবীলিন নাফ্স। এ জন্যে জিহাদের একটি অবশ্যম্ভাবী শর্ত হলো, আত্মশুদ্ধি থাকা। আত্মশুদ্ধির পরে যদি জিহাদ করে, তবে তা হবে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

শরীয়তসম্মত জিহাদের এটাও একটা শর্ত যে, তাদের একজন আমীর থাকতে হবে এবং সেই আমীরের ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য হতে

হবে। যদি সর্বসম্মত আমীর না থাকে, তার ফল এই হবে যে, জিহাদের পর নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে যাবে। বর্তমানে যেমন আফগানিস্তানে হচ্ছে। কারণ, আমীর না থাকার কারণে জিহাদের সুফল লাভ হয় না। এ জন্যে একজন সর্বসম্মত আমীর থাকা জরুরী।

জিহাদের আরেকটি শর্ত এই যে, জিহাদ ও লড়াই করার শক্তিও থাকতে হবে। কারণ, শক্তি অর্জন না করে জিহাদ করা এমনই, যেমন নিজের মাথায় নিজে আঘাত করা। এ জন্যে শক্তি অর্জন না করে জিহাদ করা জায়েয নেই। তাই এ তিন অবস্থা থাকা পর্যন্ত এগুলো অর্জনের চেষ্টা করাই জিহাদ। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিও থাকতে হবে, আমীরের সন্ধান করতে হবে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। এই তিন জিনিস যখন পাওয়া যাবে, তখন জিহাদ আরম্ভ করতে হবে।

জিহাদের বিষয়ে তাবলীগ জামাতের অবস্থান

একজন তালিবে ইল্‌ম প্রশ্ন করেছে যে, তাবলীগ জামাতের কোন্ কিতাব বা লেখনী দ্বারা জানা যায় যে, তারা আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে? উলামায়ে কেরাম কি তাবলীগ জামাতের আলেম ও আমীরদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন?

আসল কথা এই যে, তাবলীগ জামাতের বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষ আমার কাছে এসে অনেক কিছু বর্ণনা করে থাকে যে, তাবলীগ জামাতের অমুক ব্যক্তি বয়ানের মধ্যে এ কথা বলেছে এবং এ কথাও বলেছে যে, বর্তমান সময়ে যতো জায়গায় জিহাদ হচ্ছে- কশ্মীরে হোক বা বসনিয়ায়- তা শরীয়তসম্মত জিহাদ নয়। আসল জিনিস তো হলো দাওয়াত। মানুষ এ ধরনের কথা আমার নিকট এসে বর্ণনা করতো। কিন্তু যেহেতু বর্ণনা করার মধ্যে ভুল হওয়ার ও ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে- যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি নিজে শোনা না হয়- এ কারণে এসব কথাকে আমি কখনোও তাবলীগ জামাত বা জামাতের মুরুব্বীদের দিকে সম্পৃক্ত করি না। তবে তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীদের সাথে যখনই সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছে তাদেরকে এসব বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক করেছি যে, এসব কথা শুনতে পাই, আপনারা যাচাই করুন। যদি সঠিক হয় তাহলে এগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা নিন।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তাবলীগ জামাতের একজন বড় মুরুব্বী এবং সম্মানিত বুযুর্গ- যাকে আমি খুব সম্মান করে থাকি- তার একটি চিঠি পড়ার সুযোগ আমার হয়। চিঠিটি তিনি এক ব্যক্তির নামে লিখেছেন। যার নামে এটা লেখা হয়েছিলো সে আমার কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। চিঠির পুরো বক্তব্য এই কেন্দ্রিক যে, বর্তমান যুগে জিহাদের দিকে মনোযোগ দেয়া, জিহাদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা বা জিহাদের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। বরং জিহাদ তো মূলত দাওয়াতের পথকে সুগম করার জন্যে। দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত থাকলে শুধু যে জিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই তাই নয়, বরং তা ক্ষতির কারণ। সাথে এ কথাও লিখেছেন যে, বিষয়টি এখনও মানুষের বুঝে আসছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে আলেমদেরও বুঝে আসবে। এ চিঠি দ্বারা জানা যায় যে, তাবলীগ জামাতের লোকদের দিকে সম্বন্ধ করে যেসব কথা মানুষ বর্ণনা করেছে, সেগুলো পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়, বরং ক্রমান্বয়ে এ ধরনের চিন্তা জন্ম নিচ্ছে। এরপর আর এ বিষয়ে চুপ থাকা যায় না। তাই এ বিষয়ে আমি তাবলীগ জামাতের যাদের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে মৌখিকভাবেও আলোচনা করেছি এবং বড়দের পর্যন্তও এ কথা পৌছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থা নিয়েছি যে, যেসব কথা এখন হচ্ছে, তা খুবই আশঙ্কাজনক। চিঠিটি আমার কাছে আছে। কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারে।

তাবলীগ জামাত দ্বীনের বিরাট খেদমত করছে

আলহামদুলিল্লাহ! এসব কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য সংশোধন করা। তাবলীগ জামাত একা এমন একটি জামাত, যার কাজ দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ অন্তর সব সময় খুশি হয়। এই জামাত এত বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, যা অন্য কোনো জামাত দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা এ জামাতের মাধ্যমে দ্বীনের কালেমা বহুদূর পৌছিয়েছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব কু.সি. (আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন ,আমীন)-এর ইখলাস ও খাঁটি প্রেরণা এ জামাতকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। এ জামাতের পয়গাম ও দাওয়াতকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সহযোগিতা করা ও সতর্ক করা উভয়টিই প্রয়োজন

কিন্তু সবসময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো জামাত বিস্তার লাভ করা এবং তার পয়গাম দূর-দূরান্তে পৌছে যাওয়া, যদি সঠিক পদ্ধতিতে হয় তবে তা অভিনন্দনযোগ্য। এমতাবস্থায় ঐ জামাতের সহযোগিতা করা উচিত। তবে যদি ঐ জামাতের মধ্যে খারাপ দিক সৃষ্টি হতে থাকে বা ভুল চিন্তা-দর্শন সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে সহযোগিতা করার সাথে সাথে ভুল বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক করাও জরুরী। যাতে উৎকৃষ্টতম এ জামাত- যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এত বড় কাজ নিয়েছেন- ভুল পথে চালিত না হয়। বিশেষ করে এমন সময় সতর্ক করা আরো অধিক জরুরী হয়ে পড়ে, যখন তার নের্তৃত্ব পোক্ত আলেমের হাতে না থাকে। বরং জামাতের বেশির ভাগ সংগঠক হয় সাধারণ মানুষ, যাদের পুরোপুরি ইলম নেই। এ জামাতের মধ্যে যেসব আলেম রয়েছেন, তাদের কাজ এখন ইলম চর্চা নয়। কারণ, আলেমও দু'কিসিমের হয়ে থাকেন। কতক আলেম তো এমন- যারা দর্স, তাদরীস ও ফতওয়ার কাজে মশগুল। এই কিসিমের আলেমগণের ইলমের সঙ্গে মুনাসাবাত থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ঐ সমস্ত আলেম- যারা দর্স, তাদরীস ও ফতওয়ার মধ্যে মশগুল নন, তাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ইলম তো আছে, কিন্তু সে ইল্মকে ঘষামাজা করা হয়নি। এ কারণে এদের অন্তরে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর একটি ঘটনা

আমি আপনাদেরকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। একবার তিনি অসুস্থ হন। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. সে সময় কোনো এক কাজে দেওবন্দ থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. খুব অসুস্থ। তাই তাঁকে দেখার জন্যে তিনি নিযামুদ্দীন তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন- চিকিৎসকরা দেখা-সাক্ষাৎ নিষেধ করে দিয়েছেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব সেখানকার লোকদেরকে জানান- আমি দেখতে এসেছিলাম। অবস্থা জানতে পারলাম। দেখা-সাক্ষাৎ

যেহেতু ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন, তাই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। হযরত সুস্থ হলে শুধু এতোটুকু জানাবেন যে, আমি দেখা করতে এসেছিলাম এবং আমার সালাম পৌছাবেন। এ কথা বলে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বিদায় নিলেন।

কেউ একজন ভিতরে গিয়ে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব রহ.-কে বলেন যে, হযরত মুফতী ছাহেব এসেছিলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. মুফতী ছাহেবকে ডেকে আনার জন্যে পিছনে পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে দেন। লোকটি যখন হযরত মুফতী ছাহেবের নিকট গিয়ে বলে যে, মাওলানা আপনাকে ডাকছেন, তখন হযরত মুফতী ছাহেব বললেন- যেহেতু ডাক্তাররা দেখা করতে নিষেধ করেছেন তাই এমতাবস্থায় দেখা করা ঠিক নয়। লোকটি বললো- মাওলানা শক্তভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আপনাকে ডেকে নেয়া হয়। মুফতী ছাহেব বলেন- আমি তার সঙ্গে ফিরে গেলাম। হযরতের কাছে গিয়ে বসলাম। কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হযরত মুফতী ছাহেব বলেন- আমার মনে হলো, তিনি রোগ যন্ত্রণায় আছেন, এ জন্যে তাঁর মনে কষ্ট। তাই আমি সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বললাম। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব বললেন- আমি রোগ যন্ত্রণার জন্যে কাঁদছি না।

আমার এখন দু'টি চিন্তা ও দু'টি আশঙ্কা

আমি এ জন্যে কাঁদছি যে, আমার এখন দু'টি চিন্তা ও দু'টি আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণে আমি পেরেশান। তাই কাঁদছি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন- কী চিন্তা আপনার? হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব বললেন- প্রথম কথা হলো- জামাতের কাজ এখন দিন দিন বিস্তার লাভ করছে। আলহামদুলিল্লাহ! তার ভালো ফল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষ দলে দলে জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এখন আমার ভয় লাগছে যে, জামাতের এ সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইসতিদ্‌রাজ' নয় তো? 'ইসতিদ্‌রাজ' বলা হয়- কোনো ভ্রান্ত মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঢিল দেয়া। সে বাহ্যিকভাবে সফলতা লাভ করতে

থাকে, কিন্তু বাস্তবে তার কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমূলক হয় না। এতে অনুমান করে দেখুন যে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. কতো উঁচু স্তরের বুযুর্গ যে, তিনি 'ইসতিদ্‌রাজে'র ভয় করছেন!

এটা 'ইসতিদরাজ' নয়

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন- আমি সাথে সাথে নিবেদন করলাম- হযরত! আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এটা 'ইসতিদরাজ' নয়। মাওলানা বললেন- এটা যে 'ইসতিদরাজ' নয়, তার কী প্রমাণ তোমার কাছে আছে? হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন- এর প্রমাণ এই যে, যখন কারো সঙ্গে 'ইসতিদরাজে'র আচরণ করা হয়, তখন তার মন-মগজে ধারণাও হয় না যে, এটা 'ইসতিদরাজ'। এমনকি 'ইসতিদরাজ' হওয়ার কোনো সন্দেহও তার মনে জাগে না। আপনার যেহেতু 'ইসতিদরাজ' হওয়ার সন্দেহ জাগছে, এ সন্দেহই প্রমাণ যে, এটা 'ইসতিদরাজ' নয়। এটা যদি 'ইসতিদরাজ' হতো, তাহলে আপনার অন্তরে এর চিন্তাও কখনো জাগতো না। তাই আমি এ বিষয়ে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এটা 'ইসতিদরাজ' নয়। যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও দয়া। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন- আমার এ উত্তর শুনে মাওলানার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন- আলহামদুলিল্লাহ! তোমার এ কথায় আমার বড় প্রশান্তি লাগছে।

দ্বিতীয় চিন্তা

তারপর হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. বললেন- আমার দ্বিতীয় চিন্তা এই যে, তাবলীগ জামাতের কাজে সাধারণ মানুষ অধিকহারে যোগ দিচ্ছে। আলেমদের সংখ্যা কম। আমার আশঙ্কা হলো, সাধারণ মানুষের হাতে যখন নের্তৃত্ব আসে, তখন পরবর্তীতে অনেক সময় কাজটিকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই এমন না হয় যে, তাবলীগ জামাত কোনো ভুল পথে পরিচালিত হয়, আর তার আপদ আমার মাথায় আপতিত হয়। তাই আমার মন চায়, আলেমগণ অধিকহারে এ কাজে অন্তর্ভুক্ত হোন এবং তারা এর নের্তৃত্ব গ্রহণ করুন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন- আপনার এ চিন্তা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু আপনি তো নেক নিয়তে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ

করেছেন। পরবর্তীতে কেউ যদি তা নষ্ট করে তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার উপর তার দায়িত্ব বর্তাবে না। যাই হোক, এ কথা ঠিক যে, আলেমগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এর নের্তৃত্ব সামলানো উচিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর ঘটনা আমি ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট হতে বারবার শুনেছি। এ থেকে আপনারা অনুমান করুন, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেবের ইখলাস কতো উঁচু পর্যায়ের ছিলো এবং তার মনের ভাব ও আবেগ কেমন ছিলো!

তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করা মোটেই জায়েয নয়

কিন্তু এখন বাস্তবে অবস্থা এমন হয়েছে যে, এর নের্তৃত্ব বেশির ভাগ এমন ব্যক্তিদের হাতে রয়েছে, যাদের ইলমে পরিপক্কতা নেই। যে কারণে কোনো কোনো সময় কিছুটা ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এ সব ভারসাম্যহীনতার কারণে তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করা মোটেই জায়েয নয়। কারণ, আলহামদুলিল্লাহ! তাবলীগ জামাত মোটের উপর অনেক ভালো কাজ সম্পাদন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। তাই এ জামাতের সহযোগিতা করা উচিত। যদ্দুর সম্ভব আলেমগণের এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখা উচিত।

কিন্তু সাথে সাথে আলেমগণের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতাগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। তাই যেসব আলেম যাবেন, তারা এ চিন্তা নিয়ে যাবেন যে, আমরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি, সেই উদ্দেশ্য হলো- দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার সাথে সাথে এ মুবারক জামাতকে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে যথা সম্ভব বাধা দেয়া। এমন যেন না হয় যে, আলেমগণও জামাতের প্রভাবে ভেসে গেলেন।

যেমন, একটি বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা এই যে, পূর্বে ফতওয়ার বিষয়ে তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ মুফতী ছাহেবদের শরনাপন্ন হতেন। কিন্তু এখন সেখানে ফতওয়া দেয়ার ধারাও আরম্ভ হয়েছে। মাসআলার ক্ষেত্রে উম্মতের ফকীহগণ থেকে ভিন্ন মতের এক ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ কেউ বিভেদমূলক কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। যেমন- বলা হচ্ছে যে, এখন

তাবলীগকারীদের ঐ মুফতী ছাহেব থেকে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা উচিত, যিনি তাবলীগের কাজে লেগে আছেন। অন্যদের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয়।

অনেক সময় জামাতের আমীরগণ এমন ফয়সালা দিয়ে থাকেন, যা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন- দাওয়াত ও তাবলীগ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া? এ বিষয়ে যথারীতি একটি অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। তা হলো- দাওয়াত ও তাবলীগ যে, ফরযে আইন শুধু তাই নয়, বরং বিশেষ এ পদ্ধতিতে করা ফরযে আইন। যে ব্যক্তি বিশেষ এ পদ্ধতিতে তাবলীগ করবে না, সে ফরযে আইন পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবে। এটাও নিতান্তই ভারসাম্যহীন কথা। এমনিভাবে জিহাদের বিষয়েও ভারসাম্যহীন কথাবার্তা কানে পড়ে।

ছাত্ররা তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করবে

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা তো আমাদের ছাত্রদের তাবলীগ জামাতে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করি। কারণ, জামাতে যাওয়া নিজের ইসলাহের জন্যে অনেক উপকারী। এতে করে নেক লোকদের সাহচর্য লাভ হয়। এর ফলে নিজের ত্রুটি দূর করার সুযোগ হয়। ইসলাহে নফসের সুযোগ হয়। বরং দেখেছি যে, এখানে মাদরাসায় আট বছর পড়েও ফাযায়েলে আমলের এত গুরুত্ব অন্তরে সৃষ্টি হয় না, এক চিল্লা লাগানোর দ্বারা যে পরিমাণ গুরুত্ব সৃষ্টি হয় এবং আমলের প্রতি গুরুত্ব আসে। এটি অনেক বড় একটি নেয়ামত। এ কারণে আমরা ছাত্রদেরকে তাবলীগ জামাতে সময় লাগানোর জন্যে উদ্বুদ্ধ করি।

তবে তাবলীগ জামাতে যেসব ছাত্র সময় লাগাবে, তারা এদিকেও লক্ষ্য রাখবে যে, তাবলীগ জামাতে উপরোক্ত ভারসাম্যহীনতাও পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ভারসাম্যহীনতা দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলো দূর করার ফিকির করা উচিৎ। এমন যেন না হয় যে, সেখানে গিয়ে নিজেরাও তাদের প্রবাহে ভেসে গেলো, তাদের সুরে সুর মিলাতে লাগলো। মোটকথা, লবনের খনিতে পড়ে যেন তারাও লবন না হয়ে যায়।

এটা হলো, তাবলীগ জামাতের বাস্তব চিত্র। আলহামদুলিল্লাহ! এ সমস্ত অনিয়ম ও ভারসাম্যহীনতা সত্ত্বেও মোটের উপর এ জামাতের

ভিতরে কল্যাণের ভাগ বেশি এবং সর্বোপরি এ জামাত দ্বারা অনেক বেশি ফায়দা হচ্ছে। তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করা উচিত। তাদের সহযোগিতা করা উচিত। তবে এসব ভারসাম্যহীনতার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। এখন হচ্ছে এই যে, কেউ এসব অনিয়ম ও ভারসাম্যহীনতার সামান্য সমালোচনা করলেই তার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা আরম্ভ করা হয় যে, এ ব্যক্তি তাবলীগ জামাত বিরোধী। এটি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বিষয়।

বর্তমানের জিহাদ আক্রমণাত্মক, না প্রতিরক্ষামূলক?

একজন তালিবে ইলম প্রশ্ন করেছে, বর্তমানে যে জিহাদ হচ্ছে তা আক্রমণাত্মক না প্রতিরক্ষামূলক? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, বসনিয়া ও কাশ্মীরে যে জিহাদ চলছে তা মূলত প্রতিরক্ষামূলক। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর কাফেররাই আক্রমণ করে তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছে। পরিণতিতে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। আর কাশ্মীরের বিষয় হলো, ভারত জোর-জবরদস্তি করে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। কারণ, দেশ ভাগের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, যেসব অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ ছিলো। কিন্তু ভারত জোরপূর্বক তার উপর দখল বিস্তার করে আছে। এ কারণে একে অধিকৃত কাশ্মীর বলা হয়। এখন সেখানকার লোকেরা নিজেদের ভূখণ্ডকে কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে, তাই তা হবে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ।

এসব কথার ভুল ফল বের করবেন না

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে যে কথা আমি বললাম, প্রথমত তা ভালোভাবে বুঝতে হবে। কারণ, অনেক সময় সমাবেশে যখন কোনো কথা বলা হয়, তখন তা ভুল বুঝে ভুল পদ্ধতিতে অন্যের কাছে বর্ণনা করা হয়। বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। অনেক সময় কথা অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়, যার ফলে সংশোধন না হয়ে উল্টো ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। আপনাদেরকে বলার উদ্দেশ্য হলো- যেহেতু আপনারা এখন দরসে নেযামী থেকে লেখাপড়া শেষ করতে যাচ্ছেন। প্রত্যেক জিনিসের হাকীকত যথাস্থানে আপনাদের অবগত হওয়া এবং সে

অনুপাতে নিজেদের কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ কারণে এসব কথা আপনাদেরকে বলা হলো। তাই এর থেকে কেউ এ ফল বের করবেন না যে, আমি তাবলীগ জামাতের বিরোধী।

যাই হোক, আমি আপনাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, তাবলীগ জামাতে কল্যাণের ভাগ প্রবল। তাই এ জামাতকে গণীমত মনে করা উচিত। এর সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু কল্যাণের ভাগ প্রবল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এ জামাত নিষ্পাপ। এর মধ্যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা ভারসাম্যহীনতা নেই।

আলেমগণ দ্বীনের পাহারাদার

আলেমগণ দ্বীনের পাহারাদার। আমরা তো তালিবে ইলম। আলেমগণকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের পাহারাদার বানিয়েছেন। এক ব্যক্তির নিকট আমি একবার এ ধরনের কিছু কথা বললাম। উত্তরে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন- এই মৌলবীরা তো ইসলামের ঠিকাদার হয়ে আছে। এরা যে জিনিসের ব্যাপারে বলবে, এটা ইসলাম, তো সেটা ইসলাম, আর যার সম্পর্কে বলবে, এটা ইসলাম নয়, তো সেটা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি তাকে বললাম, ইসলামের ঠিকাদার তো কেউ হতে পারে না, তবে আমরা পাহারাদার অবশ্যই। আর পাহারাদারের দায়িত্ব হলো, শাহজাদাও যদি রাজদরবারে প্রবেশ করতে চায় আর তার কাছে প্রবেশপত্র না থাকে, তাহলে তাকেও বাধা দিবে। অথচ পাহারাদার জানে যে, আমি পাহারাদার, আর সে শাহজাদা। কিন্তু পাহারাদারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো, সে শাহজাদাকে বাধা দিবে। এমনিভাবে আমরা দ্বীনের ঠিকাদার নই, তবে পাহারাদার অবশ্যই। আমাদের কাজ পাহারা দেয়া। আপনাদের শ্রদ্ধা ও মর্যাদা আমাদের মাথার উপর। কিন্তু পাহারাদার হিসেবে আমাদের বলতে হবে যে, আপনাদের এ কাজ ঠিক নয়।

* * *